প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৬৭

প্রকাশক : শ্রীজীবনকুমার বসু

মোহন লাইব্রেরী : ৩৫।এ, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর : এস. সাহা

ক্যালকাটা প্রিণ্টার্স : ৯ এ্যাণ্টনি বাগান লেন, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট ও টাইটেল : শ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত

বাঁধাই : বুক বাইণ্ডিং সেণ্টার

৪০, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯

॥ নিবেদন ॥

'সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি' প্রকাশিত হলো। ইতিপূর্বে যাঁরা আমার 'সমাজ-দর্শন', 'বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য', 'ভারত-ভাস্কর রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি গ্রন্থ পড়েছেন, এমন কিছু পাঠক আমার কাছে এই জাতীয় আরও বিপুল রচনার দাবী জানিয়েছিলেন। তাঁদের ধারণা—সমাজ, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে আমার কাছ থেকে তাঁরা মোটামুটি কিছু কার্যকরী রচনা পেতে পারেন। তাঁদের দাবী আলোচ্য এই গ্রন্থে কতখানি মেটাতে পেরেছি জানি না, তবে সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আমি এতকাল প্রায়শঃই যা সাময়িকপত্রে লিখেছি, তা থেকে কিছু রচনা নির্বাচন ক'রে এই গ্রন্থে প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছি। বিষয়গুলি এত ব্যাপক এবং বর্তমানে এর কোনো কোনো বিষয় এত দ্রুত-পরিবর্তনশীল যে, তার সঙ্গে সমতা রেখে এ সম্পর্কে সারাজীবন লিখলেও লেখা শেষ হবে না এবং শেষ কথারও দাড়ি টানা যাবে না। তবু বর্তমান পরিবেশে যা বলতে চেয়েছি, তার সঙ্গে আশা রাখি—আমার সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার মনের মিল ঘটবে। রচনাগুলি ইতিপূর্বে যুগান্তর, অমৃত, দৈনিক মাসিক ও সাপ্তাহিক বসুমতী, প্রবাসী, বিশ্ববাণী, সংস্কৃতি, বিচার, সাহিত্যের খবর, সবিতা, জনসেবক, সাহিত্য-তীর্থ প্রভৃতি পত্রে প্রকাশিত হয়। এই সূত্রে উক্ত পত্রসমূহের সহৃদয় সম্পাদকবৃন্দকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বলা প্রয়োজন যে, এই গ্রন্থে সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির শ্রেণীবিভাগ ক'রে তদনুযায়ী আমি রচনাসমূহকে সন্নিবেশিত করিনি। পাঠক অনায়াসেই শ্রেণীবিভাগ ক'রে নিতে পারবেন; রচনার নামের মধ্যেই তার পরিচয় রয়েছে। এই সূত্রে শুধু আশা রাখবো—যাঁরা দেশ ও জাতির কল্যাণ চান, যাঁরা এদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে চিরকাল ঔদার্যের সঙ্গে সগৌরবে ধরে রাখতে চান, এই গ্রন্থের বিবিধ বিষয়গুলি যেন তাঁদের মননশীল চিন্তা ও আলোচনার আসরে উপযুক্ত স্থান পায়।

রণজিৎকুমার সেন

●

॥ পাঠক্রম ॥

॥ উৎসর্গ ॥

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

॥ লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ॥

বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য ॥ ভারত-ভাস্কর রবীন্দ্রনাথ ॥ সমাজ-দর্শন ॥ বৌদ্ধ দর্শন ॥ মহাকালের স্বাক্ষর ॥ MAN & SOCIETY ॥ বাউল রাজা (লালন ফকিরের জীবন-কাহিনী) ॥ দেবতার চেয়ে বড ॥ বন্দেমাতরম (স্বদেশী সঙ্গীত) ॥ ললিত রাগ ॥ নতুন দিন নতুন মানুষ ॥ দ্বৈত সঙ্গীত ॥ আগামী পৃথিবী ॥ রাধা ॥ মিস ডালিয়া বিহানী ॥ জয়তু ভারত (জাতীয়তা-বোধক প্রবন্ধ ও নাটিকা সঙ্কলন) ॥ শ্রেষ্ঠ গল্প ॥ নিশিলগ্ন ॥ দ্বীপ ও দ্বীপান্তর ॥ আমার কবিতা তুমি ॥ POEMS ॥ নানা ফুলের সাজি ॥ প্রভৃতি

॥ বঙ্গ দর্শন ॥

আজকের এই শরৎ-প্রভাতে স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমিকে দু'চোখ ভ'রে আর একবার নতুন ক'রে দর্শন করলাম। স্বর্ণপ্রতিমার সোনা সেই কবেই না জানি অঙ্গারে পরিণত হয়েছে, কালের বিবর্তনে গৌরী হয়েছেন মহাকালী; দুঃখে শোকে লাঞ্ছনায় নির্যাতনে চিন্ময়ী মা হয়েছেন ছিন্নমস্তা। তাঁর মণিমুক্তাশোভিত কণ্ঠে দুলছে কোটি কোটি নর-করোটি, তাঁর স্বর্ণশয্যা হয়েছে শ্মশান, তাঁর দেবভূমি হয়েছে শিবার অবাধ বিচরণভূমি।

এই সেই বহুরত্নশোভিতা বঙ্গভূমি—রামায়ণ ও মহাভারতেরও পূর্বকাল থেকে যার ঐশ্বর্য আর ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল বিরাট বিপুলাকারে। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-পুণ্ড্র ও সুহ্মের মধ্যে বঙ্গভূমির প্রভাব ছিল অসামান্য। ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যক থেকে শুরু ক'রে পর্তুগীজ প্রভাবের মধ্য দিয়ে লর্ড ক্লাইভ-প্রবর্তিত ইংরেজ-শাসন পর্যন্ত বিগত কয়েক সহস্র বছরের যে ইতিহাস, বঙ্গভূমি ছিল সেই ইতিহাসের এক অন্যতমা নায়িকা। হিমালয় থেকে সেতুবন্ধ এবং বরুণ নিকেতন থেকে ক্ষীরোদ সমুদ্র পর্যন্ত একদা রাজ্য সম্প্রসারিত ছিল পাল-বংশের। সে ইতিহাস বহু শতাব্দী পূর্বের হলেও আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। দেবপালের রাজত্বকালে যে বঙ্গভূমি আমাদের চোখে পড়ে—তার সীমানা ছিল উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত, পশ্চিমে কাশ্মীর ও পূর্বে আসাম পর্যন্ত। সেন রাজত্বেও এই সীমা ও সেই সঙ্গে বঙ্গসংস্কৃতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। তখনকার গৌরবঙ্গের সংস্কৃতিই ছিল মূলতঃ ভারত-সংস্কৃতি। ভারত বলতে তখন তার এই প্রাণকেন্দ্র বঙ্গভূমিকেই বোঝাতো। বিজয় সেনের পৌত্র বল্লাল সেন যেমন রাজত্ব পরিচালনা করেন, তেমনি 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুত-সাগর'-এর মতো স্মৃতি ও জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য-পুরাণ'ও প্রায় এই সময়েই রচিত। পাল রাজত্বের গোড়ায় বৌদ্ধাচার্যগণের উদ্যোগে যেমন গ'ড়ে ওঠে 'চর্যাপদ', তেমনি বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন জয়দেব।

বিভিন্ন ধারায় নানা সৃজনশীলতা ও পতন-অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে গৌড়ীয় সংস্কৃতি একদা বঙ্গ-ভারতীর গৌরবময় ঐতিহ্যের যে আলোকবর্তিকা তুলে ধরে,

সেই আলোর পথ ধরেই পরবর্তী বাংলা সৃষ্টি করে তার ভাবী কৃষ্টি। বিদ্রোহী বাংলার তেমনি রূপ দেখেছি আমরা বারো ভুঁইঞাদের চরিত্রে আর সন্ন্যাসী জাগরণে। শান্তিকামী বৌদ্ধরাও প্রয়োজনের চাপে একসময় এখানে অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ মূলতঃ বাঙালীচরিত্রে কোনোকালেই খুব বড় ক'রে নেই। একটি সহজ প্রাণাবেগের দ্বারা সে বিধৃত। বাঙালী যেমন অতি স্বচ্ছন্দে অপরকে নিজের ক'রে নিতে পারে, তেমনি নিজেকেও অপরের সুর-সঙ্গতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমন্বিত ক'রে নিতে জানে। বাংলার মাটিই চিরকাল বাঙালীকে এই চরিত্র দান করেছে। নদীমাতৃক বঙ্গভূমি। কোথাও তা সরু খালের মতো বেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও বিলের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে, আবার কোথাও বা ক্ষীণ নালার মতো ছড়িয়ে গেছে এদিকে সেদিকে। মাঝে মাঝে জেগে আছে শান্ত সরোবর। পশ্চিমবঙ্গে মাটির ঈষৎ রুক্ষতা হেতু সরোবরের আধিক্য কম ঘটলেও মাটির গভীরতায় জেগে আছে এমন এক শান্ত প্রাণরস—যা বিরাগকে রাগে সৃষ্টি করে, রাগকে রাগিণীতে রূপ দেয়। পূর্ববঙ্গের বৈরাগী যখন তার গোপীযন্ত্রে ধ্বনি তুলে কণ্ঠে ভাটিয়ালী ধরে, পশ্চিমবঙ্গের বৈরাগী তখন হাতে একতারা নিয়ে বাউল ধরে গলায়। মূলগত প্রাণরস একই। এই রস বাংলার মাটির রস। এই রসের ভিয়ানেই বাঙালী-চরিত্র সংগঠিত। মন তার বর্ষার স্রোতের মতো। যখন সে প্রধাবিত হয়, তখন সে দুর্মদ সেনার মতো এগিয়ে যায়; আবার ভাঁটার পথে পলিমাটির উর্বরতার ন্যায় স্নেহশীলা জননীর মতো স্নেহে প্রেমে আপনার মধ্যে আপনি মধুর হয়ে ওঠে। তার এই মধুর রূপটিই চিরকালের শ্রেষ্ঠ রূপ। এই মধুরতার ক্ষেত্রেই সে বিশ্ব থেকে স্বতন্ত্র হয়েও আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত। কর্তব্যের অনুরোধে সে সৈনিক হয়ে প্রত্যক্ষ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু লক্ষ্য তার রণক্ষেত্র নয়, সাধনক্ষেত্র। সে-সাধনা জীবনসাধনা, আত্মার সাধনা। আত্মোন্নতির জন্যই তাকে রাজনীতিতে সাড়া দিতে হয়, অর্থনীতির ভাঙা বনিয়াদের গরমিল হিসেবের পৃষ্ঠায় কৌটিল্যের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়। কিন্তু এর মধ্যে তার হৃদয় নেই; হৃদয় তার একতারার [illegible], দৃষ্টি তার ফিরে ফিরে যায় বন-বীথির শান্ত ছায়ায়—নদীর [illegible]। এই মনটিই তার বিশ্বমন থেকে স্বতন্ত্র হয়ে বিশ্বকে আপনার

দিকে আকর্ষণ করে। বেদে আর কোরানে পার্থক্য নেই এখানে। শাক্ত, বৈষ্ণব আর ইসলাম এখানে দেওয়া নেওয়ার একই পাত্রের যেন তিনটি রূপ। সাম্প্রতিক যুগের রাজনীতির দাবার চালের বাইরে এখানে শঙ্করের শিষ্য আর মহম্মদের শিষ্য তো পাশাপাশি বাস করেই একদা রচনা করেছে বিবর্তিত বাংলায় প্রাণের গুল-বাগিচা! বাইরে থেকে মুসলিম আক্রমণ এদেশের প্রাণের নাড়ীতে নাড়া দিলেও তাকে বিধ্বস্ত করতে পারে নি। বীণার তার তখন নতুন ক'রে বেজেছে।

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের বাঙালী ব্রাহ্মণ ভদ্রবাহু জৈনধর্মে দীক্ষা নিয়ে রচনা করেন 'কল্পসূত্র'। সে গ্রন্থের আজও তুলনা নেই। ষষ্ঠ শতাব্দীতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন বাঙালী বৌদ্ধ শীলভদ্র। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের কথা তো একালের লোকেরাও জানে। বাঙালী বাংলার সংস্কৃতি প্রচারে ছুটেছে তখন চীনে, জাপানে, তিব্বতে, লঙ্কায়, ব্রহ্মে, শ্যামে, যবদ্বীপে, সুমাত্রায়। পৃথিবীর এমন ক্ষেত্র খুব কমই আছে—যেখানে বাংলার প্রাণের বাণী গিয়ে পৌছায় নি। ঘরমুখী বাঙালী ব'লে আজ যাদের মুখে অপবাদের কলঙ্ক লেপন করা হয়, তারাই একদা বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে প'ড়ে সৃষ্টি করেছে নব নব সংস্কৃতির দুর্গ। এখান থেকে মস্‌লীন গেছে, লোহা গেছে; তার সাক্ষ্য তো আমরা বাইবেলের ওল্ড টেষ্টামেণ্ট আর ব্যাবিলনের ইতিহাস থেকেই পেয়েছি। শৌর্য-বীর্য ও বীরত্বেও বাঙালী সেদিন পিছিয়ে ছিল না। রামায়ণ-মহাভারতের কাল থেকে সীরাজদ্দৌলার রাজত্বকাল পর্যন্ত ইতিহাসে বাঙালীর যে শৌর্য-বীর্যের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, তা বিপুল গৌরবের। ভৌগোলিক সীমার ক্রমিক পরিব্যাপ্তি এবং সেই সঙ্গে ভূমির অখণ্ডতা সেদিন বাঙালীর প্রাণে যে ঐক্যবোধের প্রেরণা দিয়েছিল, এই সূত্রে সে ইতিহাসও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশজননী সেদিন যেন মহামায়া গৌরী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর রূপের ছটায় দিকদিগন্ত তখন আলোকিত। পদতলে তখন তাঁর শত্রু বিমর্দিত; তাঁর শংখধ্বনিতে মুখরিত তখন দশদিগন্ত।

কিন্তু বিধাতার আশীর্বাদের সঙ্গে অভিশাপও বুঝি কম ছিল না। বাংলার ভৌগোলিক সীমা ক্রমে এলো সঙ্কুচিত হয়ে। ১৭৭৬ সালেও পাটনা, মুঙ্গের, রাজমহল, জৌনপুর, বালেশ্বর ও কটক সুবেবাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯১১ সালের পূর্বে অবিভক্ত বাংলার মধ্যে যেসব অঞ্চল ছিল, তা হচ্ছে—পূর্ব ও

পশ্চিমবঙ্গ, কাছাড, শ্রীহট্ট, গোয়ালপাড়া, মানভূম, ধলভূম, সাঁওতাল পরগণা, পুর্ণিয়ার পূর্বাংশ, বালেশ্বরের অংশ, কুচবিহার, ত্রিপুরা ও সিকিম। মোট আয়তন ছিল ১০৭৭৩১ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ছিল ৭০৮২২৪৪৩। এই হিসেবমতেই বুঝি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী ক'রে, মানুষ করো নি।'

প্রাচীন গৌরবের উর্ধ্বচূড়া থেকে আদর্শচ্যুতির নিম্নভূমিতে এসে ঠাঁই নিয়েছিল বুঝি সেদিন বাঙালী। লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গবিভাগের ফলে ১৯১১র পর বাংলার মোট বর্গমাইল দাঁড়ায় ৭৭৪৪২, লোকসংখ্যা—৬০৩০৬৫২৫, আর ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর ভারত-অন্তর্গত পশ্চিম বাংলার এই আয়তন দাঁড়ায় মাত্র ২৯৫৩৩ বর্গমাইলে. এবং অবাঙালীর ক্রমিক ভিড়ে লোকসংখ্যা হয় ২,৪৮,১০,৩০৮। অবাঙালীর এই ভিড ক্রমেই বাড়তে থাকে এবং আজ তা পরিণত হয়েছে সমুদ্রে। ইংরেজ জানতো যে, বুদ্ধিজীবী বাঙালীকে বিপর্যস্ত ও দুর্বল ক'রে তুলতে পারলে তার জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতাস্পৃহা সহজেই নির্বাপিত হবে। কম্যুনাল এওয়ার্ডের সৃষ্টি ক'রে হিন্দু-সমাজের মধ্যে নানা বিভেদ এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ সৃষ্টি ক'রে ইংরেজ এদেশের মানুষে মানুষে দেয়াল রচনা ক'রে চাইল রাজকার্য চালু রাখতে। এ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

"These walls leave their mark deep in the minds of men. They set up a principle of 'Divide and Rule' in our mental outlook which bigets in us a habit of securing all our conquests by fortifying them and separating them from one another. We divide nation and nation, knowledge and knowledge, man and nature.' আর এরই অবশ্যম্ভাবী ফল হলো বঙ্গবিভাগ। ১৯০৫ এর সংহারকার্য পূর্ণভাবে সিদ্ধ হলো ১৯৪৭-এ। বাংলাকে ভাগ ক'রে ভারতকে টুকরো ক'রে ইংরেজ দিয়ে গেল স্বাধীনতার সনদ। মাথা পেতে সানন্দে তা গ্রহণ করলো ভারত ও পাকিস্তান। লক্ষ লক্ষ সুস্থ মানুষের জীবন হয়ে উঠলো অসুস্থ, প্রাণ নিয়ে ছুটলো তারা এদেশ থেকে ওদেশে। যারা ছিল এককালের সুহৃদ, রাতারাতি তারা হলো

শত্রু। ভারত ও পাকিস্তানের চাপে সিন্ধু, নর্মদা, গঙ্গা আর পদ্মা হয়ে গেল আলাদা। এর জলে হয় তর্পণ, ওর জলে হয় ওজু। এই বিভাগের ফলে শিল্প গেল, বাণিজ্য গেল, শিক্ষা গেল, সামাজিক অধিকার গেল, গেল মান, গেল ইজ্জত।

রামমোহনের বাংলা, বিদ্যাসাগরের বাংলা, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাংলা, সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্রের বাংলা এক নিমেষে কোন্ অতলতলে ভেসে গেল! তাঁদের শিক্ষা, তাঁদের সাধনা পারলো না দেশের প্রাণকে ধ'রে রাখতে। খণ্ড ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল বঙ্গভূমি। যে দেশের হিন্দুরা একদা মুসলমানের দরগায় গিয়ে সিন্নি দিত, মুসলমানেরা হিন্দুদের কালীপুজোয় এসে অংশ গ্রহণ করতো, সে দেশ উভয় সম্প্রদায়ের রোষ ও বিদ্বেষ-বহ্নিতে রাঙা হয়ে উঠলো। বাংলা হলো একদিকে পশ্চিমবঙ্গ, অন্যদিকে পূর্ব-পাকিস্তান। পাকিস্তানের মাইনরিটি হিন্দুরা প্রাণের ভয়ে দলে দলে ছুটে আসতে লাগলো পশ্চিমবঙ্গে। হিন্দুর 'হোমল্যাণ্ড' পশ্চিমবঙ্গ ঠাঁই দিতে পারলো না সমস্ত হিন্দুকে। তাদের ছড়িয়ে দেওয়া হলো সুদূর আন্দামান থেকে শুরু ক'রে উড়িষ্যা, বিহার আর আসামে। এখানেও এদেশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ইংরেজ-নীতিই অনুসরণ ক'রে চললো। বাঙালী বড় সাংঘাতিক জাত। তারা যখন স্বাধীনতা সংগ্রাম ক'রে জেলে গেছে, ফাঁসিতে ঝুলেছে, অন্যান্য প্রদেশ তখন ব্যবসা ক'রে ক্রোড়পতি হয়েছে। স্বাধীন ভারত যখন সেই ক্রোড়পতিদের কবলে, তখন তাদের ইচ্ছে নয় যে, বাঙালী আবার একত্রিত হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াক; ইংরেজের মতো সেখানে তাদেরও বড় ভয়। তাই ছত্রচান ক'রে দেওয়া হলো বাঙালীকে।

পশ্চিমবঙ্গে আগত যে সমস্ত বাঙালীকে বাধ্য হয়ে বিভিন্ন প্রদেশে গিয়ে বাস করতে হলো, পরবর্তী দু'-এক পুরুষেই দেখা যাবে—তাদের অধঃস্তন পুরুষদের কাছে বাংলা ভাষা বিদেশী বা স্বতন্ত্র প্রাদেশিক ভাষার ন্যায়ই অপাংক্তেয় বা বিভীষিকাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভারতের জাতীয় সঙ্গীত দু'টি বাংলার হলেও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার অধিকার দেওয়া হলো না; বরং তার এ দাবী নিন্দিতই হলো। বাঙালখেদা আন্দোলনে ছেয়ে গেল সারা ভারত। কর্তৃপক্ষ মজা দেখলেন, কিন্তু এর বিরুদ্ধে শাসনযন্ত্র সম্প্রসারিত করলেন না। এ যেমন প্রদেশগত সঙ্কট, তেমনি একদিকে যেমন পশ্চিমবঙ্গের পতিত জমিগুলির

উদ্ধারসাধনের অভাবে বসবাস ও খাদ্যোৎপাদন ক্ষেত্রে সঙ্কট দেখা দিল, অন্যদিকে তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে পাশের হার কমে গিয়ে এবং জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে চাকরী ও ব্যবসা সঙ্কুচিত হয়ে প'ড়ে বাঙালীর দুর্দশা চরমে উঠলো। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত কবিয়াল, পটুয়া, চাষী, মালাকর, ঢাকী, মাঝি, তাঁতী, ধোপা প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গে এসে যেমন বাড়তি সংখ্যায় পর্যবসিত হলো, তেমনি হলো মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজ। অথচ তাদের মধ্য থেকেই একদা লোক-সংস্কৃতির প্রাণস্ফূর্তি জাগ্রত হয়ে বাংলার ঐতিহ্যময় জীবনকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছে। সে জীবন হতমান ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো। পূর্ববঙ্গের যে যুবশক্তি একদা ইংরেজের রাজকীয় শক্তিকে পরাভূত করবার জন্য জীবনপণ সাধনা করেছিল, পশ্চিমবঙ্গে এসে দেখলো তারা অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছে। উদ্বাস্তুর ভিড়ে পথ, ফুটপাথ, স্টেশন, ময়দান পূর্ণ হয়ে উঠলো। সরকারী দপ্তর থেকে শুরু ক'রে সর্বদিকে দুর্নীতি আর অব্যবস্থা। বাসোপযোগী গৃহের অভাব, চাকরীর অভাব, বাড়িওয়ালা আর ধনিকশ্রেণীর অন্যায় জুলুম, উদ্বাস্তুদের ন্যায়াধিকারের ক্ষেত্রে পুলিসী জুলুম, পণ্যের আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধি, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অসাধু আচরণ প্রভৃতিতে আবহাওয়া এমন বিষাক্ত হয়ে উঠলো যে, বাংলার প্রাণপুরুষ হাহাকার ক'রে উঠলো। গঙ্গা-ভাগীরথীর যে পুণ্য আশীর্বাদ ললাটে নিয়ে একদিন বাংলার সংস্কৃতি নবীন প্রাণে প্রাণময়ী হয়ে উঠেছিল, এক নিমেষে কোথায় তা ভেসে গেল, কল্পনা করা গেল না। বাংলার জীবনে, বাঙালীর জীবনে ঘটলো অমাবস্যার পদসঞ্চার। স্কুল কলেজে ভর্তি হওয়া থেকে শুরু ক'রে মাইনে দেবার মতো সঙ্গতি নেই ছাত্রদের, বইয়ের কাটতি নেই বাজারে, সৎসাহিত্য উৎপাদনক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব দেখা দিল। যে সাহিত্যের চাহিদা বাড়লো, তা সস্তা চটুল কথাসাহিত্য। দুর্দশাগ্রস্ত বাঙালীর শ্রান্তক্লান্ত ভগ্ন মন পারলো না এর ঊর্ধ্বে কিছু কল্পনা করতে। একটা সুস্থ সমাজব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে এমন অবস্থা হ'তে বাধ্য। বাঙালীর জীবনে পঞ্চাশের মন্বন্তরের ধাক্কা সামলে উঠতে উঠতে দেখা দিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং তার অনিবার্য ফলস্বরূপ দেশ-বিভাগ। মানুষের জীবন যেখানে নিশ্চিত নয়, জীবনের মান যেখানে স্থিরীকৃত নয়, সেখানে সংস্কৃতিচর্চা গতি পাবে কি ক'রে? কোনো কোনো ক্ষেত্রে সঙ্গীত এবং নৃত্য বা গীতিনাট্যে অতীত বাংলার লোকসংস্কৃতির স্ফুরণ

দেখা দিলেও প্রাচীন বাংলার গৌরব-স্বাক্ষরকে নতুন যুগের প্রগতিশীল প্রাণ-ধারার সঙ্গে মিশিয়ে নবীনকালের মধ্যে বহন ক'রে নিয়ে যাবার উদ্যোগ বড় বেশি দেখা গেল না।

বর্তমানে এই সব সমস্যা আরও বেশি জটিল আকার ধারণ ক'রে সমাজ-দেহকে একেবারেই পঙ্গু ক'রে ফেলেছে। বিগত দু' দুটো মহাযুদ্ধের অভিশাপ এবং নতুন ক'রে আবার একটা যুদ্ধের আশঙ্কা আজ এদেশের মানুষকে তার জীবনবোধ এবং সত্যের প্রতি নিষ্ঠা থেকে অনেক নিচে নামিয়ে এনেছে। যারা যুবক, যারা তরুণ, তারা দেখছে—তাদের জীবনে অতীতের ঐতিহ্যও যেমন নেই, তেমনি নেই বর্তমানের কোনো নিশ্চয়তা, আর ভবিষ্যৎ—সে তো এক রহস্যময় অন্ধকারে আবৃত। তারা তাই আজ যথেচ্ছভাবে বিচরণ ক'রে নিজেদের কাছেই অপাংক্তেয় হয়ে পড়ছে। মনুষ্যত্বহীনতার প্রকাশ ঘটছে আজ আইনসভার উঁচু মিনার থেকে বিভিন্ন পাড়ার রামবাবু, শ্যামবাবু আর যদুবাবুর বাড়ির কালভার্ট পর্যন্ত। সরকার অত্যধিক দুর্বল এবং ততোধিক নিষ্ক্রিয়। ফলে মুনাফাখোরদের পরোক্ষ শাসনে এ বঙ্গ আজ জর্জরিত। নতুন নতুন নানা কলকারখানা এবং স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ'ড়ে উঠলেও প্রকৃত মানুষের অভাবে দেশের অগ্রগতি আজ অবরুদ্ধ। অথচ এই বাঙালীই সারা বিশ্বে একদিন আপন মহিমা বিঘোষিত ক'রে বঙ্গমাতার মুখ উজ্জ্বল করেছে। সেই বাঙালী আজ বাঘের ঘরে ঘোগের মতো নিজের মধ্যে গোঙাচ্ছে। বঙ্গভূমি আজ পরাধীনতার নাগপাশ কাটিয়েও রিক্তা, বিবসনা। আজ গৃহহীন, অন্নহীন, অবলম্বনহীন বাঙালী মাঝে মাঝে পিতৃ-পিতামহের গৌরবে কণ্ঠ উদ্দীপ্ত ক'রে তুললেও আসলে সে বৃহত্তর অবাঙালীর চাপে কুব্জ পৃষ্ঠ ও ন্যুব্জদেহ হ'য়ে পড়েছে। তার ব্যবসা গেছে, চাকরী গেছে, ইজ্জত গেছে, সতীত্ব গেছে; অর্থাৎ এক কথায় আজ আর চরিত্র বলতে কিছু নেই তার। কিন্তু কেন? এর মূলে কি তার নিজের অপরাধও কিছু নেই? আছে, অবশ্যই আছে। যতক্ষণ না সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে, ততক্ষণ তার আজকের এই নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও অবমানিত জীবন থেকে মুক্তি নেই।* 'আনন্দমঠে' এই প্রায়শ্চিত্তের কথাই ঘোষণা ক'রে গেছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

বিশ্বাস করবো, এই ঘোর অমারাত্রির অবসানে আবার একদিন নবসূর্যোদয় ঘটবে, নব সজ্জায় সজ্জিতা হয়ে উঠবে বঙ্গভূমি, এবং বাঙালী আবার তার হৃত

ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে বিশ্বে মাথা তুলে দাঁড়াবে, বলবে—'বন্দে মাতরম্', বলবে—

'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।'

আজকের এই শ্মশান-শয্যায় ব'সে আমি নতুন ক'রে দর্শন করছি সেই আগামী দিনের ইতিহাসকে॥

॥ শিক্ষা ও সমাজ-মানস ॥

শিক্ষার মূলগত অর্থ হচ্ছে—প্রকৃত জ্ঞানের দ্বারা ভালোভাবে বাঁচবার পথ রচনা ক'রে চলা। তার জন্য প্রথম দরকার আত্মোন্নয়ন, দ্বিতীয় প্রয়োজন—জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে নিজের জ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া, তৃতীয় প্রয়োজন—জীবনকে নিয়মানুবর্তিতার অনুগামী ক'রে তোলা, চতুর্থ প্রয়োজন—নিজের আবশ্যকীয় কাজগুলিকে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মধারার সঙ্গে সমন্বিত ক'রে নেওয়া এবং সর্বশেষ প্রয়োজন—বাকী জীবনের সম্পদ স্বরূপ এই সব সমন্বিত বিষয়গুলিকে সুষ্ঠু রুচি ও অনুভূতির দ্বারা দেশের কল্যাণের কাজে ব্যয় করা। জ্ঞানের পথে এই ব্যবস্থাকে শিক্ষার পঞ্চশীল কার্যক্রম ব'লে অভিহিত করা যায়। এর কোনো একটি শীলই অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সবগুলি শীলকে মিলিয়ে এক অদ্ভুত জাগ্রত প্রাণসত্তা দাঁড়িয়ে আছে।

এই প্রাণ জীবনকে নব নব আধারে সঞ্জীবিত ক'রে তুলছে। জীবনে তাই বাঁচবার প্রশ্নটাই বড। মানুষের মতো বাঁচা, কুকুরের মতো বাঁচা নয়। যে যে শীলাচরণের মধ্য দিয়ে জীবনকে সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্তিতার অনুগামী ক'রে সুন্দরের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই শীলাচরণগুলির অনুশীলনই আগে প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটাতে হলে চাই উপযুক্ত শিক্ষা ও জ্ঞান, যা-কিছু ভালোমন্দের বিচার ও যা-কিছু শুভাশুভের পার্থক্য বোধ। পাশ্চাত্ত্য মনীষী হার্বার্ট স্পেন্সার এই প্রশ্নটিই তুলে ধ'রে তার সমাধানের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন :

'আমরা কি ক'রে সুস্থ জীবন নিয়ে বাঁচতে পারি, এইটেই হচ্ছে সব চাইতে বড় প্রশ্ন। নিতান্তই স্থূলধর্মী বাস্তবসম্পৃক্ত জীবন নয়, জীবন অর্থে তার বৃহত্তর পরিধিই বুঝি। জীবনের প্রচলিত সাধারণ সমস্যাগুলি যেখানে বৃহত্তর সমস্যার সঙ্গে যুক্ত—সেখানে প্রয়োজন সমস্ত অবস্থার মধ্যেই আমাদের মনের বৃত্তিনিচয়কে সৎ ও সুন্দরের পথে চালিত করা। কিভাবে আমাদের দেহ, মন, দৈনন্দিন কার্যাবলী ও সংসারকে পরিশুদ্ধ করা যায়, নাগরিক হিসেবে কিভাবে আমাদের পারস্পরিক ব্যবহারকে মার্জিত করতে পারি, প্রকৃতিপ্রদত্ত স্বাভাবিক

শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যকে কত সুন্দরভাবে আমরা গ্রহণ করতে পারি এবং কিভাবে আমাদের মানবিক বৃত্তিগুলিকে আমাদের এবং অপরের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারি, তার উপরেই নির্ভর করে—কিভাবে আমরা পূর্ণতার সঙ্গে বাঁচতে পারি। এইটেই বিশেষভাবে জানবার প্রয়োজন। একমাত্র প্রকৃত শিক্ষাই আমাদের মধ্যে সেই জ্ঞান এনে দিতে পারে। স্বভাবতঃই তাই দেখা প্রয়োজন—আমাদের জাতীয় চরিত্রের পরিশোধনের পক্ষে শিক্ষার কোন্ স্তরের ব্যুৎপত্তিশীলতা কতখানি আবশ্যক।'

আমাদের যে বাঁচা, তা পরিপূর্ণ বাঁচা নয়। নানাভাবেই আমরা খণ্ডিত। কোনোকিছুর মধ্যেই আমরা সম্পূর্ণ নই। গৃহে যখন গৃহী হয়ে থাকি, তখনও যেমন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সংসারের মধ্যে দিতে পারছি নে, তেমনি সমাজে যখন আমরা লৌকিককার্যে রত, তখনও সমাজের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে মিলিয়ে দিতে পারছি নে। আমাদের যেটা 'আমি', তার কিছু এখানে, কিছু ওখানে ; কোথাও সে সুসংবদ্ধ নয়। তাই যখন আমরা শান্তি খুঁজি, তাও পূর্ণ ক'রে পাই না, তারও কিছু এখানে, কিছু ওখানে। মানুষ হয়ে বাঁচবার এটা লক্ষণ নয়। একটি জীবনকে ধ'রে যদি আমরা বিচার করি, তবে দেখবো—তার যেমন অস্থি, মজ্জা, রক্ত, মাংস, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, মন ও আয়ু মিলিয়ে সে সম্পূর্ণ, তেমনি প্রকৃত মানুষ ব'লে তাকেই গ্রহণ করবো, যে তার সমস্ত কিছু মিলিয়ে একটি নির্দিষ্ট সত্য ও পূর্ণতায় সম্পূর্ণ। তার বুদ্ধিবৃত্তি ও মননধর্ম মিলিয়ে নিজের মধ্যে সে সমস্ত কিছুকে সম্পূর্ণ ক'রে গ্রহণ করছে এবং সমস্ত কিছুর মধ্যে নিজেকে সে সম্পূর্ণরূপে দিতে পারছে। যেখানে এই পারার প্রশ্ন নেই, সেখানেই খণ্ড খণ্ড হয়ে মানুষের জীবনসত্তা ছোট ছোট জীব বিশেষে মাত্র পর্যবসিত হচ্ছে। এই পর্যবসিত রূপটিই জড় পৃথিবীর বৃহত্তর রূপ। সেখানে বহুতর ক্ষেত্রেই মানুষে ও পশুতে খুব বেশি পার্থক্য নেই। পশুত্বের সেই পঙ্ক থেকে মানুষকে যদি তার আপন মর্যাদায় উন্নীত হয়ে সম্পূর্ণ হতে হয়, তবে প্রয়োজন মানবীয় সংজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞান। সেই জ্ঞানের কথাই হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁর রচনায় তুলে ধরেছেন।

এইভাবে জীবনের বিভিন্ন লীলাচরণের মধ্য দিয়ে মানুষ যখন প্রজ্ঞাশীল হয়ে উঠবে, তখন প্রয়োজন তার সমাজ শিক্ষার পাঠ গ্রহণ। ব্যক্তিগত শুভই শুভ নয়, যতক্ষণ না সমষ্টিগত শুভকর্মের দ্বারা সমাজ-মানসের ঋদ্ধি সাধিত হচ্ছে,

ততক্ষণ সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে কোনো ব্যক্তি-মানসিকতাই বৃহত্তর জীবনক্ষেত্রে সার্থক হ'তে পারছে না। ভালোভাবে জীবন যাপন করবার এই অর্থ নয় যে, সমাজের সমষ্টিগত মানুষের যা-হোক তা-হোক, আমার ভালো নিয়ে আমি থাকতে পারলেই হলো। মানুষ আসলে তার নিজেকে নিয়ে সম্পূর্ণ নয়, বৃহত্তর সমাজ ও বৃহত্তর দেশের সে মাত্র একজন। এইভাবে বহু একের ঐক্য নিয়ে সমাজ ও দেশ। সেখানে একের সুখ সুখ নয়, সবাইকে মিলিয়ে যে সুখ, সেই হচ্ছে একের সুখ। আমার ভালোভাবে বাঁচবার মূলে আমার নিজের প্রয়াস যতখানি, তার অধিক প্রভাব সমাজের ; সমাজ অর্থে সমষ্টিগত মানুষ। আমি যতক্ষণ না সেই সমষ্টির হচ্ছি, যতক্ষণ না সমষ্টির সুখ-দুঃখ আমার সুখ-দুঃখ হচ্ছে, ততক্ষণ 'আমি'র যে মূল্য, তা অর্থহীন। হার্বার্ট স্পেন্সার তাই বললেন : 'কোনো সমাজের গুণগত ঐতিহ্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে সেই সমাজের মানুষগুলির চরিত্রের উপর। সমাজভুক্ত মানুষদের চরিত্র যত দ্রুত মার্জিত ও শোভন হয়, ততই সেই সমাজের এবং সমাজভুক্ত বিভিন্ন পরিবারের মঙ্গল সাধিত হয়।'

এই ব্যক্তি এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরিবার নাগরিক হিসেবে যত বেশি উদার, উন্নত ও পরিশীলনশীল হবে, সমাজ মানসও তত বেশি উদার ও উন্নত হবে।

॥ ভারতীয় ভাষাসমস্যা ॥

ভাষাসমস্যা নিয়ে ভারতবর্ষে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে এ পর্যন্ত দীর্ঘ উনিশ বছর ধ'রে যে সব ঘটনা ঘ'টে গেল, তা মর্মান্তিক। স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতবর্ষ যে এই এত বছর ধ'রে এগিয়ে এসেছে, অবস্থা-পারম্পর্যের দিকে লক্ষ্য ক'রে তা যেন মনেই হয় না।

যাঁরা রাষ্ট্রনেতা, তাঁরা উচ্চপর্যায়ের রাজনীতিতে অংশ নিয়ে এককালে ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রাম ক'রেছেন, কিন্তু দেশের চিত্তকে যতখানি জানার প্রয়োজন ছিল, মনে হয়—তা জানেন নি। ভাষা প্রভৃতি বিষয়গুলি তাঁদের মনে ভাসাভাসাভাবে চলাফেরা করছিল, কিন্তু এই নিয়ে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁদের মনে স্থির সিদ্ধান্ত ব'লে কিছু ছিল না। ফলে স্বাধীনতা লাভের পর যখন স্বকীয় ইজ্জতের প্রশ্ন উঠলো, তখন ভাষার বিচারে হিন্দী এবং হিন্দুস্থানী দু'রকম ভাষ্য মোটামুটি জনগণের কানে এলো। তাকে রোমান হরফে রূপ দিলে এ দেশের বহুভাষাভাষী মানুষের মধ্যে একটা সমতা এনে দেওয়া যেতে পারে, এরকম মতবাদও গান্ধীজী পর্যন্ত গড়ালো। এবং হিন্দুস্থানী ভাষার উপরেই মূলতঃ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। কথা ছিল —ভারতের বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ উপাদানসমূহ নিয়ে গ'ড়ে তোলা হবে হিন্দুস্থানী ভাষাকে ; এবং তাকে রূপ দেওয়া হবে দেবনাগরী হরফে। কিন্তু এ কথাও শুধু কথাই থেকে গেল।

শেষ পর্যন্ত যখন সংবিধান রচিত হলো, দেখা গেল—হিন্দীকেই ভারতের রাষ্ট্রভাষা (এবং জাতীয় ভাষাও বটে) হিসেবে গ্রহণ ক'রে ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী থেকে তার বাস্তব রূপায়ণকে সার্থক ক'রে তুলবার নির্দেশ দেওয়া হলো। সেই সঙ্গে নেহেরু-ভাষ্যও লিপিবদ্ধ হলো যে, যতদিন পর্যন্ত না অহিন্দীভাষীরা হিন্দীতে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠচে, ততদিন হিন্দীর সঙ্গে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজীর ব্যবহার অব্যাহত থাকবে। কিন্তু এ ভাষ্যকেও সম্মান না দিয়ে '৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী যখন কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দী প্রচারে সচেষ্ট হলেন, তখনই শুরু হলো বিরোধ এবং এই বিরোধের প্রথম সূত্রপাত ঘটলো দক্ষিণ ভারতে।

হিন্দী সমগ্র ভারতবাসীর এক-তৃতীয়াংশের ভাষা এবং এ ভাষা সমগ্র জাতির প্রাণচেতনার অভিব্যক্তিরই মাত্র নয়, শিক্ষা-কথোপকথন-ভাববিনিময় প্রভৃতির দিক দিয়েও এত অপটু যে, এ ভাষা ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা বা যোগাযোগের ভাষ রূপে গণ্য হ'তে পারে না। ভারতীয় সংবিধান রচনা হওয়ার সময় থেকে এ পর্যন্ত হিন্দীপ্রচারের জন্য সরকারী অর্থব্যয় কম হয় নি। কিন্তু কাজ কিছু হয় নি। এ অবস্থায় ভারতের অন্যান্য যেসব বলিষ্ঠ আঞ্চলিক ভাষা রয়েছে, যেমন—বাংলা, তামিল, তেলুগু, উর্দু প্রভৃতি, তার কোনোটিকেই প্রাধান্য দেওয়া হলো না। ফলে 'হিন্দী-সাম্রাজ্যবাদ' ব'লে যে কথাটা উঠলো, তা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। ইংরেজীকে তার যথাযোগ্য স্থান না দিলে ভারতীয় চাকরী প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলিতে হিন্দীভাষাভাষীদেরই একচেটিয়া প্রাধান্য গড়ে উঠবে, ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ লোকের মধ্যে এই সংশয়ের সৃষ্টি হ'লো। সুতরাং অহিন্দীভাষীরা যতদিন না পুরোদস্তুর হিন্দী-অভিজ্ঞ হ'য়ে উঠতে পারছে, ততদিন ইংরেজীকে ভারতীয় ভাষার অন্যতম সহযোগী ভাষা হিসেবে থাকতেই হবে। ইংরেজী আজ আর ইংরেজের মাত্র ভাষা নয়, ইংরেজী আজ পৃথিবীর অন্যতম একটি সার্বজনীন ভাষা। বিশেষতঃ এখনও যখন ইংরেজী ভিন্ন উচ্চশিক্ষার পাঠ্যসমূহ (আইন, ডাক্তারী, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি সহ) একমাত্র বাংলা ভিন্ন অপরাপর ভারতীয় ভাষায় গ'ড়ে ওঠা সুদূর-পরাহত, তখন 'ইংরেজী হটাও' আন্দোলনের মতো আত্মঘাতী বিষয় আর কিছু হতে পারে না। তার একমাত্র স্থান নিতে পারতো বাংলা, কিন্তু রাষ্ট্র বা জাতীয় ভাষা হিসেবে বাংলাকে গ্রহণ করবার মতো প্রবৃত্তি আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে কোথায় ? অথচ এ কথা পরীক্ষিত সত্য যে, সারা ভারতে একমাত্র বাংলাই হ'চ্ছে সেই উদারউজ্জ্বল ও ঐতিহ্যবাহী ভাষা—যে ভাষা শিখবার জন্যে পৃথিবীর নানাদেশের মনীষী এসে এখানে মিলেছেন, যে ভাষা যে কোনো ভারতবাসীর পক্ষে আয়ত্ত করা অত্যন্ত সহজ। স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদও বাংলা ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর স্বরচিত বাংলা প্রবন্ধসমূহ বিশেষ সুখপাঠ্য ও হৃদয়গ্রাহী হ'তো। এ রকম উদাহরণ অনেক রয়েছে। তাঁরা জানেন—সারা ভারতের ক্ষেত্রে তো বটেই, সারা পৃথিবীতে আজ বাংলা ভাষার স্থান কোথায়।

পরবর্তী প্রশ্ন উঠেছে : আঞ্চলিক ভাষাগুলোর ভাগ্য তা হলে কি হবে? এবং এরই ভিত্তিতে দাবী উঠেছে যে, প্রত্যেকটি আঞ্চলিক ভাষার রাষ্ট্রীয় ও ও জাতীয় সমানাধিকার স্বীকার করতে হবে এবং ভারতের এই অন্ততম চৌদ্দটি আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে থাকবে হিন্দী ও ইংরেজী। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও নাকি এই দাবীর পক্ষে রায় দিয়েছেন। ১৯৪৯ সালে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী (বর্তমানে নিখিল ভারত) বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ভারতীয় ভাষাবিষয়ক আলোচনা সভায় পণ্ডিত নেহরু বলেছিলেন : 'হিন্দী অথবা হিন্দুস্থানী যে নামেই অভিহিত করা হোক্ না কেন, জনসাধারণের ভাষাই ভারতের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পাবে, পণ্ডিতদলের ব্যবহৃত ভাষা এ স্থান লাভ ক'রতে পারে না। আইন ক'রে জনসাধারণকে ভাষা শেখানো যায় না। ব্যবহারের দ্বারা রাষ্ট্রভাষা বিবর্তিত হ'য়ে গঠিত হয়। প্রাদেশিক ভাষাগুলির উন্নতিও সর্বদাই কাম্য। কোনো ভাষাকেই উন্নতির পথে বাধা দেওয়া হবে না। সাহিত্যিকরা যে ভাষায় ইচ্ছে রচনা করতে পারবেন, সরকার বরং ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধির সহায়তাই করবেন। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ জাতির সম্পদ হচ্ছে সংস্কৃতি ও সাহিত্য। কাজেই যে কোনো ভাষায় সাহিত্যের উন্নতি হ'লে তাতে ভারতের সাংস্কৃতিক গৌরবই বৃদ্ধি পাবে।'

সুতরাং এদিক থেকে দেখা যাচ্ছে—কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত খুব একটা নতুন কিছু নয়। হিন্দীকে যদি ভারতীয় রাষ্ট্রের ব্যবহারে ভবিষ্যতের জন্ম রাখতেই হয়, তবে হিন্দী-সম্পর্কে কয়েকটি গঠনমূলক প্রস্তাব পূর্বাহ্নেই নিতে হবে। সেই প্রস্তাব হচ্ছে—প্রথমতঃ, ব্যাকরণের জটিল ও অর্থহীন বন্দীদশা থেকে তাকে মুক্ত করতে হবে; দ্বিতীয়তঃ, ভারতের প্রচলিত চৌদ্দটি প্রাদেশিক ভাষা থেকে জনপ্রিয় অথচ ঐতিহ্যবাহী শব্দ-সমূহ নিয়ে হিন্দীকে নতুনভাবে গ'ড়ে নিতে হবে, তৃতীয়তঃ, যতদিন না হিন্দী আঞ্চলিক ভাষাসমূহের সমমাধুর্যে বলিষ্ঠ ও উন্নীত হয়ে উঠতে পারছে, ততদিন সংযুক্ত ভারতদেহে তার অস্তিত্বের কোনো মূল্য থাকবে না; চতুর্থতঃ, সর্বজনগ্রাহ্য ও সর্বজনবোধ্য ভাষা হিসেবে যতক্ষণ না হিন্দী অফিস-আদালতের কাজ থেকে শুরু ক'রে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সর্ববিধ প্রয়োজন পূরণের উপযুক্ত হ'য়ে উঠচে, ততক্ষণ পর্যন্ত হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে

গ্রহণ করা চলবে না। এই রূপ-বিবর্তিত ভাষাকে হিন্দী না ব'লে হিন্দুস্থানী বলাই বোধ করি অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে।

এইভাবে যতদিন এই রূপ-বিবর্তিত হিন্দুস্থানী ভাষা কার্যক্ষম হ'য়ে না দাঁড়ায়, ততদিন ইংরেজীই কেন্দ্রের অন্যতম ভাষা হিসেবে অব্যাহত থাকবে, আর সেই সঙ্গে থাকবে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক চৌদ্দটি ভাষা। কিন্তু এ কথা দ্বারা আমি এ কথা বুঝতে চেষ্টা করবো না যে, হিন্দুস্থানী একদা সক্ষম হ'য়ে দাঁড়ালে ইংরেজী এদেশ থেকে বর্জিত ও বিলুপ্ত হবে। উচ্চতর শিক্ষা ও বিদেশের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের দিক থেকে তখনও ইংরেজী অপরিহার্যই থাকবে; না থেকে উপায় নেই। ভারতের যে সংস্কৃতির আমরা অধিকারী, সেই সংস্কৃতি একমাত্র ভারতের নিজস্ব উপাদানেই গড়ে ওঠে নি। নানাদেশের নানা ভাবধারা ও বিষয়বস্তুর সমন্বয় ঘটেছে ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষ সেই সবকিছুকে আত্মসাৎ ক'রে নিজের ক'রে নিয়েছে; এবং নিজের অলঙ্কারে তাকে অলঙ্কৃত ক'রে নিজস্ব ভাবধারায় তাকে নতুন ক'রে রূপ দিয়েছে ভারতবর্ষ। ইংরেজীর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটবার কথা নয়।

অন্যদিকে সর্বভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে সম্প্রতি যে ত্রিভাষার প্রশ্ন উঠেছে, ভাষাদ্বন্দ্বের অবসান ও জাতীয় সংহতির দিক থেকে বিদগ্ধ ব্যক্তিদের অনেকেই তাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। এতে ভারতের প্রতিটি অঞ্চলের মানুষকে বাধ্যতামূলকভাবে তিনটি ভাষা শিখতে হবে: একটি ইংরেজী, একটি হিন্দী ও একটি স্ব স্ব আঞ্চলিক ভাষা যা ভারতের প্রচলিত চৌদ্দটি ভাষার অন্তর্ভুক্ত, এবং হিন্দীভাষীর পক্ষে অপর একটি আঞ্চলিক ভাষা নিতে হবে। এতে যেমন ভাষাদ্বন্দ্বের অবসান হবে, তেমনি প্রতিটি মানুষই প্রতিটি প্রদেশের সঙ্গে ভাষাগত ও ভাবগত আত্মীয়তায় সংযুক্ত হ'তে পারবে।

এখানেও আপত্তি উঠবার কোনো কারণ ছিল না—যেহেতু ইংরেজ-শাসনাধীনেও এদেশের স্কুল-কলেজে ত্রিভাষা বাধ্যতামূলক ছিল, যেমন—ইংরেজী + স্ব-স্ব প্রদেশের নিজস্ব ভাষা + সংস্কৃত বা উর্দু বা আরবি। বর্তমানে আপত্তি উঠবার কারণ দাঁড়িয়েছে হিন্দী নিয়ে। যেহেতু এ ভাষার কোনো বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি নেই এবং যেহেতু এ ভাষা দুই-তৃতীয়াংশ ভারতবাসীর ভাষা নয়, সেই হেতু ত্রিভাষার ক্ষেত্রে হিন্দীকে মেনে নিতে আপত্তি আছে। আরও আপত্তি আছে এই কারণে যে, এ ভাষার সুযোগ নিয়ে ভারতের এক-

তৃতীয়াংশ লোক দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার ক'রবে এবং চাকরীর ব্যাপারে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে হিন্দীভাষীরাই অগ্রাধিকার লাভ করবে। তাই অনেকের মতে, হিন্দীর পরিবর্তে যদি সংস্কৃতকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তবে এক কথায় সব সমস্যার নিষ্পত্তি হ'য়ে যায়। কারণ সংস্কৃত নিয়ে কোনো প্রাদেশিক বাধা উঠবার প্রশ্ন নেই, কিন্তু তার পূর্বে সকল ভাষার সম্মিলিত সম্পদে সমৃদ্ধ হিন্দুস্থানী ভাষা সম্পর্কে কিছু যুক্তিসম্মত ভাবনা ভেবে দেখলে ক্ষতি কি? এখানেও তো কোনো বিশেষ প্রদেশবাসীর কোনো আপত্তি থাকা উচিত নয়। এ ভাষাকে ভাষাবিদ্‌দের সহযোগে দ্রুত গ'ড়ে নিতে হবে। সে প্রয়াসে বিরত থেকে সংস্কৃতের উপর জোর দিলে কি অসুবিধে ঘটবার সম্ভাবনা থাকবে, তা নিয়ে ঈষৎ ভাবা যেতে পারে।

ভারতে বর্তমানে পাঁচ কোটির উপর মুসলমান রয়েছে এবং তাছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের যেসব অধিবাসী ভারতের নাগরিক, তাদের সংখ্যাও খুব কম নয়। তাদের তরফ থেকে না উঠলেও মুসলমানদের তরফ থেকে সংস্কৃতের বিরুদ্ধে হয়তো বিক্ষোভ উঠতে পারে। কেননা তাদের চিরকালের ধারণা—সংস্কৃত হিন্দুদের ভাষা; সুতরাং এ ভাষা গ্রহণ ক'রতে তারা প্রস্তুত নয়। এখানকার স্কুল-কলেজে সংস্কৃত যখন বাধ্যতামূলক পাঠ্য ছিল, তখনও মুসলমান ছেলেরা সংস্কৃত পড়তো না, পড়তো আরবি। তখন কোনো মুসলমান ছাত্র স্বেচ্ছায় সংস্কৃত কিংবা কোনো হিন্দু ছাত্র স্বেচ্ছায় আরবি বা উর্দু নিয়ে পড়লে তাদের জন্য পাস-মার্কের সঙ্গে কিছু গ্রেস-মার্ক প্রাপ্য থাকতো, এই পর্যন্ত। দ্বিতীয়তঃ, এদেশে সংস্কৃত প্রচলনের যুগেও আপামর জনসাধারণ যেমন সংস্কৃতে কথা বলতো না, তেমনি একালেও সংস্কৃত চালু হ'লে পঞ্চাশ কোটি মানুষই সংস্কৃতজ্ঞ ব'নে যাবে না। তাহ'লে জনসাধারণের ভাষা কি হবে? দু'শো বছরের ইংরেজী শিক্ষার ফলেও দেখা গেছে, মাত্র কিছু সংখ্যক শিক্ষিত লোকই ইংরেজীতে কথাবার্তা বলতে পারে, বাকী অগণিত জনসাধারণ চিরকালের একই অবস্থায় আছে। তাদের মধ্যে হাজার রকমের ভাষা। সকলকে সব ভাষায় কথা বোঝানো যায় না। তা যদি হয়, তবে জাতীয় ভাষা কী হওয়া উচিত? জাতীয় ভাষা অর্থে বুঝবো—যে ভাষায় এদেশের সকল মানুষ সমান অভ্যস্ত। সে ভাষা কি সংস্কৃত হওয়া সম্ভব? কোনো চাষী, কুলি, ধাঙড়, মুটে বা কোচয়ান কি সংস্কৃত কথা বলতে সক্ষম

হবে? এদিক থেকে চিন্তা ক'রলে মনে হবে—এ যুগে জাতীয় ভাষার ক্ষেত্রে সংস্কৃতের ভাবনা নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক ভাবনা। এখানে হিন্দুস্থানী ভাষা বরং দ্রুত কার্যকরী হ'তে পারে; কারণ এর বীজ আগে থেকেই আপামর জনসাধারণের মনে উপ্ত হ'য়ে আছে। তাকে কেবল বিজ্ঞানসম্মত রূপ দেওয়া সাপেক্ষ, এই যা।

কিন্তু এখানেও আমাদের সকল চিন্তার নিষ্পত্তি হ'য়ে যাবার কারণ নেই। কেননা, ত্রিভাষার মধ্যে যদি সংস্কৃত না আসে, তবে সংস্কৃতের ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াবে? এ ভাষা কি ভারতবর্ষ থেকে তবে একেবারেই লুপ্ত হ'য়ে যাবে? মূল সংস্কৃত থেকেই ভারতীয় ভাষার জন্ম। সংস্কৃতের যে অতুল ঐশ্বর্য এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংস্কৃতের যে অবদান, তা বিস্মৃত হ'লে অমানুষিকতার পরিচয় দেওয়া হবে। তাকে বাঁচানোই হবে আমাদের জাতীয় নীতি। এ'দিকে সচেতন থেকে আমরা এভাবে গোটা বিষয়টাকে ভাবতে পারি, যেমন—স্কুলের প্রথম পর্যায়ে হিন্দুস্থানী এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ঐচ্ছিকভাবে সংস্কৃত পড়াবার ব্যবস্থা ক'রতে হবে। তাতে স্কুল-শিক্ষার্থীরা মোটামুটি এই উভয় ভাষাতেই অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে। কলেজের উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের কাছে এই দুটো ভাষাই স্পেশাল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে খোলা থাকবে, যে যে-ভাষা নিয়ে চর্চা ক'রতে চায়, সে সেই ভাষাই নেবে। স্কুলে এমন বহু বই ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়—যার বিষয়বস্তু তাদের ভবিষ্যৎ-জীবনগঠনে খুব একটা কাজে আসে না। এ জাতীয় বই বর্জিত হ'লে প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পযন্ত হিন্দুস্থানী এবং সপ্তম শ্রেণী থেকে ঐচ্ছিকভাবে সংস্কৃত পড়ায় তাদের অসুবিধে হবে না। আপাততঃ মনে হ'তে পারে যে, এতে স্কুলে ত্রিভাষার ক্ষেত্রে ছাত্রদের মোটামুটি চারটি ভাষা আয়ত্ত ক'রতে হবে, কিন্তু আসলে ত্রিভাষাই দাঁড়াচ্ছে। এইভাবের চিন্তার মধ্য দিয়ে আমরা ভাষা-সমস্যার একটা ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসম্মত সমাধান দ্রুত খুঁজে পেতে পারি। ইংরেজী যেমন আছে, তেমনি থাকবে, এবং প্রাদেশিক ভাষাও প্রদেশগতভাবে সকল কার্যে ব্যবহৃত থাকবে। তা নিয়ে কারুর মনে কোনোকালেই কোনো কুণ্ঠা জাগবে না।

॥ সমাজে ব্যক্তি-বিবর্তন ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ॥

ব্যক্তি-বিবর্তন

পদার্থ (matter) এবং আত্মা (spirit) হ'চ্ছে পূর্ণ বাস্তবতা—যা একত্রে গতির মধ্যে বিরাজ করে। এরা চিরন্তনরূপে গতিশীল এবং এদের পরিবর্তন দ্বন্দ্বমূলক। ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে এবং কৃত্রিমরূপে যদিও পদার্থ অনুভবযোগ্য, কিন্তু মনের দিক থেকে আত্মা গভীরভাবে বিকাশমান—যার গতির মধ্যে অস্তিত্ব আন্দোলিত হয়ে ওঠে। যখন পদার্থ পরিবর্তিত হয়, তখন তার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণরূপে এবং এই গুণগত পরিবর্তনের উৎপন্ন বিষয়রূপে আত্মা প্রকাশিত হয়। যখন কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি একে প্রয়োগ করা হয়, তখন দেহ ও আত্মা একত্র-বিশিষ্টরূপে দেখা দেয়।

মানুষ হচ্ছে পদার্থবিষয়ক মানসিক চিত্র, এবং এই মানসিক রূপটি হচ্ছে শারীরিক বিষয়ের উৎপন্ন। এইরূপে শারীরিক দিকটি মানসিক রূপের চাইতে পৃথক নয়, এবং এর দ্বারা বহুল পরিমাণে নির্ধারিত। শরীর উৎকর্ষলাভ করলেই তবে মন উপস্থিত হয়। যখন মন (মানসিক দেহ) সৃষ্টি হয়, তখন শারীরিক আকার নির্ধারিত করে। মানসিক দেহের উন্নতি হচ্ছে বুদ্ধিগত এবং আত্মাসংক্রান্ত বিষয়ে ইন্দ্রিয়ানুভূতি।

পদার্থের প্রতিটি পরিবর্তন উচ্চতর গুণগত পরিবর্তনের দিকে। এর প্রতিটি আন্দোলন আত্মার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। আত্মার আন্দোলন গুণগত পরিবর্তনরূপে উচ্চতর পদার্থের মধ্যে প্রকাশমান হয়। মানবদেহ বিশেষরূপে উন্নত পদার্থ। যখন শরীর উন্নত হয়, তখন সে নিজে নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে থাকে। এই সচেতনতা ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করে এবং আত্মার সন্ধান পাওয়া যায়। চেতনার গুণগত পরিবর্তন হচ্ছে 'আত্মা', আর অতি উন্নত পদার্থের ধর্ম হচ্ছে 'দেহ'।

এইরূপে মানবজীবনে এবং চেতনশীল ব্যবহারে পদার্থের তুলনায় পৃথক হয়ে আত্মার আন্দোলন প্রকাশ পায়। চেতনার উন্নতিতে আত্মা হচ্ছে বাস্তবতা এবং এইরূপে আত্মিক অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। অস্তিত্বে পরিপূর্ণ চেতনা হচ্ছে অহংভাব। চেতনার উচ্চতম গুণগত পরিবর্তন হচ্ছে আত্মিক

ব্যক্তিত্ব। আত্মিক ব্যক্তিত্ব হচ্ছে অহংভাবের সর্বশেষ সংযুক্তি সাধন এবং সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে গুণগত জীবনের সর্বোচ্চ স্তর। অহংভাব বিশেষভাবে বাঁচবার তাগিদে এবং যে চুক্তিবদ্ধতার দ্বারা মানুষ অন্যান্য মানুষের সংস্পর্শে আসে, তাকে পূর্ণরূপ দান ক'রতে দৈহিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এর ফলে একটি সামাজিক পরিবেশ মানবজীবনের মাননির্ধারকরূপে সৃষ্টি হয়। চুক্তিবদ্ধতার পূর্ণতা হচ্ছে জীবনের বাস্তব উপায়গুলির উৎপাদন এবং তার যথাযথ বিতরণ। ক্রমে অহংভাবের সচেতনতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যখন বিরাট গণসমাজ তাদের মধ্যে অহংভাবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়, তখন তারা নিজেদের প্রতিক্ষেপণ ক'রে জীবনের উন্নততর অবস্থার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করে। সমাজবাদের আন্দোলন হচ্ছে বিরাট গণজীবনের সেই অহংভাবের আক্ষেপণ—যারা সাধারণতঃ নিজেদের উন্নতি সাধনের সুযোগগুলি থেকে বঞ্চিত। সুতরাং সমাজতন্ত্রের আন্দোলন ইতিহাসের দিক থেকে প্রয়োজনীয় এবং মানবসমাজের প্রগতির জন্য শুভপ্রদ।

দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালীতে মানুষ সাধারণতঃ প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় এবং একই সঙ্গে সে এই পরিবেশকে পরিচালিতও করে। জীবনযাত্রার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে দৈনন্দিন সংযোগে তার পরিবর্তন হয় এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের রূপান্তর সাধিত হয়। পারস্পরিক ইচ্ছাপ্রবৃত্তির দ্বারা মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে একত্রিত হয়ে প্রাকৃতিক শক্তিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন ক'রে থাকে। যারা গুণগত পরিবর্তনের উত্তুঙ্গশিখরে আরোহণ ক'রেছেন, এইরূপ ব্যক্তিদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক এবং কতিপয় ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে এই সামঞ্জস্য লাভ করা সম্ভব হয়। যখন বিরাট গণমানস জীবনের বাস্তব উপায়গুলিকে উন্নত করবার জন্য পরিপূর্ণরূপে সচেতন হয়, এবং মানসিক উন্নতি বিধানের জন্য যুক্তিযুক্ত জীবনলাভ ক'রবার উদ্দেশ্যে দাঁড়ায়, তখন প্রধানতঃ বিজ্ঞান ব্যবহৃত হয়।

মানবজীবনের মান উন্নত ক'রবার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের এই প্রয়োগ বাস্তবতার ক্ষেত্রে এবং ব্যবহারিক দিক থেকে প্রকৃতির সঙ্গে সমাজের ঐক্য সাধন করেছে, এবং মানুষকে সক্ষম ক'রে প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে গঠনমূলক-ভাবে লাভ করবার অভিলাষী হচ্ছে। প্রতিটি ব্যক্তি প্রকৃতির সঙ্গে সৌসাদৃশ্য স্থাপন ক'রে চলে। এই ভাবে মানবতা প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে,

একত্রিত হয় এবং সমাজ প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে যায়। সমাজতন্ত্র হচ্ছে সমাজোন্নয়নের বিশেষ স্তর—যার মধ্যে সমাজ ও প্রকৃতির ঐক্য পরিপূর্ণতা লাভ করে। সমাজের ধনতান্ত্রিক স্তর অধিক সংখ্যক গণমানসকে জীবনের যথাযোগ্য উপাদান থেকে বঞ্চিত করে, জনতার সামঞ্জস্য বিধানে এবং সমাজ ও প্রকৃতির ঐক্য সাধনে এক বিরাট বাধাস্বরূপ হ'য়ে দাঁড়ায়।

যখন সমাজ সমাজতান্ত্রিক ধাপে পৌঁছায় এবং সমাজ ও প্রকৃতির ঐক্য-সাধন পরিপূর্ণতা লাভ করে, তখন অহংভাব জীবনযাত্রার সুযোগসমূহের প্রতি প্রতিক্রিয়া ঘটায় এবং বিপুল গণজীবনের চেতনশীল উন্নতিতে এক সংযোগ সাধন করে। অহংভাব এবং জীবনযাত্রার সুযোগসমূহের প্রতিক্রিয়া থেকে যে সংযোগ সাধিত হয়, তা হচ্ছে আত্মিক ব্যক্তিত্ব। মানুষ তখন জীবনের এমন এক স্তরে প্রবেশ করে—যেখানে অহংভাব আত্মিকশক্তির উন্নতি সাধন করে এবং সামাজিক পরিবেশ নির্ধারণ করে ও পরস্পর পরিবর্তিত হয়। ক্রমে এক সগুণ ভাবের মধ্যে এসে তার অহমিকা বিদূরিত হয়, আত্মার উন্নততর প্রকাশ ঘটে এবং সমাজ ও প্রকৃতির সঙ্গে সে অধিকতর রূপে একত্রিত হয়। এইরূপে সমাজতন্ত্রের মধ্যে অহংভাব নিজেকে চূড়ান্তরূপে দান করবার অবস্থাগুলি খুঁজে পায়। সমাজবাদ নিজেকে সমাজের সাম্যবাদী স্তরে রূপান্তরিত করে ; যখন অহঙ্কার লোপ পায়, গণজীবন তখন আত্মিক ব্যক্তিত্বে উদ্বুদ্ধ হয়। সমাজবাদ থেকে সাম্যবাদে রূপান্তর উৎপাদন শক্তির বিশেষ স্তর নয়, অধিকন্তু জন-সাধারণের মানসিক উন্নতির একটি বিশিষ্ট পর্যায়।

এই দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিতে প্রকৃতি এবং সমাজের পৃথকিকরণ প্রবৃত্তি হ'তে প্রকৃতি এবং সমাজের মধ্যে সাদৃশ্যের দিকে মানুষের ধারণাগুলি সাধারণতঃ রূপান্তরিত হয়ে থাকে। এই সাদৃশ্য সমাজ এবং প্রকৃতির সামগ্রিকতার মধ্যেও মানুষের একীভূত ভাবরাজ্যে বিরাজ করে এবং বেঁচে থাকে। সমাজ এবং মানুষের মানসিক দিক থেকে এই একীভূত ভাব হচ্ছে আত্মার সর্বোচ্য গুণগত পরিবর্তন-প্রকৃতি। আত্মার এবং চরম বাস্তবতার দিক থেকে সার্বভৌম ঐক্য হচ্ছে উচ্চতম গুণগত পরিবর্তন। ঐক্য নির্ভর করে চরম সত্য এবং চরম মূল্যের গুণাবলীর উপরে। যেমন সমাজ পরিবর্তনশীল,—মূল্যবোধ নিম্নতর হতে উচ্চতর দিকে, জ্ঞানের দিক থেকে মনের দিকে, বাস্তবতার দিক থেকে আত্মশক্তির দিকে এবং বর্তমান থেকে চরমতার দিকে পরিবর্তিত

হয়, তেম্‌নি সত্যের ধারণাও নিম্নতর দিক হতে উচ্চতর দিকে, আপেক্ষিকতার দিক থেকে চরমতার দিকে এবং ক্ষণস্থায়ী থেকে স্থিতিশীলতার দিকে পরিবর্তিত হয়।

সমাজের প্রতিটি পরিবর্তনশীল দিকে সত্য এবং মূল্য আপেক্ষিক। এই আপেক্ষিক সত্য এবং মূল্যগুলি সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়, এবং চরম সত্যের ও চরম মূল্যের উচ্চতর পরিবর্তন সাধন করে।

চরম ঐক্য সর্বোচ্যতম দ্বন্দ্বমূলক প্রগতি, পরিপূর্ণ ঐক্য মানবজাতির উন্নতির পরিপূর্ণ স্তর। চরম ঐক্য হচ্ছে গুণগত সংযুক্তি সাধন, সমাজের প্রতিটি স্তরের মধ্যে সর্বদা সঞ্চারমান। চরম ঐক্য এবং মূল্যও জীবনের প্রতিটি দিকে সঞ্চরণশীল এবং গুণগত সংযোগরূপে উপস্থিত। সমগ্র ইতিহাসে গুণের সংযোগাবলী সমাজের প্রতিটি পরিবর্তনের মুখে উপস্থিত হয়। সুতরাং মানবজন্ম এবং প্রগতি হচ্ছে আত্মিক ব্যক্তিত্বে উন্নতি। মানুষ তার নিজেরই প্রয়োজনে সৃষ্টি করে শুভ জীবনযাত্রা। মানুষ্যত্বের সংগ্রাম হচ্ছে সমাজের সেই স্তরের উন্নতির জন্য—যা সুষ্ঠু আত্মিক বিকাশের সম্পূর্ণ পক্ষে।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য

দিনের সুতীব্র আহ্বান হচ্ছে আমাদের দেশে একচেটিয়া ধনবাদী এবং জমিদারী সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করা—যা আমাদের নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মূল্যাবলীকে খাটিয়ে নিজের মধ্যে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক শক্তি পুঞ্জীভূত করে। আত্মোপলব্ধির দিকে প্রতিটি ব্যক্তির—যাদের লক্ষ্য হচ্ছে একত্রে সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচার এবং রাজনীতির আত্মম্ভরিতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, তাদের—উন্নতি এইরূপে যে কোনো দেশেরই সরকারী নীতির পরাজয় দাবী করে। বর্তমান সামাজিক অবস্থা এবং আমাদের শাসনতন্ত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বীকার করে, এর পবিত্রতার আশ্বাস দান করে, এবং লক্ষ লক্ষ লোককে যথোপযুক্ত অংশ হতে বঞ্চিত করে। লক্ষ লক্ষ মধ্যশ্রেণীর লোক, কৃষক এবং কারিগরী বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি তাদের স্ব স্ব সম্পত্তি সংরক্ষণ এবং বৃদ্ধি করতে ভীত। তারা যদিও আত্মবিকাশ চায়, কিন্তু দারিদ্র্যভারে তারা নত, এবং সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য সময় ও অবসর থেকে বঞ্চিত।

আত্মোপলব্ধি আসে স্বাস্থ্যকররূপে বাঁচবার তাগিদে। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য ব্যয় হয়।

সম্পত্তির উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা মানুষকে নীতিজ্ঞানহীন করে, আত্মশ্লাঘাপুষ্ট করে। এটি একটি ভারস্বরূপ এবং আত্মাকে বাড়তে দেয় না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি শক্তিকে আচ্ছন্ন করে এবং দৃষ্টিশক্তিকে খর্ব করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে বিলোপসাধন ক'রে মানুষ প্রকৃত সুন্দর, স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লাভ করে, মানুষ জীবনকে অপচয় করে না, ক্লান্তিতে এবং বিরক্তিপূর্ণভাবে বিষয়ানুসন্ধান করে না। সম্পত্তিতে আসক্তিহীনতা ব্যক্তিত্ববিকাশের পথ সুগম করে, যা কোনো একনায়কতন্ত্র, কর্তৃত্বপ্রবৃত্তি অথবা কোনো বাধাপূর্ণ পদ্ধতির মধ্যে সম্ভব হয় না। সমাজবাদে প্রতিটি ব্যক্তি সমাজের সমৃদ্ধি এবং সুখে অংশগ্রহণ করে। সমাজবাদ মূল্যবান--কারণ তা মানুষকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দিকে নিয়ে যায়, উৎপাদনযন্ত্র এবং তার বিতরণ পদ্ধতিকে সমাজিকরণ করে, উৎপাদন সম্বন্ধীয় সমতাকে ত্বরান্বিত করে, শোষক ও শোষিতের সম্বন্ধকে উচ্ছেদ করে, ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সাধারণের সম্পদে পরিণত করে, ইচ্ছাকৃত কার্যকে এবং সহযোগিতার প্রবৃত্তিকে বদলে দিয়ে অর্থলুব্ধ কার্যে এবং প্রতিযোগিতার পক্ষে সমাজবাদ সমাজকে ফিরিয়ে আনে তার সঠিক অবস্থায় পরিপূর্ণ সুস্থ যন্ত্ররূপে।

সমাজবাদ সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির বাস্তবসুখ বিধান করে—যা আত্মিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাথমিক সর্ত। তা জীবনকে তার সঠিক এবং প্রয়োজনীয় পরিবেশ দান করে। সমাজবাদে জীবন সর্বোচ্য সম্পূর্ণতার দিকে উন্নত হয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকশিত হয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অধিকতর সুন্দর, স্বকীয় ভাবের চাইতে আরও গভীর। সমাজবাদী সমাজে মানুষ নিজেকে তার মধ্যে দেখতে পায় এবং আত্মোপলব্ধি অনুসন্ধান করে, কর্মের মধ্যে সমাজে বাস করে। সর্বব্যাপী আত্মা নিজেকে অপরের মধ্যে এবং অপরকে নিজের মধ্যে দর্শন করে। সে সর্বতোভাবে চিন্তাশীল হয়, অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান ক'রে চলে, মানবতাকে ভালোবাসে এবং ঈশ্বরের রাজত্ব নিজের অন্তরে উপভোগ করে।

সমাজবাদে শ্রমিক এবং কৃষক মুক্ত হ'য়ে নিজেদের উন্নত বোধ করে। সে স্বেচ্ছায় এবং স্বাধীনভাবে উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে। প্রকৃত ব্যক্তিত্ব তার

মধ্যে সরল ও স্বাভাবিক ভাবে বর্ধিত হয়। সে তার কাজে হৃদয়-মন সন্নিবেশ ক'রতে পারে, কাজকে উপভোগ ক'রতে পারে, এবং কাজের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ উপলব্ধি ক'রতে পারে। যখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তার মধ্যে স্বাধীনভাবে চ'লতে পারে, এবং আত্মিক ব্যক্তিত্বের বাস্তবতা প্রকাশ পায়, তখন সে সর্বাপেক্ষা উন্নততর উৎপাদন-শক্তিরূপে রূপান্তরিত হয়। সে নিজের এবং সমাজের জন্য উৎপাদন করে এবং তার নিজের কাজের মধ্যে আত্মোপলব্ধি ও সর্বাপেক্ষা বেশী আনন্দ অন্বেষণ করে। নিজেকে আবৃত ক'রে ফুলের মতো সে তখন জন্মলাভ করে। সকল বিষয় তার নিকট জ্ঞাত। সে অপরকে জ্ঞান দান ক'রতে যায় না অথবা অপরকে তার নিজের ইচ্ছানুযায়ী বাঁচতে বলে না। সে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে। যখন আত্মশ্লাঘাবিরোধী, তখন অহংভাবের উর্ধ্বে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ স্বাধীনভাবে চল্‌তে পারে, কর্তৃত্বের প্রয়োগ কৃত্রিমরূপ লাভ করে উৎপাদন এবং বিতরণে। নরনারীর গুণাবলী সমভাবে একত্রিত হয়ে অভূতপূর্বরূপে পারস্পরিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় এবং সমাজকে সাম্যবাদের দিকে পরিচালিত করে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ আত্মিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে জন্মলাভ করে। আত্মিক ব্যক্তিত্ব প্রতিটি নরনারীর মধ্যে আত্মিক চেতনার বিপদ ঘটায়। সাম্যবাদী চেতনা প্রত্যেককে অহংভাবের মধ্যে এবং আত্মশ্লাঘার মধ্যে নেমে যেতে প্রতিহত করে। আত্মিক ব্যক্তিত্ব প্রত্যেককে নির্দেশ দেয় তাকে তার সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি দিতে এবং তার প্রয়োজনীয়তাকে গ্রহণ ক'রতে। যখন আত্মিক ব্যক্তিত্ব প্রত্যেকের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে জন্মায় এবং নির্দেশক রূপ ধারণ করে, তখন রাষ্ট্রপতিত্ব রূপ পায়। সমাজের সমাজবাদী ধাপে রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র সমাজবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা নয়, অধিকন্তু মানুষ ও সমাজের মধ্যে যে শক্তিশালী সর্বব্যাপী আত্মিক-শক্তি লুক্কায়িত আছে, তাদের মানসিক উন্নতির নিশ্চয়তা দান করা।

যদি সমাজবাদী সরকার আত্মিক বিকাশের মানসিক উন্নতিবিধানে ব্যর্থ হয়, সেখানে সমাজবাদী সমাজকে সাম্যবাদের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পরিবর্তে সমাজকে স্থিতিশীল করে এবং ক্রমশঃ রাষ্ট্রীয় ধনবাদের দিকে পিছিয়ে পড়বার পথ প্রশস্ত করে। সমাজবাদী সমাজের নিশ্চয়তা হচ্ছে অধিকতর সাংস্কৃতিক উন্নতি এবং আত্মিক বিকাশ॥

॥ ভারতীয় সংস্কৃতি-চেতনায় মিলনের সুর ॥

নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি, এই হচ্ছে ভারতবর্ষের আসল রূপ। পৃথিবীর অন্যান্য যে সব দেশ, সেখানে ভারতবর্ষের মতো এত বৈচিত্র্য স্বভাবতঃই চোখে পড়ে না। এখানকার মাটির এমন এক প্রাণঃশীল মাদকতা আছে, আর প্রকৃতিতে আছে এমন এক অপূর্ব বর্ণরাগ— যা অত্যন্ত সহজেই ভারতবাসীকে একটি বিশেষ সুরের ইন্দ্রজালে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে। ফলে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যখন যুদ্ধবিগ্রহ, সমুদ্রশাসন, নানা দিগ্বিজয় বা অনুরূপ কোনো বিষয় নিয়ে প্রমত্ত হয়ে ওঠে, ভারতবর্ষ তখন মিলন ও ঐক্যের বাণী শুনিয়ে পৃথিবীবাসীকে মানবিকতাবোধে সহজ ও সুন্দর হয়ে উঠতে বলে। কারণ, ভারতবর্ষ চিরকাল জানে—বিদ্রোহ শুধু নিজের অগ্নিতেই নিজে দগ্ধ হয় না, অপরকেও দগ্ধ করে। মহাভারতকার কুরুবংশের দুর্যোধন বা দুঃশাসন চরিত্রকে যেভাবে এঁকেছেন, তার মধ্যে আমরা একথার যথেষ্ট উদাহরণ খুঁজে পাই, তেমনি ধর্মীয় ঐক্যবিদায়করূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত হন পাণ্ডবাগ্রজ যুধিষ্ঠির। মহাভারতের যে মূল বাণী ধর্ম এবং ধর্মের মধ্য দিয়ে ঐক্যসাধন, যুধিষ্ঠির হচ্ছেন তার সার্থক প্রতীক।

দ্রাবিড় সভ্যতার পর সে যুগে আর্যেরা যখন শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনেকখানি পথ অতিক্রম ক'রে এসে নগরপত্তনে ও পরিবার গঠনে মনোনিবেশ করলো, তার মধ্যে মুখ্যতঃ ছিল বহুজনহিতায় মিলনের উৎস। আর্যভারতের এই প্রস্তুতিকালের কাব্য মহাভারত। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের লক্ষ্য ছিল এই মহাকাব্যের মধ্য দিয়ে বিপুল বিরাট ভারতীয় সমাজ-মানসকে শিক্ষায়, আদর্শে ও ধর্মের পথে এক মিলনমালায় গ্রন্থীবদ্ধ ক'রে একটি সুসমঞ্জস রূপ দেওয়া।

বেদের দশম মণ্ডলেও এই মিলনের কথাই বলা হয়েছে। বলা হয়েছে— 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম', অর্থাৎ—'একত্রে চলো, একত্রে বলো, তোমাদের মন ও চিন্তা এক হোক।' অন্যত্র বলা হয়েছে—'সমভুক্তা সমন্বং যোগ।' এই বাণীর মধ্যেই বিপুলা পৃথিবীর ঐক্য নিহিত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে বললেন—

'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো,
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও,'—

এখানে ঐ একই ঐক্য, ঐ একই মিলনের বাণী বিধৃত। স্থান ভিন্ন, কাল ভিন্ন, লক্ষ্য ভিন্ন, অথচ সব কিছু মিলিয়ে এক অভিন্ন অবিভাজ্য প্রকাশ। দেবতার কথা উহ্য রেখে মানুষের জগৎ যেখানে বস্তুবাদের খাড়া পাহাড়ে উদ্যত, সেখানে মানুষে মানুষে ঐক্যগত সমত থেকেই তো সম্প্রীতির জন্ম! এই প্রীতি ভাবগত প্রীতি, মনে মুখে দু'রকম থেকে আইনগত মিলন নয়, মানসিক প্রীতির বন্ধনগত মিলন। এই বন্ধনের মূল উৎস রয়েছে ভারতবর্ষে —ভারতীয় সাংস্কৃতিক চেতনায়।

বৌদ্ধযুগে যে নব সভ্যতার জন্ম হলো, তার মূল উৎস ছিলেন বুদ্ধদেব নিজে। তিনি শুধু ব্যক্তিগত সাধনার দ্বারা পরিনির্বাণের পথই খোঁজেননি, সেই সঙ্গে পরিত্রাণের পথও ক'রে দিয়ে গেলেন মানুষের জন্য। সেই পরিত্রাণের পথ হচ্ছে দুঃখের অন্ধকার পেরিয়ে আলোর ঐক্যের পথ। তিনি বললেন— যেমন রাশি রাশি ফুল দিয়ে সুন্দর এক ছড়া মালা গাঁথা যেতে পারে, তেমনি অগণিত মানুষের শুভ মিলনে পৃথিবীতে অনেক মহৎ কাজ সংসাধিত হতে পারে। তাঁর এই বক্তব্যের মূল লক্ষ্যই হলো মানুষ। মানুষে মানুষে মিলন যত দৃঢ় হবে, পৃথিবী তত সুন্দর হবে। এ মানুষ নিশ্চয়ই জহ্লাদ বা ঘাতক নয়। এ মানুষ মমতায় ও করুণায় পবিত্র। তাদের উদ্দেশ্যেই বুদ্ধদেব বললেন, 'আত্মদীপো ভব', অর্থাৎ—'নিজেকে আলোকবর্তিকা তৈরী করো,' আর সেই সঙ্গে বললেন: 'আব্রহ্ম মৈত্রী স্থাপন করো। ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা জয় করো, অন্যায়কে ন্যায়ের দ্বারা পরিশোধন করো, ভালোবাসো— মানুষকে ভালোবেসে বিশ্বকে ভালোবাসো।'

এই বাণী সেদিন শুধু ভারতে নয়, সমগ্র এশিয়া ও ইউরোপকে গিয়েও নাড়া দিয়েছিল। সমগ্র এশিয়া মহাদেশ এসে শরণ নিল বুদ্ধের, বৌদ্ধবাদে ভ'রে গেল সারা এশিয়াখণ্ড। চীন থেকে এলেন ফা-হিয়ান, হিউ-এন-সাং আর ইটসিং বুদ্ধের এই অমৃত বাণীকে বহন ক'রে নিতে। আজকের যুদ্ধবাদী চীনের দিকে তাকিয়ে সেদিনের ইতিহাসকে উপলব্ধি করা যাবেনা। সেদিন সারা এশিয়ায় যে শ্রমণ-সঙ্গীত জেগে উঠেছিল, তা হচ্ছে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'।

কোটি কোটি মানুষের এমন অদ্ভুত মিলন পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও দেখা যায়নি।

হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের প্রভাবে যখন শঙ্করাচার্যকে কেন্দ্র ক'রে এদেশ থেকে বৌদ্ধবাদ খণ্ডিত হ'তে সুরু হলো, তখনও এখানকার দর্শনে মিলনের বাণী বিরল রইল না। হিন্দু রাজাদের থেকে শুরু ক'রে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে ঐক্য বিধানের মাধ্যমে জনজীবন সংগঠিত করবার প্রয়াস চলছিল সমানভাবে। এই প্রসঙ্গে যুগ-চেতনার বিষয়টিকেও ভুলে থাকলে চলবে না। এক একটি যুগের মধ্য দিয়ে মানুষের যে-জীবনযাত্রা নতুন ক'রে গড়ে ওঠে, তার মূলেও থাকে বহু অতীতের ঐতিহ্য। সেই জীবন-প্রবাহ থেকেই আমরা ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করার প্রয়াস পাই। হিন্দু-সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের যুগেও এই সূত্রের সার্থকতা আমাদের ইতিহাসবদ্ধ হয়ে আছে।

কিন্তু তাই ব'লে বলবো না যে মোঘল যুগে এসে ভারতবর্ষ এই ঐক্যধারা থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়েছিল। মোঘল যুগের ইতিহাসে বহু উত্থান-পতন, খুন-জখম আর যুদ্ধ-বিদ্রোহ দেখা দিলেও সে-যুগের শিল্পে ও সঙ্গীতে এমন মিলনের সুর বেজে উঠতে শোনা গেল—যা ইতিহাসের পাতাকে উজ্জ্বল ক'রে রেখেছে।

আমাদের মধ্যযুগীয় সাধক সম্প্রদায়ের জীবন থেকে এই ঐক্যসূত্র আরও বড় ক'রে পাই। তাঁরা যে সাধনা ক'রে গেছেন, তার মধ্যে মানুষের জন্যে মানুষের দরজাই খুলে দিয়ে গেছেন বিশেষ ক'রে। ভারতের যে বাউল সম্প্রদায় ঘরের বন্ধন চুকিয়ে দিয়ে পথে পথে গান গেয়ে ফিরেছে, সেই গানের মূল সুরটিই হচ্ছে মিলনের সুর।--'আমি কোথায় পাবো তারে, আমার মনের মানুষ যে রে': এখানে মানুষ থেকে ভাব ক্রমে অতিমানুষে গিয়ে পৌছেচে। মানুষের সঙ্গে মিলনের মধ্য দিয়েই যে জীবন-দেবতার সঙ্গে মিলন! বাউলদের মতো এতবড় দর্শন পৃথিবীর কোনো সাহিত্যে কখনও পরিবেশিত হয়নি। আমাদের লোকসাহিত্য ও লোকসঙ্গীতের মধ্যেও এই সুরেরই বিশেষ প্রাধান্য। নদীর বুকে নৌকো ভাসিয়ে কিম্বা চষা ক্ষেতে লাঙল চালাতে চালাতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যে-পল্লীসঙ্গীত গেয়ে বেড়ায়, সেই সঙ্গীত মানুষের কাছে মানুষের সহজ প্রাণেরই আবেদনে পূর্ণ। এইভাবেই জন্ম হ'য়েছে সংস্কৃতির।

সংস্কৃতির সংজ্ঞা হচ্ছে—বিভিন্ন ভাবধারা, জীবনচর্যা এবং আচার-আচরণের সমন্বয় সাধন। জনে জনে আর দেশে দেশে সংযুক্তি থেকেই সংস্কৃতি।

ভারতীয় সংস্কৃতির মূলে বিরাট ঐতিহ্য রয়েছে, তার কারণ, সমন্বয়বাদকে সে বড় ক'রে দেখেছে। প্রথম দেখেছে ধর্মীয় সূত্রে, তারপর সামাজিক ও দেশীয় সূত্রে। ভোগবাদের চাইতে ত্যাগবাদ এখানে বড়। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা' —এই হচ্ছে ভারতীয় আদর্শ। ভোগে আসে সমষ্টি থেকে বিচ্ছেদ, ত্যাগের দ্বারাই প্রতিটি ব্যক্তি সমষ্টির সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়—যেমন হয় প্রতিটি নদী সমুদ্রের সঙ্গে। সমুদ্র তখন মহাসমুদ্রে পরিণত হয়। মানুষের ক্ষেত্রেও তেমনি। ভারতের মর্মে এই নদী আর সমুদ্রেরই তরঙ্গ। পৃথিবী যখন ভোগবাদে জর্জরিত, ভারত তখন ত্যাগের মন্ত্র দিয়ে মিলনের বাণী শোনায় পৃথিবীকে ; পৃথিবীর অমিত্র ছন্দে মন যখন রৌদ্রতপ্ত, ভারতের মিত্রাক্ষর কাব্যের সুললিত সুর তখন বাণীবদ্ধ হ'য়ে মনকে আপনি থেকেই প্রশমিত করে। সেই বাণীর নব নব রূপায়ণ লক্ষ্য করি আমরা শ্রীচৈতন্য থেকে রামকৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ আর গান্ধীজীর মধ্যে। যে ধর্মসমন্বয়ের পথ দেখিয়ে গেলেন শ্রীচৈতন্য, তাঁর সেই বৈষ্ণবীয় সহমর্মিতাকেই আবার নতুন ক'রে পেলাম রামকৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দের জীবনসাধনায়। মিলনের যাদুমন্ত্রে তাঁরা এসে নতুন প্রাণচেতনার সঞ্চার ক'রে গেলেন মানুষের মধ্যে। কেশবচন্দ্র আনলেন সর্বধর্মসমন্বয়ে নববিধান, বিবেকানন্দ শোনালেন বিশ্বজনমনের ঐক্যবিধায়ক সুর। দেওয়া-নেওয়ার এই যে বিরাট মিলনক্ষেত্র ভারতবর্ষ, তাকেই লক্ষ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ বললেন—

> 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে,
> এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।'...

উনিশ শতক ও বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত এই মিলন প্রধানতঃ ছিল সংস্কৃতিকেন্দ্রিক। পরবর্তী অধ্যায়ে এসে তার সঙ্গে বৃহত্তরভাবে যুক্ত হয়েছে রাজনীতি। এ সময়ে সর্বজাগতিক ক্ষেত্রে যেমন সন্দেহবাদ বড় আকারে জেগে উঠেছে, তেমনি অর্থনৈতিক বনিয়াদ ভেঙে প'ড়ে মানুষের নৈতিক মান একেবারেই নিম্নগামী হয়ে পড়েছে। এখানে ব্যক্তির স্বার্থ ব্যক্তিবিশেষে যেভাবে দেখে থাকে, সমষ্টির স্বার্থের ক্ষেত্রে তা নয়। বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষের মতো পরিবেশে যেখানে তৃতীয় পক্ষীয় রাজনীতির চালে দেশ বিভক্ত হ'তে বাধ্য হয়েছে, সেখানে এককালের মিত্র অন্যকালের শত্রুতে

পরিণত হ'তে বাধ্য। কিন্তু রাজনীতির দাবার চালের এই বাধ্যবাধকতাকে ভারতবর্ষ মূলতঃ স্বাভাবিক অন্তরে স্বীকার ক'রে নিতে পারেনি। তাই বার বার সে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার অক্ষুণ্ণতা ও স্থায়ী নিরাপত্তার জন্ত শান্তি ও দেশে দেশে মৈত্রী স্থাপনের উদ্যোগী হয়েছে। রাজনীতির বিচারে এর ফল যাই হোক্ না কেন, সংস্কৃতিক্ষেত্রে তার এই ঐক্যবোধের মূল্যায়ণ অসাধারণ। তার এই জাতীয় সত্তার বোধ ধার করা নয়, বরং তার আপন অনুভবে উচ্ছ্বত।

চিরকালের অতিথিবৎসল ভারতবর্ষ আতিথ্যের মধ্য দিয়েই মানুষের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। রাজনীতি বা অর্থনীতির তিক্ততায় তার মূল প্রাণরস কোথাও শুকিয়ে যায় নি; সে বহুর সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পেরেই ভূমা-সুখ উপলব্ধি করেছে। তার কথা হচ্ছে—'ভূমৈব সুখম, নাল্পে সুখমস্তি।' ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্তরঙ্গ সুরটিই হচ্ছে এই ভূমার সঙ্গে মিলনের সুর।

॥ রবীন্দ্র-সংস্কৃতির আলোকে ভারত ও যবদ্বীপ ॥

বহির্বিশ্ব থেকে রবীন্দ্রনাথ যেমন নানা ভাব-তরঙ্গ এনে স্বদেশের সাগর-বেলায় যৌবনের হিল্লোল সৃষ্টি করেছেন, তেমনি স্বদেশের অপরূপ রূপসম্পদে সাজিয়ে তুলেছেন তিনি বৃহত্তর পৃথিবীর ভাবমানসকে। দেখেছেন—মানুষ সর্বত্রই এক, মূলতঃ সে পৃথক নয়, পার্থক্য শুধু ভৌগোলিক সীমায়, পার্থক্য শুধু সংস্কারগত জীবন-চর্যায়। তাদের মধ্যে যারা একদা ভারতবর্ষের স্পর্শ অনুভব করেছে, তারা ভারতীয় নাড়ীর সঙ্গে একত্রে মিশে গিয়ে ভারত-সংস্কৃতিকেই বহন ক'রে নিয়ে গেছে পৃথিবীর বৃহত্তর ভূগোল-রেখার দূর-দূর সীমান্তে। কত শতাব্দী ধ'রে যে একাজ হয়েছে, ইতিহাস তার সব খবর ধ'রে রাখতে পারে নি। কবি তাকে আবিষ্কার করেছেন, ইতিহাসের অতীত থেকে উদ্ধার করেছেন সেই প্রাচীন সত্যের ইতিবৃত্ত।

এমনি একটি আবিষ্কার তাঁর যবদ্বীপ। প্রাচীনতম ভারতবর্ষের পায়ের ছাপ বুঝি খুঁজে পাওয়া গেল এখানকার সাগর আর শিলাবেষ্টিত সোপান-শ্রেণীতে। ১৩৩৪ সালের ১লা শ্রাবণ লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'ভারতবর্ষের বিদ্যা একদিন ভারতবর্ষের বাইরে গিয়েছিল। কিন্তু সেই বাইরের লোক তাকে স্বীকার করেছে। তিব্বত, মঙ্গোলীয়া, মালয়দ্বীপ—সর্বত্র ভারতবর্ষ জ্ঞানধর্ম বিস্তার করেছিল, মানুষের সঙ্গে মানুষের আন্তরিক সত্যসম্বন্ধের পথ দিয়ে।

'ভারতবর্ষের সেই সর্বত্র প্রবেশের ইতিহাসের চিহ্ন দেখবার জন্যে আজ আমরা তীর্থযাত্রা করেছি। সেই সঙ্গে এই কথাও দেখবার আছে, সেদিনকার ভারতবর্ষের বাণী শুষ্কতা প্রচার করে নি। মানুষের ভিতরকার ঐশ্বর্যকে সকল দিকে উদ্বোধিত করেছিল—স্থাপত্যে ভাস্কর্যে চিত্রে সঙ্গীতে সাহিত্যে। তারই চিহ্ন মরুভূমে অরণ্যে পর্বতে দ্বীপে দ্বীপান্তরে, দুর্গম স্থানে, দুঃসাধ্য কল্পনায়। সন্ন্যাসীর যে মন্ত্র মানুষকে রিক্ত করে নগ্ন করে, মানুষের যৌবনকে পঙ্গু করে, মানবচিত্তবৃত্তিকে নানাদিকে খর্ব করে, এ সে মন্ত্র নয়। এ জরাজীর্ণ কৃশপ্রাণ বৃদ্ধের বাণী নয়, এর মধ্যে পরিপূর্ণ প্রাণ বীর্যবান যৌবনের প্রভাব।'

যবদ্বীপযাত্রায় কবির অন্যতম সঙ্গী ছিলেন অধ্যাপক সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায়। সুনীতিকুমারের সুগভীর দৃষ্টি ও তত্ত্বানুসন্ধানপ্রবণতা রবীন্দ্রনাথের কাজের অনেকখানি সহায়ক হয়েছিল সন্দেহ নেই। আনন্দের সঙ্গে তাই তিনি বলেছিলেন: 'সুনীতিকে উপাধি দেওয়া উচিত—লিপিবাচস্পতি কিম্বা লিপি-সার্বভৌম কিম্বা লিপিচক্রবর্তী।' একথার সার্থক প্রমাণ পাওয়া যাবে সুনীতি-কুমারের 'রবীন্দ্র-সঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ' গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথ যেখানে শুধু চিঠির মাধ্যমে যবদ্বীপের খণ্ড খণ্ড চিত্র ও কাব্যের মাধ্যমে তার প্রতি অভিনন্দন প্রকাশ করেছেন, সুনীতিকুমার তাঁর গ্রন্থে তত্ত্ব ও তথ্যের কোনো দিক বর্জন না ক'রে বিস্তৃতভাবে তার ঐতিহাসিক চিত্র এঁকেছেন। সেই চিত্রের যিনি মূলকেন্দ্র, তিনি রবীন্দ্রনাথ।

যবদ্বীপের মলাক্কা, গিয়ানয়ার, টাইপিঙ, বাটাভিয়া, বালি, সুরবায়া—(জাভা)—সুরকর্তা—যোগ্যকর্তা, বানডুঙ (ডাগো), বোরোবুদুর, সিয়াম প্রভৃতি অঞ্চলেই তিনি গিয়েছেন, দেখেছেন—

'সেদিনকার ভারতবর্ষের সেই আত্মমূর্তিধ্যান সমুদ্র পার হয়ে পূর্ব মহা-সাগরের এই সুদূর দ্বীপপ্রান্তে এমন ক'রে স্থান পেয়েছিল যে, আজ হাজার বছর পরেও সেই ধ্যানমন্ত্রের আবৃত্তি এখানকার রাজার মুখে ভক্তির সুরে বেজে উঠলো, এতে আমার মনে ভারী বিস্ময় লাগলো। এইসব ভৌগোলিক নামমালা এদের মনে আছে বলে নয়, কিন্তু যে প্রাচীন যুগে এই নামমালা এখানে উচ্চারিত হয়েছিল, সে যুগে এই উচ্চারণের কী গভীর অর্থ ছিল, সেই কথা মনে করে। সেদিনকার ভারতবর্ষ আপনার ঐক্যটিকে কত বড আগ্রহের সঙ্গে জানছিল আর সেই জানাটিকে স্থায়ী করবার জন্যে, ব্যাপ্ত করবার জন্যে, কিরকম সহজ উপায় উদ্ভাবন করেছিল, তা স্পষ্ট বোঝা গেল আজ এই দূর দ্বীপে এসে—যে দ্বীপকে ভারতবর্ষ ভুলে গিয়েছে।'

ভারতবর্ষীয় রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণোক্ত কাহিনীসমূহও যে যবদ্বীপে অপ্রচলিত নয়, তারও পরিচয় আছে রবীন্দ্রনাথের এ সময়কার রচনায়। তবে উভয়দেশীয় রামায়ণ-মহাভারতে পার্থক্যও যে অনেক ক্ষেত্রে প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে, কবির রচনায় তার স্পষ্ট উল্লেখ পাই। গিয়ানয়ার রাজপ্রাসাদ থেকে ১৯২৭ সালের ১লা আগষ্ট তিনি রানী মহলানবীশকে যে পত্র লেখেন, তাতে তিনি এ বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেছেন। ইতিহাসের দিক থেকেই এখানে তার বিস্তারিত উদ্ধৃতি প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

—'সেকালের ভারতবর্ষের যা কিছু বাকী আছে, তার থেকে ভারতের তখনকার কালের বিবরণ অনেকটা আন্দাজ করা যায়। এখানে হিন্দুধর্ম প্রধানতই শৈব। দুর্গা আছেন, কিন্তু কপালমালিনী লোলরসনা উলঙ্গিনী কালী নেই। কোনো দেবতার কাছে পশুবলি এরা জানে না। কিছুকাল আগে অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ উপলক্ষে পশুবধ হতো, কিন্তু দেবীর কাছে জীবরক্ত নৈবেদ্য দেওয়া হতো না। এর থেকে বোঝা যায়, তখনকার ভারতবর্ষে ব্যাধ-শবরদের উপাস্য দেবতা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুমন্দিরে প্রবেশ ক'রে রক্তাভিষিক্ত দেবপূজা প্রচার করেন নি।

'তার পরে, রামায়ণ মহাভারতের যে সকল পাঠ এদেশে প্রচলিত, আমাদের দেশের সঙ্গে তার অনেক প্রভেদ। যে যে স্থানে এদের পাঠান্তর, তার সমস্তই যে অশুদ্ধ, এমন কথা জোর ক'রে বলা যায় না। এখানকার রামায়ণে রাম সীতা ভাইবোন; সেই ভাইবোনে বিবাহ হয়েছিল। একজন ওলন্দাজ পণ্ডিতের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল; তিনি বললেন, তাঁর মতে এই কাহিনীটাই প্রাচীন, পরবর্তীকাল এই কথাটাকে চাপা দিয়েছে।

'এই মতটাকে যদি সত্য ব'লে মেনে নেওয়া যায়, তা হলে রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে মস্ত কয়েকটি মিল দেখতে পাই। দুটি কাহিনীরই মূলে দুটি বিবাহ। দুটি বিবাহই আর্যরীতি অনুসারে অসংগত। ভাই-বোনে বিবাহ বৌদ্ধ ইতিহাসে কোনো কোনো জায়গায় শোনা যায়, কিন্তু সেটা আমাদের সম্পূর্ণ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। অন্যদিকে এক স্ত্রীকে পাঁচ ভাইয়ে মিলে বিবাহও তেমনি অদ্ভুত ও অশাস্ত্রীয়। দ্বিতীয় মিল হচ্ছে দুই বিবাহেরই গোড়ায় অস্ত্র পরীক্ষা, অথচ সেই পরীক্ষা বিবাহযোগ্যতা প্রসংগে নিরর্থক। তৃতীয় মিল হচ্ছে দুটি কন্যাই মানবীগর্ভজাত নয়—সীতা পৃথিবীর কন্যা, হলরেখার মুখে কুড়িয়ে পাওয়া; কৃষ্ণা যজ্ঞসম্ভবা। চতুর্থ মিল হচ্ছে উভয়ত্রই প্রধান নায়কদের রাজ্যচ্যুতি ও স্ত্রীকে নিয়ে বনগমন। পঞ্চম মিল হচ্ছে দুই কাহিনীতেই শত্রুর হাতে স্ত্রীর অবমাননা ও সেই অবমাননার প্রতিশোধ।

'সেইজন্যে আমি পূর্বেই অন্যত্র এই মত প্রকাশ করেছি যে, দুটি বিবাহই রূপকমূলক। রামায়ণের রূপকটি খুবই স্পষ্ট। কৃষির হলবিদারণ রেখাকে যদি কোনো রূপ দিতেই হয়, তবে তাকে পৃথিবীর কন্যা বলা যেতে পারে। শস্যকে যদি নবদূর্বাদলশ্যাম রাম ব'লে কল্পনা করা যায়, তবে সেই শস্যও তো

পৃথিবীর পুত্র। এই রূপক অনুসারে উভয়ে ভাই-বোন আর পরস্পর পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ।

'হরধনুভঙ্গের মধ্যেই রামায়ণের মূল অর্থ। বস্তুত সমস্তটাই হরধনুভঙ্গের ব্যাপার—সীতাকে গ্রহণ রক্ষণ ও উদ্ধারের জন্যে। আর্যাবর্তের পূর্ব অংশ থেকে ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত কৃষিকে বহন ক'রে ক্ষত্রিয়দের যে অভিযান হয়েছিল, সে সহজে হয়নি; তার পিছনে ঘরে বাইরে মস্ত একটা দ্বন্দ্ব ছিল। সেই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস রামায়ণের মধ্যে নিহিত, অরণ্যের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের দ্বন্দ্ব।

'মহাভারতের খাণ্ডববন-দাহনের মধ্যেও এই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের আভাস পাই। সেও বনের গাছপালা পোড়ানো নয়, সেদিন বন যে প্রতিকূল মানব-শক্তির আশ্রয় ছিল, তাকে ধ্বংস করা। এর বিরুদ্ধে কেবল যে অনার্য তা নয়, ইন্দ্র যাদের দেবতা, তাঁরাও ছিলেন। ইন্দ্র বৃষ্টি বর্ষণে খাণ্ডবের আগুন নেবাবার চেষ্টা করেছিলেন।

'...ভারতবর্ষে একটা দ্বন্দ্ব ছিল অরণ্যের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের, আর একটা দ্বন্দ্ব বেদের ধর্মের সঙ্গে কৃষ্ণের ধর্মের। লঙ্কা ছিল অনার্যশক্তির পুরী, সেইখানে আর্যের হলো জয়; কুরুক্ষেত্র ছিল কৃষ্ণবিরোধী কৌরবের ক্ষেত্র, সেইখানে কৃষ্ণভক্ত পাণ্ডব জয়ী হলেন। সব ইতিহাসেই বাইরের দিকে অন্ন নিয়ে যুদ্ধ, আর ভিতরের দিকে তত্ত্ব নিয়ে যুদ্ধ।...এক সময়ে ভারতবর্ষে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ প্রবল হয়েছিল; এক পক্ষ বেদমন্ত্রকেই ব্রহ্ম বলতেন, অন্য পক্ষ ব্রহ্মকে পরমাত্মা বলে জেনেছিলেন। বুদ্ধদেব যখন তাঁর ধর্মপ্রচার সুরু করেন, তার পূর্বেই ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে মতের দ্বন্দ্ব তাঁর পথ অনেকটা পরিষ্কার করে দিয়েছে।'

এরকম বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা এর আগে অন্যত্র কোথাও ঘটে নি। এ আলোচনার জন্যে এরকম একটি চিঠির উপলক্ষে গিয়ানয়ার রাজ-প্রাসাদের প্রয়োজন ছিল। অত্যন্ত পরিচিত বিষয়কেও বিস্তারিত করবার জন্যে পরিবেশের প্রভাব যে কত প্রবল হ'তে পারে, রবীন্দ্রনাথের যবদ্বীপ ভ্রমণ তার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

এখানকার জাভার রাজধানী বাটাভিয়া ও বালিদ্বীপ সম্পর্কে পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লিখিত পত্রে (৩০শে আগস্ট, ১৯২৭) তিনি লিখেছেন :

...পিনাঙ থেকে জাহাজে চড়ে প্রথমে জাভার রাজধানী বাটাভিয়ায় এসে

পৌঁছানো গেল। আজকাল পৃথিবীর সর্বত্রই বড়ো শহর মাত্রই দেশের শহর নয়. কালের শহর। সবাই আধুনিক। সবাই মুখের চেহারায় একই। কেবল বেশভূষার কিছু তফাৎ। আমরা চিৎপুর বিভাগের পুরবাসী, বাটাভিয়ায় এসে মনে হয় কৃষ্ণপক্ষ থেকে শুক্লপক্ষে এলুম। হোটেলের খাঁচায় ছিলেম দিন তিনেক; অভ্যর্থনার ত্রুটি হয়নি। বাটাভিয়া থেকে জাহাজে ক'রে বালিদ্বীপের দিকে রওনা হলুম। ঘণ্টা কয়েকের জন্যে সুরবায়া শহরে আমাদের নামিয়ে নিলে। এও একটা আধুনিক শহর; জাভার আত্মিক নয়, জাভার আনুষঙ্গিক। আলাদিনের প্রদীপের মন্ত্রে শহরটাকে নিউজীলণ্ডে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেও খাপছাড়া হয় না। পার হয়ে এলাম বালিদ্বীপে, দেখলেম ধরণীর চিরযৌবনা মূর্তি। এখানে প্রাচীন শতাব্দী নবীন হয়ে আছে। এখানে মাটির উপর অন্নপূর্ণার পাদপীঠ শ্যামল আস্তরণে দিগন্ত থেকে দিগন্তে বিস্তীর্ণ, বনচ্ছায়ার অঙ্কলালিত লোকালয়গুলিতে স্বচ্ছল অবকাশ। সেই অবকাশ উৎসবে অনুষ্ঠানে নিত্যই পরিপূর্ণ।...জাপানের সঙ্গে এখানকার প্রাকৃতিক অবস্থার মিল আছে। জাপানের মতই এখানে দ্বীপটি আয়তনে ছোট, অথচ এখানে প্রকৃতির রূপটি বিচিত্র এবং তার সৃষ্টিশক্তি প্রবলভাবে উর্বরা। পদে পদেই পাহাড় ঝরণা নদী প্রান্তর অরণ্য অগ্নিগিরি সরোবর। অথচ দেশটি চলাফেরার পক্ষে সুগম, নদীপর্বতের পরিমাণ ছোটো·· জাপানের সঙ্গে এর মস্ত একটা তফাৎ। জাপান শীতের দেশ, জাভা বালি গরমের দেশ।'

বালি সম্পর্কেই রথীন্দ্রনাথকে লিখতে গিয়ে কবি লিখেছেন:

'বালিদ্বীপটি ছোট, সেইজন্যেই এর মধ্যে এমন একটি সুসজ্জিত সম্পূর্ণতা। গাছে-পালায় পাহাড়ে ঝরণায় মন্দিরে-মূর্তিতে কুটীরে ধানখেতে হাটে-বাজারে সমস্তটা মিলিয়ে যেন এক। বেখাপ কিছু চোখে ঠেকে না। ওলন্দাজ গভর্নমেণ্ট বাইরে থেকে কারখানাওয়ালাদের এই দ্বীপে আসতে বাধা দিয়েছে; মিশনারিদেরও এখানে আনাগোনা নেই। এখানে বিদেশীদের জমি কেনা সহজ নয়, এমন কি চাষবাসের জন্যেও কিনতে পারে না। আরবি মুসলমান, গুজরাটের খোজা মুসলমান, চীনদেশের ব্যাপারীরা এখানে কেনাবেচা করে —চারদিকের সঙ্গে সেটা বেমিল হয় না। ·· এখানে খেতে জলসেচের আর চাষবাসের যে রীতিপদ্ধতি সে খুব উৎকৃষ্ট। এরা ফসল যা ফলায়, পরিমাণে তা অন্য দেশের চেয়ে অনেক বেশি।'

'বালি' সম্পর্কে কবির দীর্ঘ কবিতাটিও এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রচনাকাল ১লা অক্টোবর, ১৯২৭, সায়র জাহাজ। কবি লিখেছেন :

সাগরজলে সিনান করি সজল এলোচুলে
বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে।
শিথিল পীতবাস
মাটির 'পরে কুটিলরেখা লুটিল চারিপাশ।
নিরাবরণ বক্ষে তব নিরাভরণ দেহে
চিকন সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।
মকরচূড় মুকুটখানি পরি ললাট 'পরে
ধনুকবান ধরি দখিন করে
দাঁড়ানু রাজবেশী···
কহিনু, 'আমি এসেছি পরদেশী।'
চমকি ত্রাসে দাঁড়ালে উঠি শিলা-আসন ফেলে।
শুধালে, 'কেন এলে ?'
কহিনু আমি, 'রেখো না ভয় মনে,
পূজার ফুল তুলিতে চাহি তোমার ফুলবনে।'···

কবির 'বোরোবুদুর' শীর্ষক কবিতাটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। এই কবিতাটি রচনা করেন তিনি—২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৭। লেখেন—

"সেদিন প্রভাতে সূর্য এই মত উঠেছে অম্বরে,
অরণ্যের বন্দনমর্মরে ;
নীলিম বাষ্পের স্পর্শ লভি
শৈলশ্রেণী দেখা দেয় যেন ধরণীর স্বপ্নচ্ছবি।

··· ···

তাই আসিয়াছে দিন,
পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন,
আবার তাহারে
আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে

শুনিবারে
পাষাণের মৌনতটে যে বাণী রয়েছে চির স্থির…
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র, 'বুদ্ধের শরণ লইলাম।'

'বোরোবুদুর' সম্পর্কে বলতে গিয়ে মীরা দেবীকে এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

'…যোগ্য থেকে গিয়েছিলুম বোরোবুদুরে; সেখানে একরাত্রি কাটিয়ে এলুম।…প্রথমে দেখলুম, মুনডুঙ ব'লে এক জায়গায় একটি ছোট মন্দির। ভেঙেচুরে পড়ছিল, সেটাকে এখানকার গভর্নমেণ্ট সারিয়ে দিয়েছে। গড়নটি বেশ লাগলো দেখতে। ভিতরে বুদ্ধের তিন ভাবের তিন বিরাট মূর্তি। স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখলেম।…নিশ্চয় দীর্ঘকাল লেগেছিল এই মন্দির তৈরি হতে; কোন একজন মানুষের আয়ুর মধ্যে এর সৃষ্টির সীমা ছিল না। এই মন্দিরকে তৈরি করে তোলবার জন্যে যে প্রবল শ্রদ্ধা সেটা তখনকার সমস্ত কাল জুড়ে সত্য ছিল।…তারপরে সেদিনের ভাষার উপর, ভাবের উপর ধুলো চাপা পড়লো; সেদিন যা অত্যন্ত সত্য ছিল, তার অর্থ গেল হারিয়ে। ঝর্ণা শুকিয়ে গেলে যেমন কেবল পাথরগুলো বেরিয়ে পড়ে, এই সব মন্দির আজ তেমনি। একে ঘিরে যে প্রাণের ধারা নিরন্তর বয়ে যেতো, সে যেমনি দূরে সরে গেল, অমনি এর পাথর আর কথা কয় না, এর উপরে সেদিনের প্রাণস্রোতের কেবল চিহ্নগুলি আছে, কিন্তু তার গতি নেই, তার বাণী নেই। মোটরগাড়ি চড়ে আমরা একদল এলুম দেখতে, কিন্তু দেখবার আলো কোথায়। মানুষের এই কীর্তি আপনার প্রকাশের জন্যে মানুষের যে দৃষ্টির অপেক্ষা করে, কতকাল হ'লো সে লুপ্ত হয়ে গেছে।…দু'জন ওলন্দাজ পণ্ডিত সমস্ত ভালো ক'রে ব্যাখ্যা করবার জন্যে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁদের চরিত্রে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সরল হৃদ্যতার সম্মিলন আমার কাছে বড় ভালো লাগলো। সব চেয়ে শ্রদ্ধা হয় এঁদের নিষ্ঠা দেখে। বোবা পাথরগুলোর মুখ থেকে কথা বের করবার জন্যে সমস্ত আয়ু দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে পাণ্ডিত্যের কৃপণতা লেশমাত্র নেই…আছে অজস্র দাক্ষিণ্য। ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ করে জেনে নেবার জন্যে এঁদেরই গুরু বলে মেনে নিতে হবে। জ্ঞানের প্রতি বিশুদ্ধ নিষ্ঠা থেকেই এঁদের

এই অধ্যবসায়। ভারতের বিদ্যা, ভারতের ইতিহাস এঁদের নিকটের জিনিস নয়, অথচ এঁদের সমস্ত জীবনের সাধনার জিনিস। আরও কয়েকজন পণ্ডিতকে দেখেছি। তাঁদের মধ্যেও সহজ নম্রতা দেখে আমার মন আকৃষ্ট হয়েছে।'

এতদ্ব্যতীত 'সিয়াম' সম্পর্কে কবির দুটি কবিতার উল্লেখ পাই। একটি প্রথম দর্শনে লিখিত, এবং শেষেরটি লিখিত বিদায়কালে, ৩০ শে আশ্বিন, ১৩৩৪। এ বিদায় শুধু সিয়াম থেকে নয়, পুরো যবদ্বীপ থেকে। এ সম্পর্কে অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গত লেখেন—

'এখানকার দেখাশোনা প্রায় শেষ হয়ে এলো। ভারতবর্ষের সঙ্গে জোড়াতাড়া-দেওয়া এদের লোকযাত্রা দেখে পদে পদে বিস্ময়বোধ হয়েছে। রামায়ণ-মহাভারত এখানকার লোকের প্রাণের মধ্যে যে কিরকম প্রাণবান হ'য়ে রয়েছে, সেকথা পূর্বেই লিখেছি। প্রাণবান বলেই এ জিনিসটা কোনো লিখিত সাহিত্যের সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি নয়। এখানকার মানুষের বহুকালের ভাবনা ও কল্পনার ভিতর দিয়ে তার অনেক বদল হয়ে গেছে। তার প্রধান কারণ, মহাভারতকে এরা নিজেদের জীবনযাত্রার প্রয়োজনে প্রতিদিন ব্যবহার করেছে। সংসারের কর্তব্যনীতিকে এরা কোনো শাস্ত্রগত উপদেশের মধ্যে সঞ্চিত পায়নি, এই দুই মহাকাব্যের নানা চরিত্রের মধ্যে তারা যেন মূর্তিমান। ভালোমন্দ নানা শ্রেণীর মানুষকে বিচার করবার মাপকাঠি এই সব চরিত্রে। এইজন্যেই জীবনের গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের এই জীবনের সামগ্রীর অনেক রকম বদল হয়েছে। কালে কালে বাঙালী গায়কের মুখে মুখে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদগুলি যেমন রূপান্তরিত হয়েছে, এও তেমনি।...

'আমি মঙ্কুনগরো উপাধিধারী যে রাজার বাড়ির অলিন্দে বসে লিখছি, চারিদিকে তার ভিত্তিগাত্রে রামায়ণের চিত্র রেশমের কাপড়ের উপর অতি সুন্দর করে অঙ্কিত। অথচ ধর্মে এঁরা মুসলমান। কিন্তু, হিন্দুশাস্ত্রের দেবদেবীদের বিবরণ এঁরা তন্ন তন্ন ক'রে জানেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূবিবরণের গিরিনদীকে এঁরা নিজেদের দেশের মধ্যেই গ্রহণ করেছেন। বস্তুত, সেটাতে কোনো অপরাধ নেই, কেন না রামায়ণ মহাভারতের নরনারীরা ভাবমূর্তিতে এঁদের দেশেই বিচরণ করছেন, আমাদের দেশে তাঁদের এমন সর্বজনব্যাপী পরিচয় নেই, সেখানে ক্রিয়াকর্মে উৎসবে আমোদে ঘরে ঘরে তাঁরা এমন ক'রে বিরাজ করেন না।...'

তেমনি রথীন্দ্রনাথকে লিখিত আর একটি পত্রে (১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯২৭) রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

…'শিবমন্দিরই এখানে (যোগ্যকর্তায়) প্রধান। শিবের নানাবিধ নাট্যমুদ্রা এখানকার মূর্তিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে তার বিস্তারিত সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। একটা জিনিস ভেবে দেখবার বিষয়। শিবকে এদেশে গুরু, মহাগুরু বলে অভিহিত করেছে। আমার বিশ্বাস, বুদ্ধের গুরুপদ শিব অধিকার করেছিলেন, মানুষকে তিনি মুক্তির শিক্ষা দেন। এখানকার শিব নটরাজ, তিনি মহাকাল, অর্থাৎ সংসারে যে চলার প্রবাহ, জন্মমৃত্যুর যে ওঠাপড়া, সে তাঁরই নাচের ছন্দে। তিনি ভৈরব, কেন না তাঁর লীলার অঙ্গই হচ্ছে মৃত্যু। আমাদের দেশে একসময়ে শিবকে দুই ভাগ করে দেখেছিল। একদিকে তিনি অনন্ত, তিনি সম্পূর্ণ, সুতরাং তিনি নিষ্ক্রিয়, তিনি প্রশান্ত, আর একদিকে তাঁরই মধ্যে কালের ধারা তার পরিবর্তনপরম্পরা নিয়ে চলেছে, কিছুই চিরদিন থাকচে না, এইখানে মহাদেবের তাণ্ডবলীলা কালীর মধ্যে রূপ নিয়েছে। কিন্তু জাভায় কালীর কোনো পরিচয় নেই। কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলারও কোনো চিহ্ন দেখা যায় না।… এখানকার পণ্ডিতদের মত এই যে, জাভানিরা ভারতবর্ষে গিয়ে অথবা এদেশে সমাগত ভারতীয়দের কাছ থেকে লোকমুখে প্রচলিত নানা গল্প শুনেছিল, সেইগুলোই এখানে রয়ে গেছে। অর্থাৎ, সে সময়ে ভারতবর্ষেই নানা স্থানে নানা গল্পের বৈচিত্র্য ছিল।'

এমান নানা ঘটনা ও শাস্ত্রীয় বিষয়বিন্যাস— যা হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয় সংস্কৃতিকে দূর প্রাচ্যে উজ্জ্বল ক'রে তুলে ধরেছে, তার বৈজ্ঞানিক যুক্তি-বিচার ও শিল্পসম্মত প্রকাশ হয়তো এত স্পষ্ট অথচ মনোরম দৃশ্যসজ্জায় মধুর হয়ে আমাদের চোখে এসে ধরা পড়তো না বা আমাদের মনকে এসে এমনভাবে নাড়া দিত না—যদি না জাভা যবদ্বীপের বিস্তৃত ভৌগোলিক পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ এমনি ক'রে নিজেকে ছড়িয়ে দিতেন। তাঁর পত্রসাহিত্য এক বিশেষতম সৃষ্টি, এই সৃষ্টির পথেই আমরা পেলাম এমন সব অবরুদ্ধ জগতের সন্ধান—যার প্রবেশপথের সদর দরজাটা কবি নিজের হাতে খুলে না দিলে আমাদের দৃষ্টিতে বা মননে এসে কোনোকালে তা ধরাই পড়তো না। যবদ্বীপে গিয়ে তিনি যেমন তাঁর ভারতবর্ষকে নতুনভাবে ও নতুন আকারে আবিষ্কার করেছেন, তেমনি তাঁর বিভিন্ন পত্রসাহিত্যের মধ্য দিয়ে যবদ্বীপের

নানা ভূমিভাগকে ও তার নিত্যদিনের আচার-আচরণ-বিশ্বাস-ধর্ম ও লৌকিকতাকে তিনি উজ্জ্বল ক'রে তুলেছেন। হাজার লোক হাজার বার এমনি করে বললেও হয়তো ঠিক বলা হতো না—যেমনটি যেমন সুন্দর ক'রে বলেছেন কবি। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা উদ্ধৃত ক'রেই বলা যায়—

'যে কবিকে আমরা কবি ব'লে সম্মান ক'রে থাকি, তার প্রতি সম্মানের মধ্যে এই সাধুবাদটুকু থাকে যে, তার একলার কথাই আমাদের সকলের কথা।'

॥ বিবর্তনের পথে ভারত-সংস্কৃতি ॥

'সংস্কৃতি' কথাটি ইংরেজি 'Culture' শব্দের ঠিক পরিপূরক নয়; তা দ্বিবিধ অর্থবাচক। তবু তার একটি বিশেষ সংজ্ঞা নিরূপন ক'রে বলা যায়—কোনো দেশকালবদ্ধ নরনারীর মনন কল্পনা, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা প্রভৃতি শুধু ধর্ম-কর্ম, শিল্পকলা আর জ্ঞান-বিজ্ঞানেই আবদ্ধ নয় এবং এদের মধ্যে শেষও নয়; জীবনের প্রত্যেকটি কর্মে ও ব্যবহারে, শীলাচরণ ও দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনচর্যার মধ্যেও তা ব্যক্ত হয়। চর্চা যেমন সংস্কৃতির লক্ষণ, চর্যা বা আচরণও তাই; এবং এক হিসেবে চর্যা বা আচরণই চর্চাকে সার্থকতা দান করে এবং উভয়ে মিলে সংস্কৃতি গ'ড়ে তোলে।

বিগত পাঁচ হাজার বছর ধ'রে সেই চর্চা এবং জীবন-চর্যা ভারতবর্ষে চ'লে আসছে। একদা তার ঐতিহ্য কত উর্ধ্বে উঠেছিল, সেকথা বলবার আগে আজকের ভারতীয় সংস্কৃতি আমাদের জীবনের এবং মননের দ্বারা কতখানি সার্থক, স্বভাবতঃই সে সম্পর্কে আলোচনার প্রশ্ন জাগে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, বিজ্ঞানের প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাতীয় কৃষ্টি আজ অনেক দূর অবধি সম্প্রসারিত হয়েছে, আমরা আজ স্পুটনিকের যুগে বাস ক'রে চাঁদে পৌছাবার অবস্থায় এসেছি; তার প্রথম ধাপে হিমালয় আগেই জয় ক'রেছি। এ যুগে যেমন বিজ্ঞান প্রসারলাভ ক'রেছে, তেমনি ভৌগোলিক সীমাও বেড়েছে; তাতে জনসংখ্যার বসবাসের সংস্থান না হোক্, মননের সাম্রাজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে সন্দেহ নেই। তাতে পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের সংযোগ বিস্তৃততর হ'য়েছে। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে বেড়েছে সভা-সমিতি, গানের আসর, জলসা, চিত্র ও মঞ্চাভিনয়। দূর থেকে দেখতে গেলে এ সবই একটা জাতির সংস্কৃতির লক্ষণ, সন্দেহ নেই।

কিন্তু যা না হ'লে সংস্কৃতি তার নিজের ঐতিহ্যে দাঁড়ায় না, তা হচ্ছে দেশগত সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের সহজিয়া ভাবটির ব্যাপকতা লাভ—যা বোধ করি আজকের মতো আর কোনো কালেই সংক্ষুব্ধ হয়নি। যে মন সত্যের সুরে বাঁধা না প'ড়লে কোনো কিছুই সত্য হ'য়ে উঠতে পারে না, আজকের যন্ত্রযুগে বৈজ্ঞানিক সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সেই মনের স্বাভাবিক

অনুভূতিপ্রধান বৃত্তিগুলির অপমৃত্যু হ'য়েছে, বলা যায়। ইতিহাস হয়তো সেই কথাই বলে, বিজ্ঞানের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে মন মেকানাইজ্‌ড হ'তে বাধ্য। আজ তাই ভারতীয় মন নানা জটিল গ্রন্থিতে জট পাকানো। সেই মনে আজ ভেজাল এসে বাসা বেঁধেছে, তা'তে সত্য নেই, সহজতা নেই, সারল্যেরও পুরোমাত্রায় অভাব দেখা দিয়েছে। ফলে দুর্নীতি বেড়েচে, স্বাধীনতার নামে অনেক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচার বেড়েছে। যে মন আজ বিজ্ঞান সৃষ্টি ক'রছে, সেই মনই আবার গানের আসরে কণ্ঠে সুর নিয়ে দেখা দিচ্ছে, কিন্তু মনের যে নিভৃত মহল, সেখানটা ফাঁকা থেকে যাচ্ছে।

আজ একদিকে যেমন আমাদের সমাজে চৌযবৃত্তি বেড়েছে, তেম্‌নি গুণ্ডাবৃত্তিও বেড়েছে; যেমন প্রসাধন ও অঙ্গসজ্জা বেড়েছে, তেম্‌নি ব্যঙ্গ আর উষ্মাও বেড়েছে। যে ভারতীয় জীবনযাত্রা সম্পর্কে একদা চীন-পরিব্রাজক ভারত-ভ্রমণে এসে ব'লেছিলেন: 'এদেশে চুরি ডাকাতি নেই', সেই দেশ আজ এজাতীয় বহু পাপে আচ্ছন্ন। অতএব সংস্কৃতি ব'লতে যে বনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে জীবনচচা ও জীবনচর্যার প্রয়োজন, সেই সহজ সরল সত্যের বনিয়াদটা আজ ভেঙে গেছে। তাই আজ যত রং বেড়েছে, ততো জৌলুষ বাড়েনি। সংস্কৃতি তাই আজ ক্ষয়গ্রস্ত, যাকে বলে—Decaying Culture. যাঁরা হাল-আমলে কল্‌ভোয়েলের বই প'ড়েছেন, কিম্বা ক্লাইভ বেল-এর Civiliza-tion-এর পাতা উল্‌টিয়েছেন, তাঁরা প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে আমাদের সাম্প্রতিক ভারতের জীবন-চর্চার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারেন।

দেখা যাবে, ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম ক'রে আমরা অনেক দূরে চ'লে যেতে পেরেও আমাদের মন তার স্থির বিন্দুতে আট্‌কে আছে। তাই মহৎ কিছু, উদার কিছু, স্থায়ী কিছু এ যুগে আশা ক'রে ব্যর্থ হ'তে হচ্ছে। অথচ তা না হওয়া অবধি ভারতের মতো কোনো দেশই নিজের ঐতিহ্য নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। আমরা আজ এই না-পারার পথে এসে দাঁড়িয়েছি।

অথচ আমাদের অতীত ঐতিহ্য তা নয়। ভারত একদিন সহজ মনে সকলের সঙ্গে মিতালী পাতিয়েছে। তার যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি তপোবন থেকে সৃষ্টি—সেই তপোবন মানুষে এবং প্রকৃতিতে মিলন ঘটিয়েছিল। যেখানে শুধু কোলাহল, শুধু লোক আর লোক—সেখানে মনোলোক স্বচ্ছন্দ

হ'য়ে উঠতে পারে না, সেখানে বিরাগের বিক্ষোভ, অনুরাগের অত্যাচার। ভূগোল বলতে সেখানে সেদিন তাই প্রাধান্য পেয়েছিল বনরাজি নীলা। প্রকৃতির সঙ্গে মন একত্র হ'য়ে গ'ড়ে তুলেছিল সভ্যতা ও সংস্কৃতি। ভারতীয় ঋষিরা জানতেন—'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্', অর্থাৎ—'বিশ্বজগতের যা কিছু সবই মহাপ্রাণ থেকে উদ্ভূত হ'য়ে প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে।' এই দেহ ভিন্ন সেই প্রাণের ঠাই নেই, এই দেহটা হচ্ছে প্রকৃতিগত। বিশ্ব-প্রকৃতিতে যত কিছু আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, যতকিছু রাসায়নিক ক্রিয়া, তার সবকিছু এই দেহের সঙ্গে আমাদের মনে মিলিয়ে আছে। এবং সেই মন অনুভূতিপ্রবণ হ'য়ে মননের সৃষ্টি করছে, এবং সেই সৃষ্টিকে নানা বর্ণে নানা রসে রসাশ্রিত ক'রে দেশ থেকে দেশে, মন থেকে মনে সঞ্চারিত ক'রছে এবং অপরের কাছ থেকে গ্রহণ ক'রে নিজে সম্পূর্ণ হচ্ছে। এই সম্পূর্ণতা যেখানে নেই, সেখানে সভ্যতা বা সংস্কৃতি দাড়াতে পারে না, তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আমাদের উপনিষদ তাই ব'লেছে—

'যস্তু সর্বাণী ভূতানি আত্মন্যেবানু পশ্যতি,
সর্বভূতেষু চ আত্মানং ন তত বিজুগুপ্সতে।'

অর্থাৎ—'যিনি সকলের মধ্যে এবং সকলকে নিজের মধ্যে মেলাতে পারেন, তার বিনাশ নেই।' Bible তাই বলে—Know thy neighbour, know thyself,' অর্থাৎ—'তোমার প্রতিবেশীকে চেন, নিজেকে চেন, উভয়কে এক ক'রে চেন।' এই জাতীয় পারস্পরিক মিলনের ভিত্তিতে যেখানে জীবনচর্চা ও জীবনচর্যা সার্থক হ'য়ে ওঠে, সেখানেই সংস্কৃতির জয়, সভ্যতার জয়।

আমাদের গোটা বৈদিক যুগ আর বৌদ্ধ যুগে এই চর্যা ভারতীয় দর্শনের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল। তারপর ক্রমে ইসলাম এসেছে, সুফী এসেছে, ক্রিশ্চানিটি এসেছে; ভারতীয় জীবনবোধের সঙ্গে তারা একত্রে মিলে গেছে। এই ভাবে আমরা একটা বৃহত্তর ও মহত্তর সংস্কৃতির অধিকারী হ'য়েছি।

কিন্তু ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মে সবকিছুরই যেমন উত্থান আছে, তেমনি ক্ষয়ও আছে। যে পূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে আমরা মন জুড়িয়েছি, সেই জ্যোৎস্নাময়ী চাঁদে বুঝি গ্রহণ লেগেছে। সেই গ্রহণের অবস্থাটাকেই মনীষীরা আখ্যা দিয়েছেন Decaying Culture ব'লে। কিন্তু তারও রূপান্তর আছে।

আমরা বিশ্বাস ক'রবো—এই রাহুগ্রাসের কাল উত্তীর্ণ হ'য়ে আবার একদিন পূর্ণচন্দ্রের উদয় হবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ হ'লেও আজকের কোনো কোনো জীবন-ও সংঘের চর্চ ও চর্যার মধ্য দিয়ে তাঃই পূর্বাভাস নবঅরুণোচ্ছটায় অ লোদীপ্ত হ'য়ে উঠছে।

॥ স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় জীবন ও জীবিকা সমস্যা ॥

প্রাক-স্বাধীনতা যুগে যখন মাত্র দু'পয়সায় দৈনিক ষোল পৃষ্ঠা এবং রবিবার বত্রিশ পৃষ্ঠার সংবাদপত্র হাতে পেতাম, তখন মনে করতাম, বৃটিশ আওতা থেকে বেরিয়ে দেশ স্বাধীন হ'লে সংবাদপত্রের হয় মূল্য হ্রাস অথবা একই মূল্যে দ্বিগুণ পৃষ্ঠার কাগজ পাঠ করবার আমরা সুযোগ পাবো। তখন মুদ্রামূল্য অত্যন্ত চড়া ছিল। সেই অবস্থায় মনে আছে—পূর্ববঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলে এক টাকায় (চৌষট্টি পয়সায়) ষোল জোড়া নারকেল পাওয়া যেতো, ভালো চাউলের মণ প্রতি দর ছিল দু'টাকা থেকে আড়াই টাকা, রসগোল্লার সের ছিল চৌদ্দ পয়সা কি চার আনা (ষোল পয়সা); দুধ, ছানা, চিনি প্রভৃতির দামও সেই আনুপাতিক ছিল। সূতিবস্ত্র প্রভৃতি মিহি ও মোটা মিলিয়ে জোড়া প্রতি ছিল দু'টাকা থেকে আড়াই টাকার মধ্যে। অত্যন্ত সামান্য আয়ের লোকের পক্ষেও স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহে বিশেষ একটা কৃচ্ছ্রতা ছিল না।

কিন্তু দেশ স্বাধীন হলো, আর পুরনো সেই দিনগুলির ইতিহাস রাতারাতি বাসি হয়ে গেল। সে সব দিনের কথা বললে আজকের যুগের ছেলে-মেয়ে-নাতি-নাতনীরা অবিশ্বাসের হাসি হাসবে। কিন্তু যাঁরা একদা নির্যাতিত জীবন যাপন ক'রে অশ্রু দিয়ে এ দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন, তাঁরা উত্তর-স্বাধীনতাকালে পারলেন না পণ্যদ্রব্যের মূল্যমানকে পূর্বের অবস্থায় ধ'রে রাখতে। এর পিছনে যে আন্তর্জাতিক কারণ দর্শিত হয়, দেশের মানুষের কাছে তার স্থান খুব তত বড় নয়—যত বড় হচ্ছে দেশ-নেতাদের চরম অযোগ্যতা। দিনে দিনে ধাপে ধাপে এই মূল্যমান বেড়েছে, আর তাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন গভর্ণমেণ্ট থেকে সুরু ক'রে ক্ষমতাপ্রিয় বিভিন্ন পার্টি সমূহ। এই ব'লে গুঞ্জন উঠেছে যে, উত্তর-স্বাধীনতা যুগে জাতীয় আয় ও দেশের জীবনযাত্রার মান যখন বেড়েছে, তখন স্বভাবতঃই বাজার-দরের বৃদ্ধি ঘটলেও লোকের তা ক্রয়ক্ষমতার বহির্ভূত নয়। কিন্তু এই ক্রয়ক্ষমতাসম্পন্ন লোকের সংখ্যা কত, সে হিসেব বোধ করি কেউ নিতে যান নি। এই ভাবের একটা ঔদাসীন্য ও অজ্ঞতার ফলস্বরূপ যা ঘটবার, গত বিশ বছরের স্বাধীন ভারতে তথা বাংলায় আজ তাই ঘটে গেল।

প্রাক-স্বাধীনতা যুগে কেবলমাত্র পূর্ববঙ্গে যে চাউল উৎপাদিত হ'তো, তাতেই প্রায় বাজার ভরে যেতো। ধান, পাট, তামাক ও আখের চাষের সেই উর্বর ভূমি পূর্ববঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের বহুলাংশ যখন পাকিস্তানের কুক্ষিগত হ'য়ে পড়লো, তখনই পশ্চিমবঙ্গকে সচেতন হওয়া উচিত ছিল—কি ভাবে তার কৃষি-ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত ও উর্বর ক'রে উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হ'য়ে ওঠা যায়। কিন্তু যেহেতু একটানা কংগ্রেসী শাসনে সারা ভারতরাষ্ট্রে দ্বিতীয় চিন্তার অবকাশ কম, সেই হেতু কেন্দ্রের অনিচ্ছাতেই হোক বা অব্যবস্থাতেই হোক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কৃষি-প্রাধান্যকে বড় ক'রে ভাবতে পারে নি। বরং কেন্দ্রের সঙ্গে সমতালে শিল্পসম্প্রসারণের পথে এগিয়েছে—যদিও সে ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ গত বিশ বছরে অবাঙালীর কাছে খুব বেশী এঁটে উঠতে পারে নি। কলকাতা শিল্প-নগরী, কলকাতার দিকে তাকিয়ে গোটা পশ্চিমবঙ্গকে উপলব্ধি করা যাবে না। দেশ-বিভাগের ফলে গোটা সমাজ-দেহে যে ভাঙন সুরু হয় এবং উদ্বাস্তুদের ক্রমিক চাপে খাদ্য-ভাণ্ডারের যে অনটন দেখা দেয়, তাকে আরও চতুর্গুণ বাড়িয়ে তোলে সর্বভারতীয় অবাঙালীরা এসে। ব্যবসার সূত্রে এবং চাকরীর সূত্রে তারা পর্যায়ক্রমে এখানে এসে তাদের স্ব স্ব প্রদেশগত আহারাভ্যাস পরিত্যাগ ক'রে বাঙালীর মতো দু'বেলা ভাত খেতে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠলো। কিন্তু এত অধিক পরিমাণ ভাতের জন্য চাউলের ব্যবস্থা কে করবে? কাগজে-পত্রে এবং উচ্চ-পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের কাছে তখন এই আবেদন তুলে ধরা হলো যে, যে সব অবাঙালী পূর্বে গমজাত দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্ত ছিল, এখানেও যদি তারা সেই অভ্যাস বজায় রাখে, তবে চাউলের ব্যাপারে কিছু সুরাহা হতে পারে। কিন্তু কে শোনে কার কথা? ফলে উদ্বৃত্ত প্রদেশগুলোর উপর চাপ পড়লো চাউল দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে সাহায্য করতে। কিন্তু সেই সাহায্যও বা কতদিন চলে! বিশেষতঃ কেন্দ্র থেকে সুরু ক'রে কোনো প্রদেশেরই অন্তরে বাংলার জন্য বিশেষ কিছু একটা স্নেহশীল আশ্রয় নেই; তাই সংস্কৃতিক্ষেত্রে শিক্ষাক্ষেত্রে, ভাষাক্ষেত্রে ও চাকরীক্ষেত্রে যেমন, খাদ্যের ক্ষেত্রেও তেমনি বাঙালী বিপদের মুখে পা দিতে বাধ্য হ'লে কেন্দ্র বা অন্যান্য প্রদেশের মনে বিশেষ আলোড়ন দেখা দেয় না; যেটুকু দেখা দেয়, সেটুকু প্রশাসনিক ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে নয়।

এই অবস্থাতেই পশ্চিমবঙ্গ ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত দুঃখের অশ্রুপথে এগিয়ে আসে। ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণের সময় থেকে পশ্চিমবঙ্গের

ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে যে দারুণ মন্দা দেখা দেয়, তারও উল্লেখ এখানে প্রয়োজনের সূত্রেই করা দরকার। চাউলের দারুণ সঙ্কট এইসময় থেকেই শুরু হয়। সেই সঙ্গে বাজার থেকে একে একে উধাও হয়ে যেতে লাগলো মাছ, সরষের তেল, কেরোসিন, বেবী ফুড ইত্যাদি। মুনাফাখোর চোরাকারবারীদের হাতের ম্যাজিকে এগুলো রাতারাতি অদৃশ্য হ'য়ে গেল এবং 'সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি'রা তখন গভর্ণমেন্টের সঙ্গে উচ্চমানে দর-বাধাবাধি নিয়ে উঠেপড়ে লাগলো। গভর্ণমেন্টও ক্রমেই দাম চড়িয়ে চড়িয়ে এই বীর চূড়ামণিদের সঙ্গে একটা আপোষে আসতে চাইলেন, কিন্তু সে আপোষ আজও হ'লো না। স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণের পর কলকাতায় বিধিবদ্ধ রেশন প্রবর্তিত হ'লো, গভর্ণমেন্ট থেকে দুধ কন্ট্রোল হ'য়ে বাজারে দুগ্ধজাত দ্রব্যের বিক্রয় বন্ধ হ'লো, তেম্‌নি উধাও হ'লো চিড়ামুড়ি প্রভৃতি—যা নিত্যদিনের গরিব ও সাধারণ গৃহস্থের খাদ্য।

পশ্চিমবঙ্গের এই যখন অবস্থা, কেরালায় তখন খাদ্য আন্দোলন নিয়ে আগুন জ্ব'লে উঠলো। কিন্তু তার বহু আগে থেকেই সারা ভারতে চাউলের অনটন প্রবলভাবে দেখা দেয়। দেশের কৃষিক্ষেত্রকে উন্নত করবার জন্যে পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী বললেন: আমাদের সীমান্ত রক্ষার জন্যে যেমন জোয়ানদের অতন্দ্র প্রহরা দরকার, তেম্‌নি কৃষিক্ষেত্রে অনলস কর্মপ্রয়াস দরকার কিষাণদের। তিনি চাইলেন খাদ্যশস্য উৎপাদন সম্পর্কে দেশকে স্বনির্ভর ক'রে তুলতে। কিন্তু এ সম্বন্ধে যে প্রয়াস দ্রুত দেখা দেবার সম্ভাবনা ছিল, ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানের আকস্মিক ভারত-আক্রমণে তা পিছিয়ে তো গেলই, বরং খাদ্যসঙ্কট আরও এত বেশী প্রবল হয়ে উঠলো—যার আশু সমাধান করা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সম্ভব হ'য়ে উঠলো না। একমাত্র আশা রইল বিদেশী সাহায্যের। এলোও সাহায্য, কিন্তু তা ভারতের নিত্যপ্রয়োজনের তুলনায় কতটুকু? বিদেশী মুদ্রার অপ্রতুলতার প্রশ্নটিও সেই সঙ্গে কম বড় হ'য়ে দেখা দিল না। গোটা ভারতবর্ষের চিত্র ক্রমে ভয়াবহ হ'য়ে উঠলো। তার মধ্যে সব চাইতে অধিক দুর্গতি ঘটলো কেরালা, উড়িষ্যা, বিহারের কিছু অংশ ও পশ্চিমবঙ্গের।

১৯৫৫ সালে জমিদারী প্রথার বিলুপ্তি ঘটলেও পশ্চিমবঙ্গে ভূমিহীন চাষী-মজুরের হাতে অদ্যাবধি জমির মালিকানা আসেনি। যে কৃষকের কৃষিকার্যই পেশা, কৃষির সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সম্ভাব্য সকল চেষ্টা সে-ই করবে, এইটেই

স্বাভাবিক। গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকেও ঘোষণা ক'রে আসা হয়েছে যে, জমির মালিকানা কৃষকদেরই হবে। লাঙল যার—জমি তার। কিন্তু আজও তারা সেই মালিকানা পায় নি। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করা হ'লেও মাথা পিছু জমির সিলিং ক'রে দেয়া হ'লো। সরকারী ব্যবস্থায় মাথা পিছু ৭৫ বিঘা জমি রাখা যাবে। অর্থাৎ একটি জোতদার পরিবার—যাদের লোকসংখ্যা পনেরো জন এবং জমির পরিমাণ ছিল দু'হাজার বিঘা, তারা অনায়াসে মাথা পিছু এক হাজার পঁচিশ বিঘা জমি তো রাখতে পারেই, উপরন্তু আত্মীয়-স্বজনের নাম দেখিয়ে আরও বেশী জমি নিজেদের অধিকারভুক্ত ক'রে নিতে পারে। এসব কথা গভর্ণমেণ্টের অজানা নয়, এবং এ কথাও অজানা নয় যে, অনেকে নিজেদের চাকরের কাছ থেকে হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিয়েও হাজার হাজার বিঘা জমি আত্মসাৎ ক'রে নিয়েছে। গভর্ণমেণ্টের আইনের ফাঁক গভর্ণমেণ্ট নিজেই ভরাট করতে পারেন নি। গভর্ণমেণ্ট যদি মাথা পিছু না ক'রে পরিবার পিছু সিলিংয়ের ব্যবস্থা করতেন, তবে বহু উদ্বৃত্ত জমি পেয়ে তা কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা যেতো। কিন্তু তা না ক'রে গভর্ণমেণ্ট ভূমিসমস্যা সমাধানের যে চেষ্টা করেন, তা মূলগত ত্রুটিপূর্ণ, তা সুবিবেচকের পরিচায়ক নয়। দ্বিতীয়তঃ, জমির সুষ্ঠু বটন ক'রে কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চাষপদ্ধতির ব্যবস্থা না ক'রে উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এক অচলাবস্থার সৃষ্টি ক'রে রাখা হয়েছে।

কিছুকাল হ'লো পরিকল্পনা কমিশন বলেছেন যে, উন্নত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জমিকর্ষণ, বীজ বপন, সেচ প্রভৃতি ব্যবহার অদ্যাবধি ভারতীয় কৃষকেরা রপ্ত ক'রে উঠতে পারে নি। কিন্তু তার জন্য দায়ী কি গভর্ণমেণ্টই ন'ন? প্রয়োজনের তাগিদে এ পর্যন্ত যত মেকানিক ও টেক্‌নিসিয়ান তৈরি করা হয়েছে, তার এক ভগ্নাংশও এক্সপার্ট চাষী তৈরি করা হয়নি। তার মূল কারণই হচ্ছে কৃষি সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের আগাগোড়া ঔদাসীন্য। এবং তারই ফলে উপযুক্ত ক্ষেত্র-প্রস্তুত এবং প্রথমশ্রেণীর বীজ সংগ্রহ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে ফাঁক থেকে গেছে। অথচ কৃষিপ্রধান ভারতভূমি। কৃষিকে কেন্দ্র ক'রেই একদা পল্লীসভ্যতা নগরকে আলো দেখিয়েছিল; সে আলো আজও নির্বাপিত হয়নি। কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতির মতো বড় বড় সহরগুলোর দিকে তাকালে আমরা স্পষ্টই উপলব্ধি করি—পল্লী থেকে ভূমিজাতদ্রব্য এসে না পৌছালে এসব সহরে কী

দারুণ হাহাকার পড়ে যায়। অথচ সেই পল্লী যখন খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়, তখন দেশের কি চিত্র হওয়া স্বাভাবিক, তার উজ্জ্বল প্রমাণ পাই '৬৫ '৬৬-'৬৭ সালের পশ্চিমবঙ্গে।

এই দারুণ সমস্যার প্রতিকারের পথে এখানকার কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট তাই চাইলেন কৃষিজাত খাদ্যশস্যের একটা মোট৷ অংশকে রাষ্ট্রায়ত্ত ক'রে নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসতে। তাঁরা সারা দেশে আঞ্চলিক কর্ডনিং ও জমির উৎপন্ন ধানজাতীয় শস্যের উপর লেভীপ্রথা আরোপ ক'রে গ্রামপঞ্চায়েৎ প্রভৃতির মাধ্যমে কাজ চালিয়ে মফঃস্বলের কোনো কোনো ক্ষেত্রে আংশিক র‍্যাশনিং প্রবর্তনের ব্যবস্থা করলেন। অথচ এই ব্যবস্থা জনগণের জীবনের উপযোগী হলো না। লেভী-ব্যবস্থায় দেখা গেল প্রধানতঃ কৃষকসমাজই উৎপীড়িত হ'তে লাগলো। হাহাকার উঠলো গ্রামে গ্রামে। লোক খেতে পায় না, লোকের ঘরে কেরোসিনের অভাবে আলো পর্যন্ত জ্বলে না। বিগত ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষেও দেশের এমন অবস্থা হয় নি। অথচ কংগ্রেস বা গভর্নমেণ্ট জনগণের এই অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে তার প্রতিকারের পথে অগ্রসর হ'তে পারলেন না। মূল অবস্থাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ও ভারতের চতুর্থ নির্বাচনের পর যুক্তফ্রণ্ট সরকারের কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ--যিনি একদা এদেশ থেকে ভেজাল ও দুর্নীতি উৎসাদিত করতে তাঁর সর্বশক্তি ব্যয় করেছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস তাঁকে অনুসরণ করলো না। কংগ্রেসের অবস্থা আজ বৃদ্ধ জটায়ুর মতো। রাবণের দুর্বিনীত গ্রাস থেকে অসহায় সীতাকে উদ্ধার করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ পার্টি রাখতে তাদের যে-কোনো পথ অবলম্বনে ত্রুটি নেই। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা পদচ্যুত কংগ্রেসসভাপতি ও ভারতের চতুর্থ নির্বাচনের পর যুক্তফ্রণ্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের ১৯৬৬ সালের ১১ই এপ্রিল বর্ধমান নাগরিক সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণে একথারই বাস্তব উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি বলেন—

—'আশি বছরের সুমহান ঐতিহ্যবাহী কংগ্রেসের উপরতলায় পদ ও ক্ষমতায় আসীন এবং অর্থলোভ ও ভোগবিলাসে মজ্জমান যে কয়জন একনায়কত্বের বজ্রমুষ্টিতে পাপচক্রের সৃষ্টি হয়েছে, তাঁদের দুর্নীতিমূলক কাজ সরকারকে দুর্নীতিগ্রস্ত ক'রে দেশকে সীমাহীন দুঃখসাগরে টেনে নামিয়েছে।...আজ কংগ্রেস

গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার বদলে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করেছে। ধনিকের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা নিয়ে আজ কংগ্রেস চলছে। ধনীরাও ঐ দানের বিনিময়ে জনগণকে শোষণ ক'রে আরও বেশী উপার্জনের এবং ধনতন্ত্রকে কায়েম করার সুব্যবস্থা ক'রে নিচ্ছেন।'

এর চাইতে স্পষ্ট চিত্র আর কি হতে পারে ? অথচ এই কংগ্রেসই এখানকার খাদ্য আন্দোলনকে বামপন্থী দলগুলি দ্বারা পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলন ব'লে অভিহিত ক'রে নিজেদের পার্টিগত মুখ রক্ষা করার প্রয়াস পায়। কিন্তু আজকের জনগণ সকলের সব রহস্যই বুঝতে পারে, পারে না কেবল ক্ষুধা জয় ক'রে অনশনে জীবন কাটাতে। এখানে খাদ্যের দাবী তাদেরই, যাদের খাদ্য নেই। ক্ষুধা নিশ্চয়ই সব রাজনীতির উর্ধ্বে। তাই ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ যখন গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন নিবেদন ক'রেও কোনো আশার সন্ধান পেলো না, তখন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে নানাজাতীয় নাশকতা-কার্যে তারা লিপ্ত হয়ে পড়লো। ক্ষুধা আনলো বুদ্ধিবিভ্রম এবং বুদ্ধিবিভ্রম জোগালো বিভিন্ন জাতীয় সম্পদের নানাবিধ ক্ষতিসাধন। দেখাদেখি গভর্ণমেণ্টও বাধ্য হ'য়ে বুলেটের দ্বারা এই আন্দোলনের মোকাবিলায় নির্মম হয়ে উঠলেন। কিন্তু জনগণের অপরাধ কি ? সব অপরাধ খাদ্যাভাবের এবং মানুষের ক্ষুধাই মূল অপরাধ। অথচ গোটা ভারতবর্ষই আজ এই অপরাধে অপরাধী এবং এই অপরাধ মোচনের ফলস্বরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কাছে খাদ্যশস্য দিয়ে সাহায্যের জন্য বার বার হাত পেতে চলতে হচ্ছে ভারতবর্ষকে। ভিখেরী ভারতবর্ষ, পরনির্ভরশীলতা সে তার বিশ বছরের স্বাধীন সত্ত্বেও কাটিয়ে উঠতে পারলো না। এর চাইতে দুঃখের এবং লজ্জার কথা আর কি হ'তে পারে ?

ঘটনা পারম্পর্যে অতঃপর দেখা গেল—পতিত জমিগুলির উদ্ধার সাধন ক'রে সেখানে উপযুক্ত কর্ষণ ও বীজ বপনের দ্বারা অধিকসংখ্যক খাদ্যশস্য উৎপাদনে কেন্দ্রীয় সরকারের মতো পশ্চিমবঙ্গ সরকারও কিছু তৎপর হ'য়ে উঠেছেন। বিগত বিশ বছর ধ'রে যদি এই তৎপরতা দেখা যেতো, তবে আজ আর এতবড় একটা নারকীয় কাণ্ড ঘটতো না বা এতগুলো প্রাণ বলি হতো না। এখনও অনুসন্ধান ক'রলে এমন লক্ষাধিক জমি উদ্ধার করা যায়—যেখানে দ্রুত খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সম্ভব। কৃষিপ্রধান দেশে কৃষির উপর প্রাধান্য না দিলে

শুধু শিল্পোন্নতির দ্বারা দেশ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না। কৃষিপ্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের হাতে কৃষিক্ষেত্রের মালিকানা ছেড়ে দিতে হবে এবং তাদের কাছ থেকে উপযুক্ত মূল্যে খাদ্যশস্য কিনে নিতে হবে। এর মধ্যে জোতদার বা এই জাতীয় অন্যান্য ব্যক্তিদের কোনো স্থান থাকবে না। এইভাবেই গভর্ণমেণ্টকে নতুন নীতি গ্রহণ ক'রতে হবে এবং সেই নীতিকে কাজে রূপায়িত ক'রে তুলতে হবে। বহু বাদানুবাদের পর এখানে যে সর্বদলীয় খাদ্য কমিটি গঠনের ব্যবস্থা হয়েছে, তাতেও গভর্ণমেণ্ট তথা কংগ্রেসেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকচে। এটা জনগণের নিশ্চিন্ততার দিক থেকে উপযুক্ত হয়েছে বলে মনে করি না। কোনো প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেবার ক্ষেত্রে এখানেও কংগ্রেসেরই জয় সুনিশ্চিত হবে। তাতে বামপন্থী দলগুলির নতুন ক'রে জেহাদ ঘোষণার সম্ভাবনা থাকবে। ফলে আবার নতুন বিপ্লব জন্ম নেবে। তার চাইতে খাদ্য কমিটি এমন সব নিরপেক্ষ অথচ চিন্তাশীল লোক নিয়ে সংগঠিত হওয়া উচিত ছিল—যাঁদের ঐক্যমতবিধায়ক প্রস্তাবসমূহ গভর্ণমেণ্ট নির্বিচারে মেনে নিয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, আন্তঃ জেলা কর্ডনিং ব্যবস্থা বাতিল ক'রে দিয়ে তার পরিবর্তে আন্তঃ প্রাদেশিক কর্ডনিং প্রথা চালু ক'রে বাংলার উৎপাদিত খাদ্যশস্য বাংলার বাইরে পাচার হবার পথকে বন্ধ করা পূর্বাহ্নেই উচিত ছিল। কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলগুলিকে বিধিবদ্ধ র‍্যাশনিংয়ের আওতায় রেখে গ্রাম-বাংলায় র‍্যাশন প্রথা প্রযোজনার পরিবর্তে সাধারণ খোলা বাজারে ন্যায্যমূল্যের দোকানের প্রবর্তন করা দরকার। এখানে-ওখানে মুষ্টিমেয় কয়েকটি ক্রেতা-সমবায় বিপণির প্রবর্তনই যথেষ্ট নয়। এই খোলা বাজার কিছুকাল আগেও কলকাতা ও শিল্পাঞ্চল সমূহে চালু ছিল। কিন্তু কালোবাজারী মুনাফাখোরদের জুলুমবাজীর ফলে গভর্ণমেণ্টকেই তা বন্ধ করে দিতে হয়। সেই খোলা বাজারে ন্যায্যমূল্যের দোকান অবিলম্বে সর্বত্রই চালু হওয়া দরকার। নইলে দিনের পর দিন ক্রমেই পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাবে, এ অবস্থাকে জনসাধারণ অধিক দিন স্বীকার ক'রে নিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, চাষীর কাছ থেকে যে ধান সুবিধে দরে কিনে গভর্ণমেণ্ট অগ্নিমূল্যে চাউল বিক্রী করেন, সেখানে চাষীকে উচ্চহারে ধানের দর দিয়ে উৎপাদনকারীর কাজ ও জীবনযাত্রার সাধারণ মানকে রক্ষা করা দরকার এবং ছোটখাটো জমির

উৎপাদিত শস্যের উপর থেকে লেভী-প্রথার পুরোপুরি বিলুপ্তি ঘটানো প্রয়োজন।

বিশেষতঃ গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টকে গণজীবনের মূলগত সমস্যা ও সংগ্রামকে প্রশমিত ক'রে গণজীবনের প্রত্যক্ষ অংশীদার হ'য়ে চলতে হবে। কারণ, এ গভর্ণমেণ্ট জনগণের গভর্ণমেণ্ট। জনগণকে ক্ষুধাক্লিষ্ট রেখে একদিনও এ গভর্ণমেণ্ট চলতে পারে না। যদি চলে, তবে বুঝতে হবে—গণতন্ত্র একটি ফাঁকা বুলি মাত্র, এই বুলির বিলিয়ার্ড-টেবলে জনসাধারণ নিতান্তই অপাংক্তেয়। সেখানে গভর্ণমেণ্ট বিদেশী সরকারের মতই একটি স্বতন্ত্র সত্তা, জনসাধারণ সেখানে শাসিত প্রজামাত্র।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থেকে যতদিন না দেশ মুক্ত ও স্বাধীন হ'তে পারছে, ততদিন রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার কানাকড়িও মূল্য নেই। ক্রমাগত বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের ফলে বিদেশসমূহে বুভুক্ষু ভারতের মর্যাদা এ পর্যন্ত এতটুকুও বাড়েনি, বরং অনেকাংশে কমেছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঘোলাজলে স্নান ক'রে ও বণিকপ্রধান বিদেশী শক্তির দাবার ঘুঁটি হ'য়ে যে আত্মঘাতে নিজেকে প্রায় নিঃস্ব ক'রে এনেছে ভারতবর্ষ, তা থেকে তাকে বাঁচতে হ'লে নিজের পথ নিজে রচনা ক'রে চলতে হবে। বৈদেশিক মুদ্রামূল্য হ্রাসের ব্যবস্থা যদি তার নতুন ক'রে বাঁচার প্রথম সোপান হয়ে থাকে, তবে সে কি ধরণের বাঁচা, বলা শক্ত। কিন্তু যতক্ষণ না এদেশের সাধারণ মানুষকে প্রাক-স্বাধীনতা যুগের সাধারণ বাজার-দরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারা যাচ্ছে, এবং যতক্ষণ না নৈতিক চরিত্রের মানোন্নয়নের মাধ্যমে এদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, আবাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে এদেশের মানুষকে সমান সুযোগ-সুবিধে প্রদান করা যাচ্ছে—ততক্ষণ শুধু বড় বড় পরিকল্পনার কথা শুনিয়ে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা ভারতবর্ষের পক্ষে সম্ভব হবে না। পুরনো খোল-নল্চে পাল্টে সবকিছুকে নতুন ক'রে ঢেলে সাজাতে হবে, নইলে পুরনো দূষিত রক্তে বাসি মদের যে নেশা ধ'রে আছে, তা বংশ বংশ ধ'রে আগামী যুগকে ক্ষয় ক'রে দেবে। তাতে নতুন কাটা মৌচাকের মধু বর্ষণ ক'রে দেশ ও জাতিকে মধুময় ক'রে তুলতে হবে। এদেশের নতুন রক্তে জন্ম নিক তার অফুরন্ত সম্ভাবনা ও অক্ষয় ক্ষমতা।

সুখের বিষয় যে, এই প্রবন্ধ সাময়িকপত্রে প্রকাশের অল্পকালের মধ্যেই

পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়ে এইসব জটিল সমস্যার সমাধানের একটা সক্রিয় চেষ্টা ইতিমধ্যেই প্রবল হয়ে উঠেছে। তবে এই সংযুক্ত বামশক্তিকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব বামাচার্যদের, সন্দেহ নেই। মূল কথা দেশের কল্যাণ, জাতির কল্যাণ, জনগণের কল্যাণ। রাষ্ট্রের কল্যানার্থে তাই যেকোনো কল্যাণকামী সরকারের স্থায়িত্ব সর্বক্ষেত্রে অবশ্যই কাম্য॥ (শ্রাবণ ১৩৭৩ - বৈশাখ ৩৭৪)।

॥ আজকের সাহিত্য-চিন্তা ॥

গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষ। আজ সমাজতন্ত্রের দিকে তার অভিযাত্রা। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যটি রাষ্ট্রনায়কদের চিন্তাসূত্র থেকে সংবাদপত্রের ব্যাখ্যাযুক্ত নানা তর্জমার মধ্য দিয়ে পঠনশীল পাঠকদের কাছে এসে উপস্থিত হ'য়েছে। কিন্তু পঠনশীল পাঠকদের সীমিত সংখ্যার একটি ভগ্নাংশ ব্যতীত এই বিশেষ তাৎপর্যটি জনসাধারণের আপামর-জীবনে আজও অনুভূতিময় রূপলাভ করেনি। কারণ গণতন্ত্র একটি ব্যাপক থিয়োরী এবং সমাজতন্ত্র—যা ক্রমে সাম্যবাদমুখি, তা আরও অধিক জটিল বিষয়। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র, এই উভয় শব্দ থেকে 'তন্ত্র' কথাটি আলাদা ক'রে নিলে অবশিষ্ট থাকে 'গণ' ও 'সমাজ'। একে যুক্ত করলে দাঁড়ায় গণ+সমাজ= গণসমাজ, অর্থাৎ জনসাধারণকে নিয়ে সমাজ বা জনগণের সমাজ। তার সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, উত্থান-পতন ও হিসেব-নিকেশের যে দর্শন, তাই হচ্ছে তন্ত্র বা ইতিহাস। কিন্তু জাগতিক ইতিহাসে এত সহজ বিষয়টা খুব সহজেই ব্যাখ্যালাভ ক'রে মিটে যাবার নয়। তার নানা পর্যায় আছে, নানা তত্ত্ব ও তর্ক আছে এবং সেই তর্কের পরে আছে সমাধানের ইঙ্গিত।

এইদিকে লক্ষ্য রেখে ইতিপূর্বে দু'একটি আলোচনাচক্রে এমনও অভিমত ব্যক্ত হয়েছে যে, বিষয়টির ব্যাপক অথচ সহজতম প্রচারের জন্য চাই লেখকদের সাহচর্য। যাঁরা সাহিত্যিক, তাঁরা যদি তাঁদের সাহিত্যের নানা বিভাগের মাধ্যমে একে সহজভাবে রূপায়িত ক'রে তোলেন, তবে বিষয়টি সহজ ও ললিত-বোধ্য হ'য়ে জনগণের চিত্তে সাড়া জাগাতে পারে। সেই সঙ্গে দেশের স্বার্থের দিক থেকে 'ন্যাশ্‌নাল ইন্টিগ্রেশন' বা 'জাতীয় সংহতি' বিষয়টিও সাহিত্যিকদের রচনার অন্যতম আধার হওয়া বাঞ্ছনীয় হবে।

এ কথার সপক্ষে আমরা অবশ্যই রায় দেবো, সন্দেহ নেই। কারণ জানি—কোনো বিষয়ের শিল্পসম্মত রূপদান একমাত্র বিদগ্ধ সাহিত্যিকদের দ্বারাই সম্ভব। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বলবো যে, সাহিত্যের সর্বস্তরের রসবস্তুতে সর্ববিষয়েরই রূপদান সম্ভব নয়। তবু এমন অনেক স্তর আছে—যার মাধ্যমে সামাজিক বা রাষ্ট্রিক বিষয়গুলিকে সুষ্ঠুভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। তার জন্য

সাহিত্যিককে বিশেষভাবে সচেতন হ'য়ে সেই সেই বিষয়গুলির অনুশীলনকর্মে আত্মনিয়োগ করতে হয়। অন্যথায় শিব গড়তে কিষ্কিন্ধ্যার জীব হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তখন যে কর্মের জন্য এই প্রয়াস, সেই কর্মটিই আসলে পণ্ড হয়। বিশেষতঃ সমসাময়িককালে যে সব বিষয় সংবাদপত্র এবং বেতারের মাধ্যমে অনবরতই প্রচার হচ্ছে, সেগুলো সম্পর্কে জনসাধারণ যেখানে প্রায়শঃই সমালোচকের ভূমিকা নিয়ে ব'সে আছে, সেখানে লেখকদের স্বভাবতঃই উচিত উক্ত বিষয়ে একটি সুষ্ঠু সমাধানের পথ আবিষ্কার ক'রে তাকে সর্বজনবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করা। কিন্তু কথা হচ্ছে—এই বিষয়গুলিকে আদৌ ভারতীয় লেখকবৃন্দ তাঁদের কোনো কোনো রচনার আধার হিসেবে গ্রহণ করছেন কিনা! বোধ হয় না। যদি বলা হয় যে, এগুলো আদৌ সাহিত্যের বিষয়বস্তু নয়, তা হলে প্রশ্ন জাগে—সাহিত্যের বিষয়বস্তুটা তবে কী? দেশের কোনো বিশেষ প্রশ্ন যখন জাতির জীবনে দেখা দেয়, তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকে নিছক কল্পনার আশ্রয় নিয়ে কিছু রচনা করাই কি সাহিত্য, না জাতীয় সমস্যা ও জীবন-জিজ্ঞাসাকে প্রস্ফুটিত ক'রে তোলাই সাহিত্যের মূলগত তাৎপর্য?

এই শেষোক্ত বিষয়টিকে যদি গ্রহণ করতে হয়, তবে মেনে না নিয়ে উপায় নেই যে, সাহিত্যিকদের এ সম্পর্কে সচেতন হবার দরকার, এবং শুধু গণতান্ত্রিক সমাজ-তন্ত্রের রূপায়ণ বা 'ন্যাশ্‌নাল ইন্টিগ্রেশনের' তাৎপর্য প্রকাশের মধ্যেই তাঁদের কার্যধারা সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, সমাজের বিভিন্ন অঙ্গে এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজ যে সমস্যাবলী প্রবল হ'য়ে উঠেছে, সেগুলোকে যতদূর সম্ভব শিল্পসম্মত রূপ দেওয়াই সাম্প্রতিক সাহিত্যের সব চাইতে বড় কাজ। পঞ্চবার্ষিক নিয়মে আজ কিভাবে দেশের অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে, কিভাবে আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রি ও এগ্রিকালচারের উত্থান-পতন ঘটছে, কিভাবে দেশের শিল্প ও আর্থিক বণ্টনের মাধ্যমে সামাজিক জীবন আবর্তিত হচ্ছে, কি পদ্ধতিতে শিক্ষাব্যবস্থার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব, এক লিপির মাধ্যমে কিভাবে সর্বভারতীয় ভাষা গ'ড়ে তোলা যায়, জাতীয় স্বাস্থ্য, খাদ্য ও বাসের উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুতির পথ কিভাবে সহজতর করা যায়, কিভাবে নিরক্ষরতা দূর ক'রে দেশকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে মহিয়ান ক'রে তোলা যায় এবং বাড়তি জনসংখ্যার প্রতিরোধে কি বৈজ্ঞানিক প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব,—এসব দিকে যেমন সাহিত্যিককে আজ গভীর মনোনিবেশ করতে হবে, তেমনি তাঁকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে—কিভাবে অসাধু ও

চোরাকারবারী ব্যবসায়ীদের মুনাফাবাজীর ফলে জাতি অধঃপতিত হচ্ছে, কিভাবে চরিত্রভ্রষ্ট কিছু সংখ্যক স্ত্রী-পুরুষের যথেচ্ছাচারে সমাজ কলুষিত হচ্ছে, আর কোন্ পথেই বা সমাজের নৈতিক মানকে উন্নত ক'রে জাতীয় চরিত্রকে সুমহান ক'রে তোলা যায়!

কিন্তু এক্ষেত্রেও অবশ্যই দেখতে হবে—সাহিত্য নিছক প্রচারধর্মী বা প্রপাগাণ্ডা হ'য়ে না দাঁড়ায়। ইদানীন্তনকালের কিছু সংখ্যক বিদেশী সাহিত্য পাঠ ক'রে এই প্রপাগাণ্ডার পরিচয় আমরা পেয়েছি। সেই প্রপাগাণ্ডা যাতে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের সর্বাংশ অধিকার ক'রে না দাঁড়ায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা অবশ্যই কর্তব্য হবে। তবে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, মহৎ শিল্প ও সাহিত্য মাত্রেই প্রপাগাণ্ডা, তা নীতি, মনুষ্যত্ব ও সুরুচির প্রচার ভিন্ন আর কিছুই নয়। ভারতবর্ষের মতো দেশে আজ নতুন ক'রে যেখানে জাতি সংগঠনের প্রশ্নটি বড, সেখানে এই প্রপাগাণ্ডার প্রয়োজন আছে। কিন্তু মহৎ স্রষ্টা তিনিই—যিনি সেই প্রপাগাণ্ডাকে নিছক শ্লোগানে পর্যবসিত না ক'রে শিল্পরসে রসায়িত ক'রে তুলতে পারেন। এরকম শিল্পীর লেখনীকে আমরা সর্বদাই অভিনন্দিত করবো। সাহিত্যের কোন্ কোন্ অঙ্গের মাধ্যমে দেশের এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলোকে সার্থক রূপ দেওয়া সম্ভব, সে বিষয়েও লেখককে ভেবে নিয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছাতে হবে।

হাল আমলে দু'একটি ক্ষেত্রে আমরা যে এরকম কোনো রূপায়ণের পরিচয় পাইনি, এমন নয়। কিছুকাল পূর্বে 'ক্ষুধা' নামে যে নাটকটি কলকাতার রঙ্গমঞ্চে বেশ কিছুকাল ধ'রে অভিনীত হয়ে গেল, তার মধ্যে সাম্প্রতিককালের জাতীয় সমস্যাবলীর সার্থক অভিব্যক্তি লক্ষ্য ক'রে আমরা খুসী হয়েছি। অথচ এই নাটকটি সমকালীন সমস্যাবলী সম্পৃক্ত হয়েও তথাকথিত প্রপাগাণ্ডায় খর্বিত না হয়ে জীবনধর্মে সার্থক হয়ে উঠেছে। এরকম আরও কিছু কিছু নাটক এই জাতীয় প্রয়োজনীয়তা মিটিয়েছে, সন্দেহ নেই। কেউ কেউ এবং অনেক ক্ষেত্রে আমি নিজেও বিশ্বাস করি যে, জনচিত্তে দ্রুত কোনো বিষয়ের সঞ্চালনে নাট্যক্রিয়া অনেক বেশী কার্যকরী। কিন্তু নাটকই যে এ ক্ষেত্রে সাহিত্যের একমাত্র উপাদান হবে, একথা যারা বলে, তারা সঙ্কীর্ণমনা বলতে হবে। 'ক্ষুধা' সমকালীন সমস্যাবাহী হয়েও কিছুটা ভিন্নধর্মী। জাতীয় সমস্যাগুলো—যা উপরে উল্লেখ করেছি—তার আবেদন 'ক্ষুধা'র ন্যায় ক্রিটিকাল নয়, বরং

এনালিটিকাল। তাই সরকারী তরফ থেকে যখনই এরকম কোনো বিষয় উদ্ভাবিত হয়, তখন তার সাধ্যায়ত সাহিত্যিক রূপায়ণের জন্য বেতারের মাধ্যমে ফিচার তৈরীর উদ্যোগ দেখা যায়। এই উদ্যোগে কিছু সংখ্যক সাহিত্যিকের আহ্বান আসে বেতার কেন্দ্রে। তাঁরা প্রয়োজনীয় বিষয়কে সুললিত ভাষায় ফিচার-ড্রামায় রূপদান করেন। কলকাতা বেতার কেন্দ্রে এরকম বহু ফিচার আমি নিজে তৈরী ক'রে দিয়েছি। একাজে অন্ততঃ একখাটা স্পষ্টতঃ বুঝেছি যে, প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুকে এ পদ্ধতিতে সাহিত্যিক রূপ দেওয়া যায়। এবং এ জাতীয় ফিচার যদি সাহিত্যপত্রগুলিতে প্রচলন করা যায়, তবে তা একাঙ্ক নাটক বা ছোটগল্পের মতই চিরজয়ী হয়, অথচ তা নিছক প্রপাগাণ্ডায় পর্যবসিত হয় না। কিন্তু এ বিষয়েও আমাদের সাহিত্যিক বা সাংবাদিকবৃন্দ এ পর্যন্ত কোনো সুপরিকল্পিত ভাবনায় এসেছেন ব'লে মনে হয় না। কারণ দৈনিক সংবাদপত্রে কিছু কিছু ফিচারমূলক ভাঙা-প্রবন্ধ প্রচলিত থাকলেও সাহিত্যপত্র মারফৎ এ জাতীয় কোনো সাহিত্যিক প্রকাশ এ পর্যন্ত খুব একটা বড় আকারে দেখা দেয়নি।

অথচ 'নীল বিদ্রোহ'কে দীনবন্ধু মিত্র যে কতখানি সার্থকভাবে রূপ দিয়েছিলেন, তা বিস্মৃত হবার কথা নয়। ইতিহাসের অত দূর অতীতে না গিয়েও বলতে পারি—বিগত বিয়াল্লিশের আন্দোলন, ভারত-ছাড়ো আন্দোলন, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ ও ছেচল্লিশের দাঙ্গা এবং সাতচল্লিশের দেশ-ভাগ নিয়েও এই বাংলায় কম গল্প, উপন্যাস, নাটক বা প্রবন্ধ গ'ড়ে ওঠেনি। কিন্তু উত্তর-স্বাধীনতাকালে বিগত বছরগুলির যদি ইতিহাস নেওয়া যায়, তবে দেখা যায় —সাহিত্যজগতে যেমন একশ্রেণীর যৌনধর্মী প্রণয়বিলাস এসে ভর করেছে, তেমনি বর্তমানের পরিবেশ থেকে পালিয়ে বহু-অতীতের রোমাঞ্চকর কাহিনী-প্রিয়তা অনেক সাহিত্যিককেই পেয়ে বসেছে। তাঁরা চপলমতি পাঠক-মনকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছেন যে, এর বাইরে সমস্যাবহুল বর্তমানের চিত্র পাঠকেরা গ্রহণ করতে চাচ্ছে না। ফলে যে-বইতে সমস্যা, সে বই প্রকাশকের ঘরে পড়ে থাকছে, আর বাঈজী, বেগম ও নানা কন্যার কাহিনীমূলক বই পুনর্মুদ্রণের সুযোগ পেয়ে প্রকাশক ও লেখককে পুরুষ্ট ও পুরস্কৃত হবার সুযোগ ক'রে দিচ্ছে।

তা দিক, তা নিয়ে আপত্তি ওঠার হেতু থাকে না—যদি জাতির প্রয়োজনীয় বৃহত্তর বিষয়গুলির যথাযথ রূপায়ণ ও প্রচার ঘটে।

যদি প্রশ্ন ওঠে যে, অন্যান্য বহুতর ব্যবসায়ীর মতো সাহিত্যিকেরাও এক-শ্রেণীর ব্যবসায়ী এবং অধিকাংশ সাহিত্যিকই দুঃস্থ হবার ফলে তাঁদের যদি নজর থাকে—সাহিত্যে কোন্ জাতীয় কাহিনী আমদানী করতে পারলে তাঁদের বইয়ের চাহিদা বাড়বে, তবে বলতে হবে—এঁদের প্রতি রাষ্ট্রের একটা বড় রকমের দায়িত্ব আছে। তা হচ্ছে—শক্তিমান সাহিত্যিকদের জন্য সরকার থেকে উপযুক্ত অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা; এবং সেই সঙ্গে সাহিত্যিকদের দ্বারা উক্ত বিষয়ক গ্রন্থগুলি রচনা করিয়ে সরকারী প্রকাশনা থেকে প্রকাশ করা। এই দ্বিমুখি কার্যবিধির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীক বিষয়সমূহকে সাহিত্যমুখি করা সহজ হতে পারে।

গভর্ণমেণ্টের অধীনে যে Social Education department রয়েছে, তার মাধ্যমে কোনো সাংগঠনিক কাজ হচ্ছে বলে মনে করি না। সমাজের নানা অঙ্গে এত সমস্যা জড়িয়ে আছে—যা এতকাল এই ডিপার্টমেণ্টের মাধ্যমে নানা সাহিত্যিক-রূপ লাভ ক'রে জনশিক্ষা ও গণপ্রস্তুতির সহায়ক হতে পারতো। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সেদিকে খুব বেশী লক্ষ্য আছে ব'লে মনে হয় না। এদিক থেকে যদি কোনো সাহিত্যে সরকারের সমালোচনা তীব্র হয়ে ওঠে, তবে সরকারী পক্ষ থেকে তাও সাগ্রহে মেনে নিয়ে নিজেদের আদর্শ ও প্রয়োগ শক্তিকে উন্নত করে তুলতে হবে। গত বিশ বছর ধ'রে দেখা গেল—এদেশে জাতীয়তা-বাদের যতখানি উচ্ছেদ হবার, হয়েছে। সেখানে আশ্রয় নিয়েছে ব্যক্তিস্বাচ্ছন্দ্য। ফলে চীন যখন বিগত '৬২ সালে ভারত আক্রমণ করলো, তখন সেই জাতীয়তাবাদ ও স্বজাতিবোধের অভাব অধিক মাত্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠলো এবং এরই ফলস্বরূপ ভারত সরকারকে ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশনের কথাটা বিশেষ ক'রে ভাবতে হলো। কিন্তু মানুষ যেখানে greedy (লোভি) এবং disintegrated (বিচ্ছিন্ন), সেখানে রাতারাতি ইন্টিগ্রেশন চাইলেই জাতি সংহত হ'য়ে দাঁড়ায় না। এর প্রমাণ পেতে আমাদের দেরী হয়নি। তার জন্যে তদুপযোগী যতখানি গদ্যসাহিত্য ও গীতিকাব্যের বহুল প্রচার প্রয়োজন—তার এক অংশও কার্যকরী হয়নি। ইমার্জেন্সীর জন্য যেটুকু বা রূপ পাবার পথে এসেছিল, আজ তাও চাপা প'ড়ে গেছে। নইলে নাটকে, কাব্যে, গানে, কথিকায়, প্রবন্ধে ও গল্পে জাতীয় চেতনা গড়ে তুলবার প্রয়াস একেবারে কম দেখা গিয়েছিল না; কিন্তু সাহিত্যের মাধ্যমে জাতি গঠনের দায়িত্ব যেমন এ যুগের সাহিত্যিকদের

মধ্যে একেবারেই বিরল, তেমনি সেই দায়িত্বকে দীর্ঘস্থায়ী ক'রে তুলবার জন্য সহকারী প্রয়াসও দেখা যায় না। দেশ শুধু সরকারী হুকুমে বা সরকারী ব্যবস্থাতেই বড হ'তে পারে না—যদি না সেই ব্যবস্থা শিল্পী-সাহিত্যিকেরা নিজেদের দায়িত্বে উদ্যোগী হ'য়ে করেন। উনবিংশ শতাব্দীর মনীষী সাহিত্যিকেরা সে দায়িত্ব অধিক মাত্রায় পালন করেছিলেন ব'লেই এখনও জাতীয় সত্তায় একেবারে ঘুণ ধরেনি। নইলে ইতিমধ্যে অধঃপাতের শেষ সিঁড়িটিও এদেশকে পেরিয়ে যেতে হতো।

আমাদের শিল্পী সমাজের কাছে এ উদাহরণ যে একেবারেই অজ্ঞাত, এ কথা ভাবা যায় না। কিন্তু তাঁদের চিন্তাক্ষেত্রে এ সব বিষয়ের বাইরে নিছক কল্পনা-বিলাসী কথা-কাহিনীর প্রাধান্যই অধিক। ফলে তাদের পাঠক জাতির মূল ভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'যে নিছক শৌখীন পাঠের আনন্দ নিয়ে জীবন কাটিয়ে তৃপ্তি পায়। তৃপ্তিবিধায়ক সাহিত্যের প্রসার বাড়ুক, তাতে যথেষ্ট খুসীর কারণ আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে দেশ ও জাতির প্রয়োজনীয় মূল বিষয়গুলিও সার্থক সাহিত্যরূপ পেয়ে জনচিত্তে চেতনার সঞ্চার করুক এটা অবশ্যই কাম্য।

গভর্ণমেণ্ট আজ সাহিত্যের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন এবং অনেকস্থলে দেশজ বিষয় সম্পর্কিত সাহিত্যের পুনঃপ্রকাশের জন্য ব্যক্তিগত আবেদনকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্যও ক'রে থাকেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রন্থ নির্বাচনে কিছু কিছু গল্‌তি আমরা অবশ্যই লক্ষ্য করেছি। সেই গল্‌তি কাটিয়ে ওঠা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কঠিন নয়। তেম্‌নি কঠিন নয়—দেশ থেকে অশ্লীল ও রুচিবিগর্হিত যে সব রচনা সাহিত্যের নাম নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে, সেগুলোকে অবিলম্বে বিলুপ্ত করা। কারণ, সাহিত্যের দুর্নীতি সমাজের সব দুর্নীতির ঊর্ধ্বে। তা মানুষের মনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে। তা থেকে সমাজ-জীবনকে মুক্ত না করলে জাতি মেরুদণ্ড খাঁড়া করে দাঁড়াবার শক্তি পাবে না। আর তা যদি না পায়, তবে তার কাছে গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের কোনো মূল্যই থাকবে না। মানুষের মনকে উন্নত রুচিশীল ক'রে তোলা যেমন সাহিত্যের কাজ, তেম্‌নি রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদেরও কাজ। সাহিত্যে স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ জীবনের মহান চিত্র তুলে ধরা হবে, আর রাষ্ট্রদেহের পচনশীলতা অব্যাহতই থেকে যাবে, তা কোনো সভ্যদেশের পক্ষে আদর্শ ব'লে গ্রহণীয় হতে পারে না। সাহিত্যের ভাব-দর্শন যখন রাষ্ট্রের কর্ম-

রূপায়ণ হ'য়ে দাঁড়ায় এবং রাষ্ট্রের অবশ্যম্ভাবী বিষয়গুলি যখন সাহিত্যের উন্নত চিত্রণে রূপ পায়, তখনই আসে রাষ্ট্র ও সাহিত্যে রেনেসাঁ। তখন ব্যক্তি জীবন উন্নত হয়, দেশ ও রাষ্ট্র উন্নত হয়, সাহিত্য উন্নত হয়। সেই সর্বোন্নত নব রেনেসাঁ প্রবর্তনের চিন্তাই আজকের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-চিন্তা হওয়া উচিত ॥

॥ বর্তমান বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য ॥

নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে প্রতিটি জনপদে আমাদের যে কত আত্মীয় ছড়িয়ে র'য়েছে, এক একটি নতুন ক্ষেত্রে নতুন পরিবেশে আমাদের পারস্পরিক মিলন-মুহূর্তেই তা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করা যায়। 'দেশে দেশে কলত্রানি দেশে দেশে চ বান্ধবঃ': ঋষির এ বাক্য মিথ্যে নয়। বিশ্বের মানব-সমাজ আমরা একই সূত্রে গ্রথিত। একই সূর্যালোকে সঞ্জীবিত, একই চন্দ্রালোকে আলোকিত, একই মাটি প্রাণ সঞ্চার ক'রছে আমাদের দেহে। আমরা এক এবং একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। এই সংযুক্তি থেকেই সাহিত্য।

জীবনের সঙ্গে এই যে জীবনের যোগ, সাহিত্যের কাজ হচ্ছে সেই সংযুক্তিকে নিজের ক'রে নিয়ে মানব-তীর্থের পথে পথে নতুন জীবন সঞ্চার করা। যেখানে এই সঞ্চারণশক্তির অভাব, শিল্পীর অপটুতার মাধ্য দিয়ে বুঝতে হবে—সাহিত্য জীবনকে দর্শন করেনি; জীবনের আসল দেখাটি আসল পাওয়াটি সেখানে নকল প্রকাশে ভ'রে উঠেছে। সে সাহিত্যিক-প্রকাশ যতখানি রূপসজ্জা নিয়েই গ'ড়ে উঠুক না কেন, শিল্প-নিদর্শনের চরম শীর্ষে আরোহণ ক'রতে পারেনি। আপনার আমার সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, অনুভূতি, প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্তের সর্বাঙ্গীন চিন্তাধারা ও চিত্তের বোধশক্তি যে-সাহিত্যের অঙ্গ-সম্বন্ধ হ'য়ে দাঁড়াবার সুযোগ পেলো না,—তাকে এক শ্রেণীর সমালোচক রোমান্টিক ভাবালুতা ব'লে আখ্যায়িত ক'রে থাকেন। যুগের ক্রম-ধারায় এ মতবাদের উপর হয়তো তর্ক জ'মে ওঠা অসম্ভব কিছু নয় কিন্তু সে তর্কে যোগ দেওয়া বালক-সুলভতারই লক্ষণ মাত্র। সাহিত্য হবে দেশ ও সমাজের স্বচ্ছ দর্পণ-স্বরূপ। দেশ ও সমাজের সর্বাঙ্গণ সার্থক প্রতিফলন যদি তাতে না ঘটলো, তবে তা শিল্পীর মোহান্বিত বিলাসময় অভিব্যক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়। 'Face is the index of mind': মুখাবয়বের মধ্যে যেমন মানুষের মন মূর্তি নিয়ে জেগে ওঠে, সেই মুখ তেমনি নিজেকে খুঁজে পায় আত্মদর্শনের মধ্য দিয়ে দর্পণে। সাহিত্য হবে তেমনি। সমগ্র দেশ, দেশের তরুলতা, ধূলিমাটি, জীব-জীবন পূর্ণ সাকারময় হ'য়ে উঠবে সাহিত্যে। এই কথাটিকেই

মনের মধ্যে গেঁথে নিয়ে নতুন শিল্পী সাহিত্যিকদের কাজ হবে শিল্পাঙ্কন সাধনায় ব্রতী হওয়া।

আজ আমাদের জাতীয় জীবনের দায়িত্ব বেড়েছে বহু। আমাদের সামাজিক কাঠামো আজ যেমন একদিকে ভেঙে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছে, তেমনি অন্যদিকে স্বাধীনতার অমিয় স্পর্শে ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠছে। এ দু'য়ের মাঝখানে কিন্তু ব্যবধান অনেকখানি। এতদিন আমাদের বহুব্যাপ্ত নির্ভীক সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব হয় নি। পদে পদে সংশয়, পদে পদে ই'রেজের রক্তচক্ষুর ভয় আমাদের সমগ্র জাতীয় প্রয়াসকে প্রতিহত ক'রেছে, বিপর্যয় এনে দিয়েছে আমাদের শিল্পে, বিজ্ঞানে, শিক্ষায়, ধর্মে। এদেশে সর্বপ্রথম ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন হ'য়েছিল ইংরেজেরই সরকারী দপ্তরে কাজের সুবিধের প্রয়োজনে। সে শিক্ষার মোহে প'ড়ে তৎকালীন বঙ্গসমাজে এক শ্রেণীর বাবু গ'ড়ে উঠেছিলেন—যাঁদের অধস্তন পুরুষেরা আজও নেকটাই প'রে পাইপে তামাক টেনে সভ্যতার ধারকরূপে বিরাজ ক'রছেন। ইংরেজ আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের যথেষ্টতর ব্যাপকতার প্রবর্তন ক'রেও তার ভাষা ও সংস্কৃতির যে দীপাধারটি এনে এদেশের মাটিতে বসালো, তা ক্রমে বঙ্গসমাজকে আলোক দান না ক'রে বরং মরীচিকার জালে চোখ ঝল্‌সে দিল। মোহমুদ্গরের মতো একশ্রেণীর মানুষ আইনের শাসনে, খেতাবের লিপ্সায় ও ব্যক্তিগত পদাধিকারের লোভে রীতিমত আধা ইংরেজ হ'য়ে উঠলো—যার ট্রাডিশন আজও চ'লেছে। দু'শো বছর ধ'রে আমাদের সমস্ত ঐতিহ্য আচ্ছন্ন হ'য়ে ছিল ইংরেজি আচার-পদ্ধতিতে। আমাদের যে শক্তি আছে, আমাদের যে সাহস আছে, একথা বিস্মৃত হ'য়েছিলাম আমরা; একটা সামগ্রিক সন্ত্রাস এসে বাসা বেঁধেছিল আমাদের হৃদয়-রাজ্যে। হৃদয়কে তাই কোথাও খুলে দেখাতে পারিনি, সত্যকে চেপে যেতে হ'য়েছে সর্বত্র।

আজ দেশ আত্মশাসনাধীন। আজ বিশ বছর হ'লো ইংরেজ অপসারিত হ'য়েছে এদেশ থেকে। আজকের সাহিত্য নির্ভয়ের সাহিত্য, সত্যকে সত্য ব'লে প্রকাশ ক'রবার সাহিত্য। আমাদের বাঙালীজীবনের অভিজ্ঞতা-প্রসূত জ্ঞান যদিও সীমাবদ্ধ, তবু তার মধ্যেই আশার কথা এই যে, সাহিত্যধর্মের সর্বাঙ্গীনতা আজ ধীরে ধীরে রূপ নিয়ে দাঁড়াচ্ছে। এখনও যে সন্ত্রাস একেবারে অপসারিত হ'য়েছে, এমন নয়। সব দিক থেকে আজ একটা

বিপুলতর ভাঙন ও পরিবর্তনের যুগ চ'লেছে পৃথিবীতে। আমাদের দেশের সমস্যাও সেখানে একেবারে কম কি! এই পরিবর্তন ও ভাঙনের মধ্যে দাঁড়িয়েও বাঙালী শিল্পীরা একদিকে স্বাধীনতা ব্রতকে গ্রহণ করেছিলেন উপজীব্য হিসেবে, যদিও আমাদের কাম্য স্বাধীনতা আমাদের সমষ্টিগত জাতির জীবনে অদ্যাবধি দেখা দেয়নি, তবু শাসনক্ষমতা আজ দেশনায়কদের হাতে এসেছে; অন্যদিকে তেমনি জাতীয় শিক্ষা ও আনন্দের বাণী বহন ক'রে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন শিল্পী সাহিত্যিকেরা। সমস্ত কিছু দুঃখ, বিপদ, ঝঞ্চা ও দুর্দিনের মধ্যেও তাঁরা সত্যের মশাল হাতে অগ্রণী হ'য়েছেন দেশের পুরোভাগে। জাতির ভাগ্যে একান্ত শান্তি ও সান্ত্বনার স্বাক্ষর হচ্ছে উনিশশো সাতচল্লিশের পনেরই আগষ্টের পুণ্য দিনটি—যেদিন থেকে ইংরেজ শুধু এদেশের মর্ম ফলকে স্মৃতি হ'য়েই জড়িয়ে রইল, বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হ'য়ে আর এখানকার আকাশকে প্রকম্পিত ক'রবার অধিকার পেলো না। স্বাধীনতার বিজয়শঙ্খ বাজলো ভারতবর্ষের মাটিতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, এ স্বাধীনতা এলো মাটিকে খণ্ড ছিন্ন ক'রে, দেশকে বলি করে। বাংলা ভাগ হ'য়ে গেল পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গে। মানুষের বাস্তুভিটের ঠিক রইল না, খাদ্যসংস্থানের ব্যবস্থা রইল না। পূর্ব-বাংলার ছিন্নমূল হিন্দুসমাজ বিতাড়িত পশুর মতো ছুটলো এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে। চারদিকে দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারি। এই বিশ বছর ধ'রে জাতির জীবনে এ দুর্যোগ অব্যাহতভাবে চ'লেছে। এখানে সত্যিকারের সাহিত্যের বেঁচে থাকা কঠিন। আসলে জীবনের শিল্পবুদ্ধি ও তন্ময়তার মধ্যেই তো সাহিত্যের জন্ম। সে জীবন আজ বিক্ষিপ্ত, প্রক্ষিপ্ত, পর্যুদস্ত। জীবনের বীণা যেখানে সুরে বাজেনা, সেখানে সার্থকতায় জয়যুক্ত হবে কেমন ক'রে সাহিত্য?

এতকিছু ঝঞ্চাক্ষুব্ধ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেও আমাদের আনন্দের কথা এই যে, বাংলাসাহিত্য এখনও নব নব শাখায় পল্লবিত হ'য়ে উঠচে। সমালোচকদের দৃষ্টিতে সে সাহিত্য জীবনের সর্বাঙ্গীনতা প্রকাশে অপটু হ'লেও সমাজের সর্বস্তরে গিয়ে নাড়া দিয়েছে। এই সন্ত্রাসময় দুর্ভিক্ষসঙ্কুল পরিবর্তনশীল যুগে আমাদের মাতৃভাষাকে, আমাদের জাতীয় সাহিত্যকে তার স্বকীয় ঐতিহ্য ও গৌরবে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব দেশের শ্রেণীহীন গণ-জীবনের উপর ন্যস্ত। শিল্পীদের নির্ভরযোগ্য অনুকূল জীবনযাত্রার মধ্যে যাতে সৎসাহিত্যের সৃষ্টি

হ'তে পারে, তার দিকে জনসাধারণের একান্তভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কারণ জনসাধারণই সাহিত্যের মূলাধার ও মূল কেন্দ্রস্থল। জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি সব কিছু নির্ভর করে সুষ্ঠু জীবনযাত্রার উপর ঃ কি শিল্পী-জীবন, কি আপামর সর্বাঙ্গীণ সমাজ জীবন। কোনো একটিতে ভাঙন ধরলেই শিল্পের মৃত্যু, সংস্কৃতির মৃত্যু।

আজ দ্বিখণ্ডিত বাংলায় বাংলা ভাষার স্থান অনেকটাই সীমাবদ্ধ হ'য়ে প'ড়েচে। বাংলা আজ দশ-আনি ছ-আনিতে বিভক্ত। তবু স্বস্তির কথা এই যে, দশআনি প্রধান পূর্ব-পাকিস্তান সরকার সেখানকার শুভবুদ্ধিপ্রবণ জনসাধারণের বলিষ্ঠ দাবীতে বাংলাকেই শিক্ষার মাধ্যমরূপে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। এতে বাংলাভাষার প্রযোজকদেরই বিশেষ গৌরবের কথা। কিন্তু ছ'আনিপ্রধান পশ্চিম বঙ্গের সমস্যা আজ জটিল হ'তে জটিলতর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে একমাত্র তার সীমানা-সংস্থাকে কেন্দ্র ক'রেই। সর্বদিক থেকে বাংলা ও বাংলাভাষার উপর আজ একটা বড়রকমের চাপ এসে প'ড়েছে। রাষ্ট্রক্ষেত্রে আজ যেমন তার উপযুক্ত নায়কের অভাব, সংস্কৃতিক্ষেত্রেও তাই। ভারতের রাষ্ট্রভাষা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে কিছুকাল সগৌরবে বাংলা ভাষাকে দাঁড় করানো হ'য়েছিল; আজ সে হুজুগ অনেকটাই কেটে এসেছে। বলিষ্ঠ মতবাদের ক্ষেত্রে কেউ চেয়েছেন সংস্কৃতকে, কেউ চেয়েছেন বিশুদ্ধ হিন্দীকে, আবার কেউ চেয়েছেন গান্ধীয়ানী উর্দু-হিন্দী মিশ্রিত হিন্দুস্থানী ভাষার রাষ্ট্রীয় প্রবর্তন। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলার শক্তি কতটুকু? অথচ একথা ধ্রুব যে, সর্বভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানে বাংলাই একমাত্র সমৃদ্ধ ভাষা—যাকে সঙ্গীতে, সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, অর্থনীতিতে, সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রাণময় রূপ দিয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মনীষীরা। সেই বাংলা আজ রিক্ত, অসহায় ও বিপর্যস্ত। তাকে বাঁচাবার একমাত্র দায়িত্ব আজ জনসাধারণেরই হাতে। যতবড় সংঘাতই আজ মাথার উপরে সমুদ্যত হ'য়ে থাকনা কেন, তার মধ্যেই সত্যকে ধ্রুবতারা ক'রে নির্ভয়ে মাথা উঁচু ক'রে বাঙালীকে আজ সার্থক কর্মসংগ্রামে অবতীর্ণ হ'তে হবে।

বাংলার জনসাধারণ অর্থে আজ শুধু বাঙালীকেই বুঝায় না, কোনোদিন হয়তো বুঝাতো। আজ পশ্চিমবঙ্গের মাটি 'open Land' হ'য়ে দাঁড়িয়েছে অ-বাঙালীদের কাছে। আজ তাদেরই প্রভুত্বের পসরা সাজানো চারপাশে।

সেই অগণিত গণ-গণেশকে প্রণাম ক'রেই তবে বাঙালীর প্রাত্যহিক জীবনের কর্মারম্ভ বহুতর ক্ষেত্রে। রুমালে চোখ ঢেকে তাই তাকে সুদূর আরাবল্লীর প্রান্ত থেকেও শুনতে হ'য়েছে: 'বাঙালী ভীরু, বাঙালী শুধু কাঁদতে জানে।' পর্বত-প্রকম্পিত সেই বাণীকে কি সত্যিই আমরা ব্যর্থ ক'রতে পেরেছি? এই সূত্রে মাত্র কয়েক বছর আগে বাবুরাও প্যাটেলের বোম্বাই-ভাষণটিও বিশেষভাবে স্মর্তব্য। তিনি দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন: 'The Bengalees are a race of lazy and unenterprising thinkers, they eat too much, sleep too long, take too much and work to little.' —বাংলার শত শত শহীদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, শত শত মনীষীর নিঃস্বার্থ দান, সে কি আজ সত্যিই তবে এই উদ্ধত মন্তব্যের কাছে কিছু নয়? একদিন মহামান্য গোখেল কম্বুকণ্ঠে উচ্চারণ ক'রেছিলেন. 'What Bengal thinks to-day, India thinks to-morrow'. সেদিন বঙ্গদেশ কর্মনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি আর সাহিত্য-দর্শন ও বিজ্ঞান-প্রসূত আলো দেখাতো সমগ্র ভারতকে। সে আজ বেশীদিনের কথা নয়। আজই কি সেই আলোকবর্তিকা নির্বাপিত হ'য়েছে বাঙালীর হাতে? হয়নি। বাঙালীর শৌর্য, বীর্য ও কীর্তির যশ পলাশী থেকে কোহিমা, কোহিমা থেকে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিঘোষিত ও বিনিন্দিত। কিন্তু ইতিহাসের পটক্ষেপে আজ সুরের তারতম্য ঘটেছে। আজ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত বুঝি একমাত্র টিকতে ব'সেছে 'বন্দেমাতরম' আর 'জন-গণ মনের' সংকীর্ণতম কাঠামোটুকু মাত্র। তারও হিন্দী সংস্করণের ত্রুটি নেই। সংস্কৃতিময়ী বাংলার মূর্তিমতী প্রাণলক্ষ্মীর পরম পরিতৃপ্তি ভিন্ন কি।

এমনই এক একটা যুগ আসে দেশ ও জাতির জীবনে। জীবনসমুদ্রের সোয়ারীরা তখন ডাক ছেড়ে বলে: সামাল সামাল ডুবলো তরী। কিন্তু কে সামলায় সেই তরী? আজ সেই তরী সাম্‌লাবার ভার একমাত্র জনসাধারণেরই উপর ন্যস্ত। বহুতর সমস্যার ভারে পীড়িত হ'য়ে, বহুতর কণ্টকে কণ্টকিত হ'য়ে আজ যদি বাঙালী সত্যকারের নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের দ্বারা বাংলার শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে রক্ষা ক'রতে না পারে, তবে বাংলার শতাব্দী-সঞ্চিত ঐতিহ্যময় প্রাণপুরুষের পূর্ণ সমাধির দিনটিও বড় বেশী দূরে নয়। কোনো কোনো সমালোচক হয়তো এই উক্তিকে ঘোরতর প্রাদেশিকতার অপরাধে অভিযুক্ত ক'রে নতুন কোনো Criminal Code-এর পাতা খুলে

ব'লবেন, কিন্তু সবার আগে নিজের ঘর সামলবার প্রশ্ন, নিজের মাকে রক্ষা করার প্রশ্ন, সেখানে সত্যকে চেপে যাওয়া আরও বেশী Criminal.

বিশ্বসাহিত্যের দরবারে বাংলা সাহিত্য তার ন্যায্য আসন পেয়েছে, এই নিয়েই আজ তৃপ্ত বা পুলকিত হবার কারণ নেই। যাতে সেই আসন, সেই ঐতিহ্যের গরিমা প্রোজ্জ্বল হ'য়ে আরও দীপ্ততর ভাস্বর রশ্মিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে বিরাজ করে, তারই জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আজ একান্ত প্রয়োজন। পূর্বেই বলেছি—কি শিল্পীজীবন, কি আপামর সর্বাঙ্গীণ সমাজ জীবন, কোনো একটিতে ভাঙন ধ'রলেই শিল্পের মৃত্যু, সংস্কৃতির মৃত্যু। এই সমস্ত কিছুরই মূলাধার একমাত্র জনসাধারণ। জনসাধারণের মধ্যেই যেমন শিল্পী রয়েছেন, শিল্পীর মধ্যেও তেমনি জীবনধর্মে উজ্জীবিত হচ্ছে জনসাধারণ। শিল্পপ্রয়াস বা শিল্পীর সাধনা যেখানে ব্যাহত হ'চ্ছে, তাকে রক্ষা করবার একমাত্র হাতিয়ার সেখানে জনসাধারণেরই হাতে। এক একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিভার মধ্যে নতুন ক'রে জন্ম নিচ্ছে সমাজ। এমন প্রতিভার আবির্ভাব তো যুগে যুগে কতবারই লক্ষ্য করেছি। তাঁরা যে সমাজকে রেখে গেলেন, যে সুন্দর পরিকল্পিত দেশকে গেঁথে রেখে গেলেন তাদের কর্মে ও চিন্তায়, সেই সমাজ ও দেশের মানুষদের মধ্যেই র'য়েছে তাঁদের অধীত অসম্পূর্ণ কার্য-সম্পাদনার সুচারুপ্রস্তুত। আজ সে কাজকে নানাভাবে নানাক্ষেত্রে রূপ দিতে হবে। ঝড়, ঝঞ্ঝা, হলাহলের মধ্যে দাঁড়িয়ে বন্দনা ক'রতে হবে প্রত্যাসন্ন প্রশান্ত উষার। যখন চারদিক থেকে বিপর্যয় ঘনীভূত, তখনই যে সত্যিকারের সার্থক কাজের মুহূর্ত। ভাবী বংশধরদের জন্য সঞ্চয় রেখে যাবার এই তো প্রশস্ত সময়। এ সময়কে এড়িয়ে যাওয়া মানেই হ'লো আত্মনিমজ্জন, আত্মঘাত। বাংলার শিল্প-সাহিত্য, দর্শন ও বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যই যদি না বাঁচলো, তবে বাঁচবে কি নিয়ে বাঙালী? আজ কেবল 'কালচার'-এর জিগীর তুললেই কাজ মিটে যাবে না, সেই কালচারকে একদিকে ধারণ করতে হবে নিজেদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারতা বৃদ্ধি ও প্রত্যেকটি নাগরিককে সংস্কৃতিবান ক'রে গ'ড়ে তোলার দ্বারা, তেমনি অপরদিকে তাকে বহন ক'রে নিতে হবে ভৌগোলিক সীমাব্যাপ্তির বৃহত্তর সম্ভাবনার মধ্যে। এর গুরুদায়িত্ব নির্ভর করছে শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে সঙ্গে একমাত্র জন-সাধারণেরই উপরে। সামাজিক জীব হিসেবে কেউ কাউকে ছেড়ে থাকবার নয়। পূর্বেই বলেছি, প্রত্যেকের সঙ্গেই আমাদের প্রত্যেকের অজাজী সম্বন্ধ। সেই

সম্বন্ধ ঘনীভূত হয় সম্প্রীতির দ্বারা, সারল্য ও সহজতার দ্বারা। সাহিত্য হচ্ছে এই সম্প্রীতি সাধনার মূল প্রাণবস্তু। এই প্রাণকে জাগাতে হবে, বাঁচাতে হবে, তবেই চিরন্তন বিশ্ব-চেতনার মধ্যে বাংলার, বাঙালীর, বাংলা ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্থিতি ও জীবন-সমৃদ্ধি ॥*

* সুন্দরবন সাহিত্য-সম্মেলনে প্রদত্ত অভিভাষণ।

॥ সাহিত্য, সমাজ ও মানুষ ॥

সাম্প্রতিক কালের বাংলা কথা-সাহিত্যে যত বেশী মনস্তাত্ত্বিক বিষয় এসে আশ্রয় করেছে, সমাজ বিষয়ক সমস্যা তত বেশী এসে আশ্রয় করছে না। ইদানীন্তন কালের প্রশ্নই উঠেছে মন নিয়ে। সমাজতাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে তত বেশী নয়। অথচ লক্ষ্য করবার বিষয়, সামাজিক সমস্যাকে সাহিত্যে তুলে ধ'রে ঐ সমস্যাগুলি সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন ক'রে তুলতেই এককালে সাহিত্যিকরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। সমাজ তো সামান্য একটা বিষয় মাত্র নয়, সমুদ্রের মতো তা ব্যাপক। সেই ব্যাপক সমাজজীবনের সমস্যাগুলিও বহু-বিস্তৃত। তার সঙ্গে মানুষের যোগ না থেকে উপায় নেই। মানুষ মাত্রেই Rational Being; মানুষের জন্যেই সমাজ, এবং সমাজের জন্যেও মানুষ বটে। যেখানে এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, সেখানে একের সমস্যা উভয়ের সমস্যা। যা জীবনে ঘটছে, তা সমাজকে আশ্রয় করেই ঘটছে। সেখানে শুধু ব্যক্তির একক জীবন নয়, একক জীবন নিয়ে কখনও সমাজসৃষ্টি হয় না; সেখানে একাধিক ব্যক্তির প্রশ্ন। সুতরাং এককে অতিক্রম ক'রে যেখানে একাধিক জীবন কোনো সমস্যায় জর্জরিত হয়ে ওঠে, সেখানে একাধিকের মধ্যে এককও আছে, অতএব যা কিছু সমস্যা, তা সকলের সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত বহন ক'রে এতকাল শিল্পী-সাহিত্যিকরা তাঁদের স্ব স্ব শিল্পকর্মকে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। যদিও তাঁরা সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করেননি, তবু একথা নিশ্চিত যে, তাঁদের স্ব স্ব সাহিত্যিক ভূমিকায় তাঁরা সমাজ-সমস্যার যে-চিত্র তুলে ধরেছেন, সেই চিত্রের পথ ধ'রে কর্মী এগিয়ে এসেছেন তাকে বাস্তবে রূপায়িত ক'রে তুলতে। রূপ পেয়েছেও। এমনি করেই প্রত্যক্ষ-ভাবে না হলেও পরোক্ষে সমাজ-উন্নয়নমূলক কাজ ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের বাংলা কথা-সাহিত্যে সে-কাজের রেওয়াজ খুব বেশী পরিমাণে চলেছে ব'লে চোখে পড়ে না। এখন মনই প্রধান, সমাজ তার পর। অথবা মনই প্রধান, সেই মনের মধ্যে সমাজ আবর্তিত হচ্ছে। মনই যে একটা বিরাট সমুদ্র; সেই সমুদ্রে মুক্তা খুঁজে বার করা কঠিন। এই কঠিন পথের ব্রত হচ্ছে মনোবিশ্লেষণ বা Psycho-analysis-এর ব্রত।

সমাজবিষয়ক সাহিত্যেও যে এ ব্রত অনুপস্থিত ছিল, তা নয়। ক্রমে যুগ-পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে এই দিকটিই আজ বড় হয়ে উঠেছে। তার পিছনে প্রধান যুক্তি হচ্ছে এই যে, মনই সর্ব বিষয়ের একমাত্র কারক। মন থেকে যা উদ্ভাবিত হচ্ছে, তারই রূপের প্রকাশ ঘটছে ব্যবহারিক জগতে। অতএব মনের ক্ষেত্র আগে, পরে আর সব। কিন্তু অগ্রাধিকারসূত্রে মনোবিশ্লেষণের বিষয় নিয়ে আজকের সাহিত্যের অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা ঘটছে, তা আর যাই হোক, সমাজ-কল্যাণের খুব বেশী অনুগামী নয়। মনোবিশ্লেষণের উপর জোর দিতে গিয়ে অধিকক্ষেত্রেই লেখক ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরিবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েন; ফলে সাহিত্যের যে ব্যাপক ক্ষেত্রটি—তা সঙ্কুচিত হয়ে পড়তে বাধ্য হয়। মনোবিশ্লেষণের দিক থেকে তাতে বৃহত্তম ক্ষতি না ঘটলেও সমাজকর্মের দিক থেকে তাতে কম ব্যত্যয় ঘটে না।

আসলে শিল্প-সাহিত্যের একটা বড় কাজই হচ্ছে মানুষ ও সমাজের মানকে উন্নত ক'রে তোলা; এবং সেই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও উন্নতি। একটা জাতির পরিচয় থাকে তার শিল্প-সাহিত্য ইতিহাসে। জাতির অংশ-বাহিনী যে সাহিত্যে বড় হয়ে দাঁড়াল না, সে সাহিত্য শিল্পের দিক থেকে যতই মহৎ হোক, দেশের দিক থেকে তার আবেদন খুব বেশী হৃদয়গ্রাহ্য নয়। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ছেড়ে এখানে সমষ্টিবাদের প্রশ্নটাই বড়। সমষ্টিবাদ অর্থে দেশ, দেশীয় সমাজ। সাহিত্যে তাই সমাজকর্মের একটি বড় দিক আছে। সেই দিকটি যদি সাহিত্যক্ষেত্রে আড়াল পড়ে থাকতো, তবে বোধ করি পৃথিবীর এত বেশী উন্নতি হতো না। যে-দেশ যত বেশী এগিয়ে গেছে, বুঝতে হবে সে-দেশের সাহিত্যের কাছ থেকে সেই দেশ তত বেশী প্রাণরস পেয়েছে। একটা জাতির শ্রেষ্ঠ পরিচয় তার সাহিত্য। সে সাহিত্য পর্ণগ্রাফীর দুষ্ট পাতা নয়, বরং বলিষ্ঠ সমাজচেতনার ঐতিহ্য। গ্রীক সাহিত্য আজও সেই ঐতিহ্য বহন করে, রেনেসাঁর স্বাক্ষর নিয়ে শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় দেশগুলি আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এমন কথা বলবো না যে, এই দেশগুলিতে সমাজ-কল্যাণমূলক রচনার বাইরে সাধারণ রচনাসমূহকে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে বা দুর্বল মস্তিষ্কজাত রচনার অনুশীলনকে বাড়তে দেওয়া হয়নি। হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে বহুসংখ্যক মানুষের কাছে তা তৃপ্তিকর পাঠের আনন্দ বয়ে নিয়ে আসে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে-আনন্দ দেশের সামগ্রিক উন্নতিকে চাপা দিয়ে নয়। যেখানেই

চাপা দিতে যাওয়া হয়েছে, সেখানেই ফল উল্টো ফলেছে, মানসিকতার দিক থেকে দেশ এগিয়ে যাবার পথ পায়নি।

যেখানে দেশের এই অবরুদ্ধ গতি, সেখানে আনন্দটাও বিকৃত হতে বাধ্য। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার দিকে তাকিয়ে আজ এ কথাই মনে হয় না কি যে, আমাদের জাতীয় জীবনের সামগ্রিক আনন্দে আজ অনেকাংশে সেই বিকৃতি দেখা দিয়েছে। তার প্রধানতম কারণ হচ্ছে—সাহিত্যে একদিকে যেমন বলিষ্ঠ সমাজচিন্তার অভাব দেখা দিয়েছে, তেমনি সেই অনুপাতে চিন্তার যথেচ্ছাচারও বেড়েছে। যে দেশে একদা বেদ, উপনিষদ, গীতা, পুরাণ, ভাগবৎ থেকে শুরু ক'রে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর পর্যন্ত সৃষ্টিশীল সমাজ-কল্যাণকর রচনায় সাহিত্য উন্নত হয়েছে, সেদেশে আজ একদিকে যেমন চটুল কথাসাহিত্যের একমুখি প্লাবন বয়ে চলেছে, তেমনি বাড়তির মুখে এগিয়ে চলেছে মঞ্চ ও পর্দাবিষয়ক অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বহুল চিত্রসম্বলিত সাময়িক পত্রিকাসমূহ। চিন্তাশীল সমাজবাদী রচনার সংখ্যা আজ এগুলোর তুলনায় এত নগণ্য যে, সেগুলোকে গণনায় পর্যন্ত আনা যায় না। একটা বলিষ্ঠ জাতির রুচি ও মননশক্তির যে কতখানি অধঃপতন ঘটতে পারে, তার উজ্জ্বল উদাহরণ আমাদের এই সাম্প্রতিককালের দেশ। এখানে যেমন বিভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সুরের পত্র-পত্রিকা, তেমনি সেই সুরে যোগান দিয়ে অত্যধিক জনপ্রিয়তাপ্রয়াসী লেখকেরা সুসঙ্গত চিন্তাধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটি মর্মান্তিক কথা হচ্ছে—পাঠকের রুচি অনুযায়ী যৌনধর্মী বা অপ্রাকৃত রোমান্টিক গল্প, উপন্যাস না লিখলে এখানে নাকি জনপ্রিয়তা অর্জন-করা সম্ভব নয়! এমন একটা মতবাদও অনেককাল থেকে শোনা যাচ্ছে। শুনে স্বভাবতঃই মনে হয়, এই জাতীয় কোনো রচনা না লিখেও উনবিংশ শতাব্দীর মনীষিবৃন্দ কী ক'রে এখনও জাতির জীবনে খ্যাতির রাজটিকায় ভাস্বর হয়ে আছেন!

যৌনধর্মী বা অপ্রাকৃত রোমান্টিক গল্প-উপন্যাসের তাগিদটা আসলে জনসাধারণের—যে জনসাধারণের শতকরা নব্বই ভাগ লোক এখনও যথোপযুক্ত শিক্ষার আলো পায়নি। তারা চিন্তাশীল কোনো রচনার ধার ধারে না, তাদের কাজ হচ্ছে হয় রাত জেগে তাস পেটানো, না হয় সস্তা ধরনের গান-বাজনা শুনে ও থিয়েটার বায়স্কোপ দেখে চটুল রহস্যময় কাহিনী শোনা।

এটা জাতির অশিক্ষাগত ব্যাধি। এই ব্যাধি থেকে অনেক সময় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদেরও মুক্তি পেতে দেখি না।

সুতরাং ব্যাধি যখন কোনও দেহকে এসে ভর করে, তখন প্রয়োজন হয় ডাক্তারের। ডাক্তার ওষুধ দিয়ে তাকে ভালো ক'রে তোলার দায়িত্ব নেন। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সেই ডাক্তার হচ্ছেন শিল্পী ও সাহিত্যিক। তাঁদের দায়িত্ব হচ্ছে ব্যাধিগ্রস্ত জনসাধারণের মনকে উচ্চতর শিল্পরসিক ক'রে তোলা। উচ্চতর শিল্প তাকেই বলবো—যে-শিল্পে দেশের প্রাণচেতনার উদ্বোধন হয়। ব্যাধিগ্রস্ত জনসাধারণের আবেদনে সাড়া না দিয়ে যদি তাঁরা সমষ্টিগতভাবে নিজের জ্ঞান ও চিন্তাশীল বিষয়বস্তুকে জনসাধারণের মনে প্রবেশ করাবার প্রয়াস পান, তবে বোধ করি তাঁদের জনপ্রিয়তার বিন্দুমাত্র অঙ্গহানি তো হয়ই না, বরং জাতীয় গৌরবের অধিকারী হ'য়ে তাঁরা মানুষের অন্তরের আরও বেশী গভীরে গিয়ে প্রবেশ করতে পারেন। এর জন্য প্রধান কাজ হচ্ছে অধুনাতন শিল্পী-সাহিত্যিককে স্ব স্ব সাধনক্ষেত্রে উপযুক্ত জ্ঞানের অধিকারী হ'য়ে দেশ ও জাতিগঠনমূলক রচনাশিল্প পরিবেশন করা। এই পদ্ধতি অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে দেশ যখন উন্নতির পথে অগ্রসর হবে, তখন শিল্পী-সাহিত্যিকরা নিছক আনন্দ পরিবেশনমূলক রচনা লিখুন বা চিত্র আঁকুন, তাতে অভিযোগের কোনো প্রশ্ন উঠবে না।

আসলে জনসাধারণের দাবির কোনো মান নেই। সেই মানহীন দাবি মিটিয়ে যে জনপ্রিয়তা, তা লেখকের অনুকূলে না এসে বরং প্রতিকূলতারই সৃষ্টি করে। কোথাও তা পৃথিবীর কোনো দেশকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় না। দেশের অজ্ঞতা যেখানে আষ্টে-পৃষ্ঠে, সেখানে জনসাধারণের রুচি মেটাবার যে সাহিত্য, তা বিকৃত শিল্প ভিন্ন আর কিছুই নয়। ইদানীং আমাদের দেশের অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই বিকৃত শিল্পের বহুতর প্রকাশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখানে রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের, বৃহত্তর জীবনবোধের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ ইদানীং ক্রমেই নগণ্য হয়ে উঠছে। অথচ রাষ্ট্র, সমাজ ও বৃহত্তর জীবনবোধের উপর ভিত্তি করেই এদেশে একদা রামায়ণ মহাভারতের মতো এপিক সৃষ্টি হয়েছে। হাতের কাছে বিগত ঊনবিংশ শতাব্দী তো রেনেসাঁই সৃষ্টি করলো! চিন্তায়, জ্ঞানে, কর্মে, আদর্শে ও ত্যাগে সুবর্ণময় যুগ বয়ে গেল ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

সে যুগেও জনসাধারণ ছিল, পাঠক ছিল, লেখক ছিল। তখনকার লেখক লেখাকে ক্রীড়ামোদ বা অর্থোপার্জনের হাতিয়ার ব'লে মনে না ক'রে জাতির সেবা ব'লে মনে করতেন। তাই নিছক জনসাধারণের মনস্তুষ্টি বিধান ক'রে তাদের হাততালি কুড়িয়েই সে-যুগের লেখকশ্রেণী ক্ষান্ত ছিলেন না, সচেষ্ট ছিলেন বৃহত্তর জাগতিক চেতনাকে স্ব স্ব জ্ঞানাঞ্জনী বৃত্তির সঙ্গে মিশিয়ে সত্যি-কারের জীবন সৃষ্টি করতে। সেই সৃষ্টি-প্রয়াসের পথই ছিল শ্রেয়তার পথ। আজ একদিকে জনসাধারণের দাবি মেটাতে গিয়ে এবং অন্যদিকে নিজেদের জনপ্রিয়তা ও শিল্পজাত আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে অতি মাত্রায় সচেতন হয়ে সৃষ্টিশীল শিল্পীরা সে পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে একদিকে যেমন নিজেদের জীবনকে উচ্চতর জ্ঞানের প্রয়োজনীয় উপাদানে গড়ে তুলতে পারছেন না, তেমনি পারছেন না দেশকে চিন্তায় ও কর্মের আদর্শে সুষমামণ্ডিত করে তুলতে। সামাজিক মান তাতে ক্রমেই নিম্নগামী হয়ে পড়ছে।

এই ব্যাধি থেকে মুক্তি পাবার আশু পথ হচ্ছে শিল্পীশ্রেণীকে যথার্থ জ্ঞানচর্চা ক'রে সেই জ্ঞানের আলোয় জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলা। শিল্পী-সাহিত্যিক মাত্রেরই আজ এ দায়িত্ব গ্রহণ করবার সময় এসেছে।

॥ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে চীন প্রসঙ্গ ॥

চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ফলে একদা অনেক চীনা সাধুসন্ন্যাসী ও বিদ্যার্থী জ্ঞানার্জনের জন্য ভারতে আসেন। ভারতীয় প্রচারকেরাও ধর্মপ্রচারের জন্য দলে দলে চীনদেশে যান। চীন থেকে যাঁরা ভারতবর্ষে আসেন, তাঁদের মধ্যে ফা-হিয়েন, হুয়াঙ্‌সাং এবং ইটসিং প্রধান।

ভারত থেকে যাঁরা চীনে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধানতঃ তেমনি নাম ক'রতে হয় কাশ্যপ মাতঙ্গ, আচার্য কুমারজীব এবং গুণরত্নের। গুণরত্ন অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থের চীনাভাষায় অনুবাদ করেন, কুমারজীব করেন ৯৪ খানা গ্রন্থ—যার মধ্যে ৪২৫টি খণ্ড আছে। ফা হিয়েনের ভ্রমণবৃত্তান্তে জানা যায়—তিনি পরিব্রাজকরূপে ভারতবর্ষে ভ্রমণ ও শিক্ষালাভ ক'রে বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হ'য়ে দেশে ফেরেন। হুয়াঙ্‌সাং বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থ ত্রিপিটকের অনেকাংশ অনুবাদ করেন ও অবশিষ্টাংশ শেষ করেন ইটসিং। হুয়াঙ্‌সাং ৫২০ বস্তা পুস্তক চীনদেশে নিয়ে যান, তার মধ্যে ৬৫৭ খানা গ্রন্থ ছিল। তিনি নিজে তার ৭৩ খানার অনুবাদ করেন—যাতে ১৩৩০ খণ্ড পুস্তক হয়। ইটসিং নিয়েছিলেন ৪০০ গ্রন্থ, তার মধ্যে ৫৬ খানির তিনি অনুবাদ করেন। সভ্যতার ইতিহাসে এতবড় কাণ্ড কদাচিৎ দেখা যায়। 'বিভিন্ন যুগের মহাভিক্ষুগণের জীবনকথা' বিষয়ক চীনাগ্রন্থে প্রায় ২০০ চীনাভিক্ষুর কথা আছে—যাঁরা ভারতে শিক্ষালাভ ক'রে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। ঐ গ্রন্থে এমন ২৪ জন ভারতীয় ভিক্ষুরও জীবনী পাওয়া যায়—যাঁরা বুদ্ধ-প্রবর্তিত মৈত্রী ও করুণার ধর্ম চীনদেশে প্রচার ক'রে অসামান্য সাফল্যলাভ করেন।

লক্ষ্য ক'রবার বিষয় যে, যদিও অধিকাংশ পুস্তক সাধারণতঃ বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্মের বিষয়ীভূত, তথাপি এমন বহু পুস্তকও পাওয়া যায়—যেগুলো অন্যান্য দর্শন ও নানাবিধ বিষয়ক, এবং এমনকি অবৌদ্ধ শাস্ত্রের অন্তর্গত। উদাহরণ স্বরূপ—সাংখ্য-দার্শনিক-কারিকা-ভাষ্য, সুবর্ণ-সপ্ততি-শাস্ত্র এবং বৈশেষিক-দর্শনান্তর্গত দশপদার্থশাস্ত্র। সহস্রাধিক বর্ষকাল প্রধানতঃ ভারতীয় মনীষিগণের প্রভাব চীনের জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত হয়। মোটামুটি ২২০-১২৭৯ ঈশাব্দের ভিতর এই প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। এর মধ্যে

আবার সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে কন্‌ফিউসন্‌ ও তাওবাদী আধ্যাত্মিক জনগণের উপর ভারতীয় প্রভাব বিশেষভাবে পড়ে। পরবর্তীকালে তা থেকে যে যুক্তিবাদী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, তা আধুনিক কাল অবধি বিদ্যমান ; তারা চীনাভাষায় 'লিঃ শিও' নামে পরিচিত।

সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকলার ও স্থপতিবিদ্যার আদানপ্রদানের ফলে মূর্তিনির্মাণশিল্প যেমন ভারত থেকে চীনে গিয়ে প্যাগোডা নির্মিত হ'লো, তেমনি প্রাচীর চিত্রাঙ্কন (Fresco) পদ্ধতির অনেকাংশ চীন থেকে ভারতবর্ষ অর্জন করলো। উভয় দেশের চিত্র-প্রদর্শনীর মধ্যে আমরা সাম্প্রতিককালেও তার বহু নিদর্শন লক্ষ্য করেছি।

আমাদের দেশে প্রধানতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের ভিতর অসংখ্য স্থানে চীনের উল্লেখ এবং তদ্দেশ-সম্বন্ধীয় কিছু কিছু বিবৃতি পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন রামায়ণ ও মহাভারতও বাদ যায় না। মহাভারতের বহুস্থানে এবং রামায়ণেও অন্ততঃ একস্থলে চীনের উল্লেখ আছে।—

চীনানপরচীনাংশ্চ তুখারান্ বর্বরানপি।
কাঞ্চনৈঃ কমলৈশ্চৈব কাম্বোজানপি সংবৃতান॥ ৫.৪৪.১৪

(Ramayana, ed, G. Gorrasio, Paris, 1884)

মহাভারত আদিপর্বে (১৯১ : ৪০) ও সভাপর্বে (৩৮ : ৫৫) চীন দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। সভাপর্বেই আবার ভগদত্ত অর্জুনের বাধা উৎপাদন করেন চীন-সৈন্য সমাবৃত হ'য়ে—

স কিরাতৈশ্চ চীনৈশ্চ বৃতঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষোভবৎ। ২.২৬.৯

উদ্যোগ পর্বে : ভগদত্ত দুর্যোধনকে যে এক অক্ষৌহিনী সেনা প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে চীনাসৈন্য ছিল।—

ভগদত্ত মহীপালঃ সেনামক্ষৌহিনীং দদৌ।
তস্য চীনৈঃ কিরাতৈশ্চ কাঞ্চনৈরিব সংবৃতম।
বভৌ বলমনাধৃষ্যং কর্ণিকারবনং যথা॥ ১৯।১৫।১৬

পুনরায় উদ্যোগপর্বে চীন দেশীয় ঘোটকের কথা পাই—

বাজীনাং চ সহস্রাণি চীনদেশোদ্ভবানি চ। ৮৬.১০

পুনরায়—

অর্কজশ্চ বক্সীহানাং চীনানাং ধৌতমূলক। ৭৪.১৪

বনপর্বে আছে—

হারহূনাংশ্চ চীনাংশ্চ তুষারান সৈন্ধবাং স্তথা।
অদ্রাক্ষমহমাহূতান্ যজ্ঞে তে পরিবেষকান্ ॥ ৫১.২৫.১৬

ভীষ্মপর্বে—

তথৈব রমনাশ্চীনা স্তথা চ দশমালিকাঃ।
ক্ষত্রিয়োপনিবেশাশ্চ বৈশ্যশূদ্রকুলানি চ ॥ ৯.৬৬

কর্ণপর্বে—

পাঞ্চালাংশ্চ বিদেহাংশ্চ কুলিন্দ কাশিকোশলান্।
সুহ্মানঙ্গাংশ্চ বঙ্গাংশ্চ নিষাদান্ পুণ্ড্রচীনকান্ ॥ ৮.৭৯

মহাভারতের সঠিক সময় সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও তা যে অতি প্রাচীন, সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। 'Five thousand years ago' নামক এক নিবন্ধ Kane commemoration volume এ (১৯৪১) প্রকাশিত হয়। উক্ত নিবন্ধে লেখক শ্রীত্রিবেদ প্রমান ক'রতে চেষ্টা করেন যে, ভারত-যুদ্ধ ঘটে খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে।

পুলকেশীর শিলালিপিতে (কল্যব্দ ৩৭৭৫ = খ্রীঃ ৬৩৪) আছে—

ত্রিংশৎসু ত্রিসহস্রেষু ভারতাদাহবাদিতঃ।
সপ্তাব্দশতযুক্তেষু গতেষব্দেষু পঞ্চসু ॥ (Ind. Antiquary, 8.241)

একথা প্রাণিধানযোগ্য যে, মহাভারতে চীনাগণকে যোদ্ধা এবং ক্ষত্রিয়রূপে দেখতে পাওয়া যায়। তারা ভারতীয় ক্ষত্রিয়গণের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ ক'রতো। যজ্ঞে কেবল যে তারা নিমন্ত্রিত হ'তো, তাই নয়, পরিবেশন কার্যেও যোগ দিত। পরে মনুস্মৃতিকার বৃষলত্ব বা শূদ্রত্ব প্রাপ্তির উল্লেখ করেছেন। (১০ : ৪৩-৪৪)

বৌদ্ধগ্রন্থ 'ললিত বিস্তরে' আমরা চীনালিপির উল্লেখ পাই : বোধিসত্ত্ব আচার্য বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞেস করলেন—

'কতমাং, ভো উপাধ্যায়, লিপিং মে শিক্ষয়িষ্যসি ? ব্রাহ্মীং খরোষ্টীং অঙ্গলিপিং বঙ্গলিপিং মগধলিপিং চীনলিপিং হুনলিপিং—চতুঃষষ্ঠিলিপিনাং কতমাং…ত্ব শিক্ষয়িষ্যসি ?'
(অধ্যায় ১০)। দেবনাগরী বোধ হয় তখন ছিল না।

কথা-সরিৎসাগরে চীনাপিষ্ট বা চীনাসিঁদুরের কথা বর্ণিত আছে—

চীনপিষ্টময়ো লোকশ্চারণৈকময়ী চ ভূঃ।

আনন্দময্যাং সর্বস্তামপি তস্তামভৎ পুরি ॥ ২৩.৮৩

Pally Text Society-প্রকাশিত 'অথশালিনী' নামক ধর্মসঙ্গনির অথকথায় আছে—

যাসাং বাসেন দিসাভাগা চীনপিট্‌ঠ চুন্নরঞ্জিতা।৪১

সুত্তনিপাতে—

সামাকচিঙ্গুলকচীনকানি

পত্তপ্ ফলং মূলপ্‌ফলং গবিপ্‌ফলং।

ধম্মেন লদ্ধং সতমস্নমানা

ন কামকামা অলিকং ভনান্ত ॥ ২.২.১

ঐ গ্রন্থের অর্থকথায় বা ভাষ্যে চীনক শব্দকে চীন-মুগ্‌গা বা চীনমুগ নামক শস্য বলা হ'য়েছে। বিষ্ণুপুরাণে চীনাক শব্দ আছে—

ব্রীহয়শ্চ যবাশ্চৈব গোধূমা অণবস্তিলাঃ।

প্রিয়ঙ্গবো হ্যদারাশ্চ কোরদূষা সচীনকাঃ ॥ ১.৬.২১

ভাবপ্রকাশে 'চীনাক' শব্দের উল্লেখ আছে—

চীনাকঃ কঙ্গু ভেদোঽস্তি সজ্ঞেয়ঃ কঙ্গুবদ্ গুণৈ ॥

—(পূর্ব খণ্ড, ১ম ভাগ, ধান্যবর্গ)।

আভিধানিক হেমচন্দ্র 'অভিধান চিন্তামণি'তে এবং 'চতুরঙ্গ চিন্তামণি'তে চীনক শব্দের উল্লেখ ক'রেছেন।—

'নানকস্তু কাককঙ্গুঃ!' (অভিধান চিন্তামণি ৪. ২৪৪)

এই শস্য চীনাবাদাম হওয়া অসম্ভব নয়। সম্ভবতঃ তা চীনদেশ থেকে প্রথম আনীত হয়। এতদ্ব্যতীত রাজ-নির্ঘণ্টে চীন-কর্পূর, চীনাকর্কটি, চীনা লোহ, চীনবঙ্গ বা সীসা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। অমরকোষ (সিংহাদিবর্গ ৯)ও অভিধান চিন্তামণি (৪. ৩৬০) এই উভয় গ্রন্থেই চীন-মৃগের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভাবপ্রকাশে চীনকর্পূরের কথা এইরূপ—

চীনাকসংজ্ঞ কর্পূরঃ কফক্ষয়করঃ স্মৃতঃ।

কুষ্ঠকণ্ডুবমিহরস্তথা তিক্তরসশ্চ সঃ ॥

—(পূর্বখণ্ড, ১ম ভাগ, কর্পূরাদিবর্গ)

বরাহ-মিহিরের বৃহৎ সংহিতায় আছে—

গন্ধার-কাশ্মীর-পুলিন্দচীনান্।
হতান্ বদেন্ মণ্ডলবর্ষমশ্মিন্ ।। (৫. ৭৭)

আবার—

কাশ্মীরান্ সপুলিন্দচীনযবনান্
হন্যাৎ কুরুক্ষেত্রকান্। (৫.৭৮)
কাম্বোজ-চীন-যবনান্ সহশল্যহৃদ্ভি।
বাহলীক সিন্ধুতটবাসিজনাংশ্চ হন্যাৎ ।। (৫.৮০)

বৈদ্যক শাস্ত্রে—'সুশ্রুত সংহিতা'য় ক্ষতস্থানের দৃঢ়াবরণ 'ব্যাণ্ডেজ' করার জন্য চীনপট্টের উল্লেখ আছে।—(সূত্রস্থান অ ১.৮) তন্ত্রশাস্ত্রান্তর্গত 'শক্তিসঙ্গম-তন্ত্রে'ও চীন দেশের বর্ণনা পাওয়া যায়, যেমন—

'মানসেনাদ্দক্ষপূর্ব্বে চীনদেশ প্রকীর্তিত।'

'চীনাচার প্রয়োগ বিধি' এবং 'মহাচীনাচার-তন্ত্র' নামক দু'খানি তন্ত্রগ্রন্থও পাওয়া গিয়েছে। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত পদ্য ও গদ্য সাহিত্যেও চীনের উল্লেখ বহুস্থানে রয়েছে। কালিদাসের শকুন্তলা ও কুমারসম্ভবে চীনাংশুকের কথা আছে।—

'চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য। —(শকুন্তলা, ১ম অঙ্ক)

'চীনাংশুকৈঃ কল্পিতকেতুমালম ।—(কুমারসম্ভব, '৭৩)

'মালবিকাগ্নিমিত্রে'ও চীনাংশুকের কথা আছে। তেমনি হরিবংশেও চীনাংশুকের উল্লেখ পাওয়া যায়।—

'সুবর্ণমালা কুলভূষিতাঙ্গাশ্চীনাংশুকাভূষিত ভোগভাজঃ।'
—(ভবিষ্যপর্ব, ৫.৪৪ অধ্যায়)

'দশকুমার চরিতে' চীনাম্বরের কথার উল্লেখ দেখা যায়, যেমন—

'কস্যচিৎ চূতপোতকস্য ছায়াশীতলে
সৈকততলে গন্ধকুসুম হরিদ্রাক্ষত—
চীনাম্বরাদিনা নানাবিধেন পরিমলদ্রব
নিকরেন মনোভবমর্চয়ন্তী রেমে ।।' (৫ম উচ্ছাস)

ভারতের বিভিন্ন সাহিত্যে এরকম আরও বহুতর উল্লেখ আছে। তেমনি মূলতঃ বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের ইতিবৃত্ত হ'লেও প্রাচীন চীনাসাহিত্যে ভারতীয়

দর্শনেরই অভিব্যক্তি ঘটে। বরং একদা চীন ও ভারতের মধ্যে যে প্রীতি ও সৌহার্দের সম্পর্ক বর্তমান ছিল, তা চীনদেশের সাহিত্য ও ইতিহাস থেকে যতটা জানা যায়, ভারতীয় সাহিত্য থেকে ঠিক ততটা বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায় না। বহু সংস্কৃত ও পালিগ্রন্থ ভারত থেকে বৌদ্ধ বিতাড়নের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়, কিন্তু তার অনেকগুলি চীনে, তিব্বতে ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশের ভাষায় রক্ষিত হয়। ফলে ভারতের সঙ্গে এই দেশগুলি নিবিড় সৌহার্দে যুক্ত থাকে। অদ্যাবধি সেই সংযুক্তি একই ধারায় চ'লে আসছে। আধুনিক রাষ্ট্রবিদদের দাবার চালে যে এত হাজার বছরের আত্মিক সম্পর্ক ছিন্ন হ'তে পারে না, তা আজ নতুন ক'রে রাষ্ট্র-ধুরন্ধরদের উপলব্ধি করার সময় উপস্থিত হ'য়েছে।

॥ কেশবচন্দ্র ও নববিধান ॥

পৃথিবীর মানবজাতির ভিতরে এক সার্বভৌম ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠাই ছিল কেশবচন্দ্রের প্রধান লক্ষ্য। সকল ধর্মের মূল সত্য যে এক, সেই সত্য-ধর্মকেই তিনি প্রকৃত ধর্ম ব'লে গ্রহণ করেছিলেন ; এই ছিল তাঁর 'নববিধান'। মানুষে মানুষে মিলন, ভ্রাতৃভাব, সকল প্রকার ধর্মভাবের আদান-প্রদান এবং পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধা সঞ্চার এবং সামঞ্জস্য বিধান করাই ছিল তাঁর এই 'নববিধান' ধর্মের মূল ভিত্তি। তিনি বলতেন : 'সকল মানব জাতিই এক ধর্মে মিলিত হইবে। ঈশ্বর যদি এক হন, তবে তাঁহার পূজার মন্দিরও একটি।'

জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত ক'রে এইভাবেই তিনি সমগ্র ভারতবর্ষকে একসূত্রে গ্রথিত করতে চেয়েছিলেন। এবিষয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে অনৈক্য উপস্থিত হ'লে নিজের আদর্শের জন্য তিনি মহর্ষিদেবের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বাধ্য হন। দেবেন্দ্রনাথের উপাসনা মন্দিরে তখন কেবল উপবীতধারী ব্রাহ্মণেরাই বসবার অধিকার পেতো, অব্রাহ্মণের সেখানে স্থান ছিল না। কেশবচন্দ্রের 'নববিধান' এই বর্ণবৈষম্যকে ভেঙে শূদ্রকেও ব্রাহ্মণের সঙ্গে একই আসনে বসবার অধিকার দিল। গান্ধীজীর উদ্যোগে আধুনিক ভারতে অস্পৃশ্যদের মন্দির-প্রবেশ এবং পূজার অধিকার লাভ সম্পর্কিত যে আন্দোলন দেখা দেয়, কেশবচন্দ্রের জীবনেই তার প্রথম সূত্রপাত। দেশবাসী হয়তো সে ইতিহাস আজ স্মরণে রাখেনি!

ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাপুরুষদের মধ্যে কেশবচন্দ্রের আসন ছিল একেবারেই স্বতন্ত্র। কি ধর্ম, কি শিক্ষা, কি সমাজ, কি অস্পৃশ্যতা-বিরোধি প্রচেষ্টা, কি ধর্মসমন্বয়তা, মাদকতা নিবারণ, অসবর্ণ বিবাহ, স্ত্রী-শিক্ষা, এমন কি সর্ব-সাধারণের শিক্ষা—সবদিকেই তাঁর প্রগতিশীল মনের সুস্পষ্ট ছাপ ছিল। যে কটি সার্থক লক্ষণের দ্বারা তিনি ভূষিত ছিলেন, তার মধ্যে বিশ্বাস ও প্রার্থনা, বিবেক বা ঈশ্বরাদেশ শ্রবণ, বৈরাগ্য, আমিত্বহীনতা, পাপবোধ, স্বাধীনতা, শিষ্যত্ব, শিশুত্ব : শিশুর ন্যায় সরল ও পবিত্র এবং উদারতাই প্রধান।

সে যুগে এমন এক সময় এসেছিল—যখন দেশবাসী নিজেদের অতীত ঐতিহ্যকে পুরোপুরি অস্বীকার করতেই আরম্ভ করেছিল। কেশবচন্দ্র ভারতের

সেই অতীত মাহাত্ম্যকেই দেশবাসীর মনে নতুন ক'রে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হলেন। অতীতকে ভিত্তি করেই সমাজ ও ধর্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হলেন তিনি। যোগ, ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মের এক অপূর্ব সম্মেলন ঘটে কেশবচন্দ্রের জীবনে। শিশুকাল থেকেই তাঁর জ্ঞানানুরাগ প্রবল ছিল। তিনি কেবল নিজেই জ্ঞানানুশীলন ক'রে আনন্দ পেতেন না, অন্যকেও তাঁর অর্জিত বিদ্যার অংশ দিয়ে তৃপ্তি লাভ করতেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, নীতিশাস্ত্র—সর্ব বিষয়েই তাঁর সমান ব্যুৎপত্তি এবং অসাধারণ অনুরাগ ও জ্ঞান ছিল। শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি নিজের বাড়িতে বালক এবং মহিলাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ক্রমান্বয়ে তাঁর উদ্যোগে নৈশ বিদ্যালয়, শ্রমজীবী বিদ্যালয়, ব্রহ্ম বিদ্যালয়, সঙ্গত সভা, আলবার্ট কলেজ, মহিলা বিদ্যালয়, ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন, মাদকদ্রব্য নিবারণী সভা প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ধর্ম ও নীতিশিক্ষার জন্য তিনি কয়েকটি দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। একদিকে ভাব-গাম্ভীর্য অন্যদিকে সহজ সরলতা—পাশাপাশি এ দুটি বিরুদ্ধ গুণের সমন্বয়ে তাঁর বাংলাভাষা তথা রচনাসমূহ অনন্য হয়ে উঠতো। তাঁর বক্তৃতার মধ্যেও এই ভাব-গাম্ভীর্য ও সরলতারই প্রভাব দেখা যেতো। নিজের বক্তৃতা সম্পর্কে তিনি বলেন : 'আমি যে বক্তৃতা দেই, তাহা আমি দেই না। আমার নিজের কোনও ক্ষমতা নাই। ভগবৎশক্তি আমার অন্তরে আবির্ভূত হইয়া আমার রসনা দ্বারা উহা প্রকাশ করে। তখন এই বক্তৃতা আবেগপূর্ণ অগ্নিময় ভাষাতে প্রকাশিত হয়।'

ঈশ্বরের প্রতি এই অচলা বিশ্বাসেই সংসারের নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও দুস্তর বাধাকে তিনি হাসিমুখে জয় করতে পেরেছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি স্বাধীনচেতা ও নির্ভীক চরিত্রের মানুষ ছিলেন। একমাত্র পরমব্রহ্ম ভিন্ন অপর কারো অধীনতা তিনি স্বীকার করেননি। অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল তাঁর নির্ভীক চিত্তের সহজাত বৃত্তি। সত্য, ধর্ম এবং ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসই ছিল কেশবচন্দ্রের সকল চিন্তাসূত্রের মূল আধার। তিনি বলতেন : 'জীবনসংগ্রামে মানবমাত্রেই এক-একজন সৈনিক। তাহার রক্ষাকবচ হইল—সত্য ও ধর্ম, আর বর্ম হইল—দৃঢ় বিশ্বাস।'

১৮৩৮ সালের ১৯শে নভেম্বর কলকাতায় কলুটোলার প্রসিদ্ধ সেনবংশে কেশবচন্দ্রের জন্ম। বাংলায় তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন সূর্যোদয়ের সূচনা।

কেশবচন্দ্রের পিতামহ রামকমল সেন এবং পিতা প্যারীমোহন সেন উভয়েই ছিলেন নিষ্ঠাবান ধার্মিক; মাতা সারদা দেবীর মধ্যেও সেই ধার্মিকতার লক্ষণ সুস্পষ্ট ছিল, পুণ্যবতী ও বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন তিনি। কেশবচন্দ্রের আকৃতি ছিল দীর্ঘ, গৌরবর্ণ ও সুশ্রী। তাঁর শান্ত মূর্তি ও সুগঠিত দেহ দেখলে তাঁকে দিব্যকান্তি দেবশিশুর মতই মনে হতো। বিদ্যালয়ে সতীর্থগণ তাঁকে তাদের নেতা ব'লে মান্য করতো। ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বিশুদ্ধতার প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল সর্বদা জাগ্রত। এই পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে ধর্মের যোগ ছিল। একদিকে তিনি যেমন লজ্জাশীল ও বিনয়ী ছিলেন অন্যদিকে ছিলেন তেমনি তেজস্বী, কৌশলী ও দৃঢ়ব্রত। কিন্তু সেই দৃঢ়তার অন্তরালে আত্মাভিমান ছিল না, বরং এটা ছিল তাঁর নৈতিক চরিত্রের আবরণস্বরূপ।

১৮৫৬ সালের এপ্রিল মাসে বালিগ্রামের চন্দ্রনাথ মজুমদারের ন' বছরের মেয়ে জগন্মোহিনীর সঙ্গে কেশবচন্দ্রের বিবাহ হয়। বাল্যবিবাহে তাঁর মত ছিল না, কিন্তু অভিভাবকদের আদেশ তাকে পালন করতে হয়। সংসার-জীবনে স্ত্রীর সান্নিধ্যে তিনি পারিবারিক স্বচ্ছন্দ্য লাভ করলেন না। বিবাহের এক বছর অতিক্রান্ত না হতেই তাঁর মনে প্রবল বৈরাগ্য-ভাব উদিত হলো। আমোদ-প্রমোদ ও আমিষ আহার ত্যাগ ক'রে তিনি কঠোর সংযম অবলম্বন করলেন। একটা অননুভূত গাম্ভীর্য ও বিষণ্ণতায় তাঁর মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। নির্জনতা বড় প্রিয় হয়ে উঠলো তাঁর। একান্ত নিভৃতে ব'সে একনিষ্ঠভাবে তিনি ধর্ম চিন্তা, শাস্ত্রচর্চা ও প্রার্থনা করতে আরম্ভ করলেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন: 'প্রার্থনা করিবার জন্য আমি যখন প্রথম আদেশ পাইলাম, তখন আমি এই বাণী শুনিলাম—প্রার্থনা করো, প্রার্থনা ব্যতিরেকে অন্য গতি নাই। আমি প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। প্রার্থনা দ্বারা আমার হৃদয়ের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হইল। আমার মনোবল বৃদ্ধি পাইল।'

এ সময়ে কেশবচন্দ্র সাহিত্য, ধর্ম ও নীতি শিক্ষার জন্য কয়েকজন যুবককে নিয়ে নিজের গৃহে একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি নিজে এর রেক্টর হন। দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাহিত্য ছাড়া 'ইয়ংস নাইট থট' এবং শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে তিনি হ্যামলেট অভিনয়ও করতেন। ১৮৫৭ সালে তাঁর প্রচেষ্টায় 'গুড উইল ফ্র্যাটারনিটি' সমিতি গড়ে ওঠে। সকলের মধ্যে সদ্ভাব ও ভ্রাতৃভাব সৃষ্টি

করাই ছিল এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। দেশে তখন সিপাহী বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। এ সময়ে এমন একটি সমিতির কার্যকারিতার প্রতি দেশের বিদগ্ধ সমাজ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে উঠলো। কেশবচন্দ্র নিজের সম্বন্ধে বলেছেন: 'আমি কোনও একটি মুহূর্তের জন্যও মনে সাম্প্রদায়িকতা পোষণ করি নাই। ঈশ্বর আমাদের পিতা এবং প্রত্যেক মানুষই আমাদের ভাই—এই মতই আমি বন্ধু-বান্ধব সকলের কাছে প্রচার করিয়াছি।'

এর কিছুকাল পরেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর ক'রে ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হন এবং ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। হিমালয়ের তুহিন শীতল নির্জনতায় ব্রহ্মসাধনের পর যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দেশে ফিরে আসেন, তখন একদল ধর্মনিষ্ঠ যুবক তাঁর সাহচর্যে ব্রাহ্মসমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। কেশবচন্দ্র ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এসময়ে মহর্ষিদেবের জীবন ও কার্য এবং কেশবচন্দ্রের জীবন ও কার্য অচ্ছেদ্য ছিল। মহর্ষিদেব তাঁকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত ক'রে ১৮৬২ সালে কলকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে অভিষিক্ত করেন। দেবেন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় কেশবচন্দ্র যে 'ডিভিনিটি স্কুল' বা ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, তার ফলে খৃষ্টধর্মের প্রতি হিন্দু যুবকদের আকর্ষণ ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে এবং বহু যুবক ক্রমে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যথায় ইংরেজের প্রলোভন ও খৃষ্টান পাদরীদের প্রচারে দেশ ক্রমে খৃষ্টানধর্মী হয়ে পড়তো। পূর্বে এই খৃষ্টধর্ম থেকে দেশকে রক্ষা করেন রাজা রামমোহন রায়, পরবর্তীকালে তাঁর অপূর্ণ কাজকে সার্থক ক'রে তোলেন দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র। এইভাবে ব্রাহ্মধর্মের মতবাদ ক্রমে এক সার্বভৌমিক মূল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হলো। কেশবচন্দ্রের দৃষ্টান্তে এদেশে এক নতুন যুবক সম্প্রদায় গড়ে উঠলো, সৃষ্টি হলো 'সংগত সভা'র। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল: প্রত্যেকে সত্য প্রেম ও পবিত্রতায় উজ্জ্বল হ'য়ে দেশ ও জাতির সংস্কৃতি বিকাশের সহায়ক হবে এবং এইভাবে ধীরে ধীরে জগতে এক মহাজাতি গড়ে উঠবে।

এসময়ে অবকাশ মতো তিনি জনশিক্ষামূলক কিছু কিছু ইংরেজী পুস্তিকা রচনা করেন। 'ইয়ং বেঙ্গল, দিস ইজ ফর ইউ', 'দি প্রেয়ারফুল' প্রভৃতি পুস্তিকা এই সিরিজেরই অন্তর্গত। এ জাতীয় গ্রন্থের সংখ্যা মোট তেরোখানি। কয়েকখানি পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্বও এসময়ে কেশবচন্দ্রকে

গ্রহণ করতে হয়। ১৮৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান মিরার' ও ১৮৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা কলেজ'-এর কর্তৃত্বভারও তিনি গ্রহণ করেন। ১৮৬৪ সালে তিনি স্বতন্ত্রভাবে 'ধর্মতত্ত্ব' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এখন থেকে তাঁর ধর্মমতসমূহ এই ধর্মতত্ত্বেই প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৬৬ সালে কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে গ'ড়ে ওঠে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'। এই সমাজই 'নববিধান' ধর্মসাধনের ভিত্তিভূমি। প্রাচীন ব্রাহ্মসমাজ তখন 'আদি সমাজ' নামে অভিহিত হলো। দেবেন্দ্রনাথ আদি সমাজের নেতা হলেও 'নববিধান'-এর তিনি সভ্য হন। সমাজগতভাবে মতবিরোধ থাকলেও কেশবচন্দ্রের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও প্রীতিই এর একমাত্র কারণ।

সারা ভারতব্যাপী 'নববিধান'-এর প্রচারকার্য পরিচালনার সময় বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, গীতা, কোরান, বাইবেল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের বিশেষ বিশেষ শ্লোক সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা ক'রে কেশবচন্দ্র 'শ্লোকসংগ্রহ' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। 'ট্রু ফেইথ' বা 'প্রকৃত বিশ্বাস' তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ। তাঁকে অনুসরণ ক'রে তাঁর সহযোগী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, গৌরগোবিন্দ রায় প্রমুখ মনীষীরা বেদ, বেদান্ত, গীতা প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা ক'রে তার মূল তত্ত্বগুলিকে বাংলাভাষায় রূপ দেন। সাধু অঘোরনাথ 'ধ্রুব', 'প্রহ্লাদ', 'শাক্যমুনি' প্রভৃতি ভক্তজীবনী রচনা করেন। গিরিশচন্দ্র সেন ইসলাম ধর্ম আলোচনা ক'রে কোরান শরিফের প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন। সঙ্গীতাচার্য চিরঞ্জীব শর্মা ব্রহ্মসঙ্গীত ও সংকীর্তন এবং শ্রীচৈতন্যের জীবনী রচনা করেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার খৃষ্টধর্মগ্রন্থ অনুশীলন ক'রে ইংরেজী ও বাংলাভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এইভাবে কেশবচন্দ্রের ভক্ত সাধকবৃন্দের অমূল্য দানে বাংলাভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে।

এসময়ে কেশবচন্দ্র 'মাদকতা নিবারণী সভা' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতির সভ্যরা দলবদ্ধ হ'য়ে রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে সুরা পানের কুফল প্রচার করতেন। ফলে গভর্ণমেণ্ট তাঁর আবগারী ও অন্যান্য কোনো কোনো বিভাগের আইনের সংস্কার করতে বাধ্য হন। বয়স্কা মহিলাদের শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় এবং 'ভারত সংস্কার সভা' নামে অপর একটি সমিতিও এই সময়ে কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। 'ভারত সংস্কার' সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন : 'সকলের আত্মত্যাগ অবলম্বন ব্যতীত ভারত-

বর্ষের পূর্ণ সংস্কার সম্ভবপর নহে। সত্যকে অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে এবং বাক্যে, কার্যে ও চিন্তায় সত্য প্রচার করিয়া আমাদিগকে জীবন বিসর্জন করিতে হইবে। একমাত্র সদুদ্দেশ্য সাধনে অবিচলিত বিশ্বাসের সহিত যত্নবান থাকিয়া আমাদিগকে কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিতে হইবে। কোনও অবস্থাতেই আমাদের বিবেকের সঙ্গে আপোষ রক্ষা করিলে চলিবে না। ভারতবর্ষের প্রচুর অধঃপতন হইয়াছে। ভারত মাতার দুর্গতি ও ক্লেশের আজ সীমাহীন অবস্থা। ভারতের পরিপূর্ণ সংস্কারের জন্য পরাক্রমশালী বিপ্লবের প্রয়োজন। পূর্ণ বিপ্লবের ভিতর দিয়াই উপযুক্ত সময়ে ভারত নবজীবন লাভ করিবে।'

১৮৭০ সালে কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার যুগ। কেশবচন্দ্র মহারাণীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ ক'রে ভারতের সর্ববিধ উন্নতির জন্য তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন এবং বিভিন্ন বক্তৃতাকেন্দ্রে ইংরেজদের সম্বোধন ক'রে এ সম্পর্কে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। এখানে লর্ড লরেন্স, রেভারেণ্ড স্পিয়ার্স, ম্যাক্সমূলার, মার্টিনো, ডীন স্ট্যানলি, গ্ল্যাডস্টোন প্রভৃতি মনীষীদের সঙ্গে ক্রমে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে—যেমন গড়ে ওঠে অক্সফোর্ডে জন স্টুয়ার্ট মিলের সঙ্গে। অতঃপর ব্রিস্টল নগরে গিয়ে তিনি মিস কার্পেণ্টারের আতিথ্য গ্রহণ করেন। রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-স্মৃতির সঙ্গে জড়িত এই ব্রিস্টল নগরী। এখানেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। যেখানে ব'সে তিনি উপাসনা করতেন, কেশবচন্দ্রও সেই স্থানটিতে উপাসনায় ব'সে রামমোহনের অমর আত্মার শান্তি কামনা করেন। উল্লেখ-যোগ্য যে, তাঁর এই বিলেত ভ্রমণের ফলে লণ্ডনে 'ব্রাহ্মসমাজ' এবং ব্রিস্টলে 'ন্যাশনাল সভা' স্থাপিত হয়।

দেশে ফিরে আসার পর সাহিত্য প্রচারের জন্য তিনি 'সুলভ সমাচার' নামে এক পয়সা দামের একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। দরিদ্র দেশবাসী এর দ্বারা সেদিন যে কতখানি উপকৃত হয়েছিল, তা কল্পনা করা যায় না। পত্রিকার নামের নীচে নিয়মিত একটি কবিতার পংক্তি ছাপা হতো—

'সহজে পাইতে যদি চাও জ্ঞানধন,
সুলভ সংবাদপত্র কর অধ্যয়ন।'

অনেকেই এর দ্বারা তখন এই সমাচারের প্রতি আকৃষ্ট হতো। কেশবচন্দ্র

নিজেও এতে সহজ সরল ভাষায় নীতিমূলক প্রবন্ধ লিখতেন। ১৮৭১ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' দৈনিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হতে শুরু হয়। এরকম একখানি সংবাদপত্র দেশে তখন আর একখানিও ছিল না। শিক্ষাবিস্তারকল্পে শ্রমজীবীদের জন্য বাংলা বিদ্যালয়ও এই সময়ই প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং মাদকদ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য 'বিষবেরী' নামে বিনামূল্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হতে থাকে। এ সময়ে দেশের শিক্ষা সংস্কারের জন্য কেশবচন্দ্র গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে বহু আলোচনা ও পত্রালাপ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু অর্থ সংগ্রহ ক'রে জনসাধারণের মধ্যে ভ্রাতৃভাব সৃষ্টির জন্য 'আলবার্ট হল' প্রতিষ্ঠা করেন। এতে নানা বিষয়ক গ্রন্থ সম্বলিত একটি বিপুলায়তন পাঠাগার স্থাপন এবং মাঝে মাঝেই সাধারণ বিষয়ে সভা ও বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া 'আলবার্ট কলেজ' নামে একটি উচ্চ শিক্ষায়তনও এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এসময়ে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের মিলন আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পরমহংসদেবের মহতী ভগবদ্ভক্তি এবং সরল ও মধুর বাল্যভাব কেশবচন্দ্রের যোগ, ভক্তি, নীতি, বৈরাগ্য ও বিশুদ্ধ ধর্ম-জ্ঞানকে এক নতুন রূপ দান করলো। কেশবচন্দ্রও তেমনি পরমহংসদেবের হৃদয়ে নতুন এক আলোক-সম্পাত করলেন। পৃথিবীতে যত ধর্মমত প্রচলিত আছে, সকল ধর্মের সারসত্যই এক; সুতরাং ধর্ম-সমন্বয়সাধনের মহামিলনে উভয়ের অন্তরে এক অপূর্ব যোগ স্থাপিত হলো।

মাঝে মাঝে নগ্নপদে গৈরিক বসন পরিধান ক'রে কেশবচন্দ্র কলকাতার পথে পথে হরিনাম সংকীর্তন ক'রে বেড়াতেন এবং দুঃস্থ দরিদ্র ব্যক্তিদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে একতারা সহযোগে গান করতেন। দুঃস্থদের ছিলেন তিনি দরদী বন্ধু; তাঁর ভিতরের আত্মভোলা মানুষটি ছিলেন সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। দেশ তাই তাঁকে অতি সহজেই গ্রহণ ক'রেছিল। 'নববিধান' সমাজের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে তিনি বলতেন: 'ধর্ম সমন্বয়ের ভাব লইয়া ইহার জন্ম। বিধাতা নিত্য নূতনভাবে যাহা দান করেন, তাহাই নববিধান। নববিধান ধর্মের সাধক নিত্য নূতন হইতে থাকেন। শিশু নিত্য নূতন শিক্ষালাভ করে, প্রতিদিন বর্ধিত হয়। সাধকের জীবনও সেইরূপ সাধনা দ্বারা নিত্য নূতন জীবনে উন্নত হয়।'—দেবালয়ে যেমন প্রতিদিন পঞ্চপ্রদীপে আরতি হয়,

কেশবচন্দ্রও তেমনি ব্রাহ্মমন্দিরের পূজাক্ষেত্রে বিবেক, বৈরাগ্য, বিশ্বাস, প্রেম ও পুণ্য—এই পঞ্চ উপকরণ দ্বারা পরম ব্রহ্মের আরতির ব্যবস্থা করতেন। ঈশ্বরকে আরতি করবার এই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ উপকরণ।

তাঁর সর্বশেষ বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ইউরোপের নিকট এশিয়ার সংবাদ'। শারীরিক অসুস্থতা নিয়েও কলকাতা টাউন হলে তিনি এই বক্তৃতা দেন। তাঁর 'নবসংহিতা' রচনাও এই সময়েই শুরু হয়। নিয়মিত 'নব-সংহিতা' লিখে তবে তিনি প্রার্থনায় বসতেন। কিন্তু স্বাস্থ্যোদ্ধার আর হলো না ; ১৮৮৪ সালের ৮ই জানুয়ারী তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রাজা রামমোহন থেকে এদেশের যে রেনেসাঁ আন্দোলন শুরু হয়, বহুলাংশে তার পুষ্টি সাধিত হয় কেশবচন্দ্রের দ্বারা। তাঁর একক সাধনায় এসে ধরা দেয়নি—এমন কোনো বিষয় ছিল না, আর এমন কোনো দিক ছিল না—যেদিক কেশবচন্দ্রের দৃষ্টির বাইরে ছিল। এদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ধর্ম, দর্শন, সাধন, পূজন, সাহিত্য, সংবাদপত্র পরিচালনা, সমাজ-কর্ম, সংস্কারবিধান ও সংগঠনশীলতা—এমন দিক নেই যেখানে নিজেকে তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে দান না করে গেছেন। তাঁর উদ্যোগেই প্রতিটি বিষয় জীবন্ত রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে, প্রভাবিত করেছে দেশ ও জাতিকে। তাঁর 'নববিধানে' ছিল না—এমন বিষয় নেই। সেযুগে যা কিছু প্রগতিধর্মী, তারই পরিপোষক ছিলেন কেশবচন্দ্র। তাঁর মধ্যে নবজন্ম লাভ ক'রে বাংলাদেশ সেদিন নতুন প্রাণশক্তি নিয়ে জেগে উঠেছিল, আলো দেখিয়েছিল সারা ভারতবর্ষকে।

॥ অশ্বিনীকুমার দত্ত : জীবন ও সঙ্গীত ॥

সারা ভারতে তখন এক নব যুগের অভ্যুদয়ের সূচনা। বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপন, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিধবাবিবাহ আইন পাশ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা, সিপাহী বিদ্রোহের সাজসজ্জা, নীলকর হাঙ্গামা, দেশীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব ও কবি মধুসূদনের আবির্ভাব প্রভৃতিতে সেদিনের বাংলার ইতিহাস উজ্জ্বল হ'য়ে আছে।

১৮৫৬ সালের কথা। বাংলার সমাজ-জীবনে সে এক মাহেন্দ্রক্ষণ। এই ছাপান্ন সালেই ২৫শে জানুয়ারী বরিশালে অশ্বিনীকুমারের জন্ম হয়। পিতা ব্রজমোহন দত্ত তখন পটুয়াখালীতে একাই মুন্সেফ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টারের কার্য নির্বাহ করতেন। সরকারী কাজে তাঁকে অনবরত এক স্থান থেকে অন্যস্থানে বদলি হতে হতো। ফলে বাটাজোড়ে তাঁর নিজের বাড়িতে থাকা বড়বেশী হয়ে উঠতো না। অশ্বিনীকুমারের জীবনেও তাই ঘটলো। পটুয়াখালীতেই তাঁর প্রথম পাঠ শুরু হলো। পরে বাটাজোড়ে এসে গ্রাম্য গুরুমশাইয়ের পাঠশালায় তিনি ভর্তি হন। এ বয়স থেকেই তাঁর মধ্যে ভাগবত নিষ্ঠা প্রকাশ পায়। পরে সাত বছর বয়সে তিনি ব্রজমোহনের নব কর্মস্থল বনবিষ্ণুপুরে রওনা হন, পথে কালীঘাটে কালীমূর্তি দর্শন ক'রে তাঁর শিশু-চিত্তে ভাগবত-নিষ্ঠা আরও প্রবল হয়। ভবিষ্যৎ জীবনে এই ত্রিকালজ্ঞা মহাশক্তি সম্বন্ধে তিনি অজস্র সঙ্গীত রচনা করেন।

বনবিষ্ণুপুরে এসে তাঁর প্রথম ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। কিন্তু দীর্ঘদিন তিনি শিক্ষালাভ করতে পারেননি, পিতার সঙ্গে অনবরত তাঁকে নানা অঞ্চলে ঘুরতে হয়েছে। এইভাবেই মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে রংপুর স্কুল থেকে অশ্বিনীকুমার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৮৩ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হ'য়ে তিনি এফ-এ পাঠ শুরু করেন। ব্রহ্মানন্দ কেশব-চন্দ্র সেনের প্রভাবে তখন বাংলায় এক নব-জীবনের সূচনা হয়েছে। দেশের অধিকাংশ যুবক তাঁর কর্মধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। অশ্বিনীকুমারও দূরে থাকতে পারলেন না; সাধক মন তাঁর। প্রায়ই তিনি কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মমন্দিরে

গিয়ে উপাসনা-আলোচনায় যোগ দিতে লাগলেন। একদিকে ছাত্রজীবনের পাঠ্যতালিকা, অন্যদিকে পরমব্রহ্মের লীলাকীর্তন, আনন্দের সঙ্গেই নিজের মধ্যে তিনি এই দুইটিকে এক ক'রে এক মধুর রসে রসসিক্ত হ'য়ে উঠলেন। এইভাবেই ক্রমান্বয়ে তিনি এফ-এ, বি-এ এবং এম-এ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু এম-এ পাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর পাঠ্যজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেনি। আজীবন তিনি ছাত্র ছিলেন। অধিক বয়সে রোগক্লিষ্ট কাতর দেহেও শয্যাশায়ী অবস্থায় তাঁকে নিবিষ্টচিত্তে পালিভাষায় মূল বৌদ্ধগ্রন্থ অধ্যয়ন করতে দেখা গেছে। পড়াশোনার ব্যাপারে তাঁর জীবনে যৌবন কিম্বা বার্ধ্যক্যের কোনো তারতম্য ছিল না। বই ছিল তার সংসারে সব চাইতে শ্রেষ্ঠ আত্মীয়, শ্রেষ্ঠ সুহৃদ। দেশী বিদেশী মোট চৌদ্দটি ভাষায় তাঁর সমান ব্যুৎপত্তি ছিল। সেই ভাষাগুলি হলো—বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, উর্দু, আরবি, পার্শি, পালি, মারাঠী, হিন্দী, গুরুমুখী, তেলুগু, উড়িয়া, ফরাসী এবং ল্যাটিন। সর্ব মানবের সকল চিন্তার মধ্যে যে একটি অতিমানবিক প্রাণধারা প্রতিনিয়ত কাজ ক'রে চলেছে, এর মূল সূত্র খুঁজে বার করতেই বিশেষভাবে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন।

বাল্যপাঠে অশ্বিনীকুমার যে একদিন পড়েছিলেন—'সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিও না', তা তিনি সমস্ত জীবন দিয়ে পালন ক'রে গেছেন। এক সময় তিনি আইন ব্যবসায়ের দ্বারা স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের পথ অবলম্বন করেন, কিন্তু যখন দেখলেন—মিথ্যা আশ্রয় ভিন্ন এপথে উন্নতি নেই, সেই মুহূর্তেই অবলীলাক্রমে তিনি সেই আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করেন। সত্যের প্রতি এই একাগ্রতাই অশ্বিনীকুমারকে বরেণ্য ক'রে তুলেছিল। মাঝে মাঝে তাঁর বৈরাগ্য উপস্থিত হতো। এমনি এক মানসিকতায় ১২৮১ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে একদিন তিনি সামান্য মাত্র চারটি পয়সা সম্বল নিয়ে অজ্ঞাত ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন, ক্রমে মন যখন প্রশান্ত হয়, তখন পিতার কর্মস্থল যশোহরে ফিরে এসে স্থানীয় যুবকদের নিয়ে এক ধর্মসভা স্থাপন করেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যে কোনো বয়সের লোকই এই সভায় এসে যোগদান করতো। সর্বধর্মসমন্বয়ে দেখতে দেখতে এক বিরাট পীঠস্থান গড়ে উঠলো। এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পিতা ব্রজমোহন দত্ত।

এর ঠিক দু'বছর পরেই অশ্বিনীকুমার বরিশালের প্রসিদ্ধ কুলীন কায়স্থ নথুল্লাবাজের শ্রীমতী সরলাবালার সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। সরলাবালার বয়স তখন মাত্র ন'বছর। কিন্তু এই বিবাহ পর্যন্তই। অল্পদিনের মধ্যেই সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে অশ্বিনীকুমার নীলাচলে গিয়ে পৌঁছান। এ সময়ে বাইবেলের অন্তর্নিহিত বিশেষত্ব ও দেহাত্ম সম্বন্ধীয় রচনাবলী তাঁর মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সরলাবালাও চিরকাল নির্বিবাদে স্বামীধর্ম পালন ক'রে বিশ্বজননীত্ব লাভ করেন। দেশ বিদেশে তিনি সকলের কাছে 'বড়-মা' নামে পরিচিতা ছিলেন।

বরিশালে ফিরে এসে অশ্বিনীকুমার সম্পূর্ণভাবে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। নানাবিধ সঙ্গীত রচনা ক'রে নিজের কণ্ঠে গাইতে গাইতে তিনি দিনের পর দিন জ্ঞান, ভক্তি, সেবা ও ভাগবতধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। তাঁর এই সঙ্গীত বরিশালের পথে পথে দলে দলে মাদল সহযোগে গীত হতে লাগলো। অপূর্ব এক ভাববন্যায় বরিশাল প্লাবিত হয়ে গেল। পথে পথে ঘুরে অশ্বিনীকুমার গানের শেষে দোকানী, মাঝি এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়কে সম্বোধন ক'রে বক্তৃতা করতেন। চক্রাকারে দলে দলে লোক জমে যেতো। দোকানীদের সম্বোধন ক'রে তিনি বলতেন : 'ও ভাই দোকানী, ঐ যে পাল্লা একটু কাৎ ক'রে খদ্দেরকে আধ তোলা জিনিস কম দেবার চেষ্টা করছো, ঐ যে অখাদ্য কুখাদ্য ভেজাল মিশিয়ে ভাবছো—খুব লাভবান হচ্ছো, ও তো লাভ নয়, খদ্দের ওতে ঠকচে না। মনে রেখো, উপরে একজন বটখারা ধরে তোমার ভালোমন্দ কাজের ওজন ক'রে রাখছেন, ভুলো না—শেষ-নিকাশের দিনে ঐ আধ তোলার জবাবদিহি করতে হবে, নিরুপায় হয়ে তখন তুমি শুধু হায় হায় ক'রে ললাটে করাঘাত করবে, ছটফট করবে অনুশোচনায়। অতএব হুঁসিয়ার ভাই দোকানী।'

সত্য, প্রেম ও পবিত্রতার বাণীবাহক অশ্বিনীকুমার এইভাবে মানুষকে চেষ্টা করেন দুর্মতি থেকে, পশুত্ব থেকে, অন্যায় থেকে পূর্ণ মনুষ্যত্বের দিকে ফেরাতে।

১৮৮৪ সালের ২৭শে জুন তিনি পিতার নামে ব্রজমোহন বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এর ঠিক চার বছর সাত মাস বাদে ১৮৮৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী ব্রজমোহন দত্ত ইহলোক পরিত্যাগ ক'রে যান, কিন্তু বিদ্যালয়ের প্রতি রেখে যান তাঁর শুভ আশীর্বাদ। বিদ্যালয়ের আদর্শ ছিল সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা।

বিদ্যালয়ের পতাকায়, প্রবেশপথে সর্বত্র কবিতায় চিত্রিত হয়ে থাকতো এই সত্য, প্রেম ও পবিত্রতার মহান মন্ত্র। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে সম্বন্ধ ছিল বন্ধুত্বের। অশ্বিনীকুমার বালকসুলভ হৃদয় নিয়ে হাসতেন, খেলতেন, গল্প করতেন ছাত্রদের সঙ্গে। এমনিভাবে তিনি নিজের আদর্শ মতো গড়ে তুলতেন ছাত্রসমাজকে। ছাত্রদের শিক্ষা, চরিত্রগঠন, অধ্যয়ন, শরীরচর্চা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি সম্পর্কে তিনি একটি কুড়ি দফা অনুচ্ছেদের অনুশাসন প্রস্তুত করেন। তার প্রারম্ভিক আবেদনটি এইরূপ : "এই বিদ্যালয় তোমাকে শারীরিক মানসিক ও নৈতিক সুশিক্ষা প্রদান করিবে। আমরা বিদ্যালয় ও গৃহে উভয় স্থলেই তোমার ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করিব। তোমার প্রতি আমাদের তত্ত্বাবধান বিদ্যালয় ছুটি হইবার সঙ্গেই শেষ হইবে না, তুমি বিদ্যালয়ে অলস হইলে যেরূপ দণ্ড পাইবে, বাড়িতে দুর্ব্যবহার করিলেও তেমনি শাস্তি পাইবে।"

অদ্ভুত শিক্ষাপ্রণালী ছিল অশ্বিনীকুমারের। তাঁর জীবনের অন্য সব বিষয় বাদ দিলেও একমাত্র শিক্ষাগুরু হিসেবেই তাঁর আসন ছিল সকলের ঊর্ধ্বে। এই শিক্ষার প্রসারক্ষেত্রে ক্রমঅগ্রগতির পথে রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ব্যয় করেন। সর্বশোষণকারী বিদেশী পণ্য ও রাজনৈতিক পরাধীনতাই যে এদেশের মাথা তুলে দাঁড়াবার অধিকারটুকুও কেড়ে নিয়েছে, প্রতিমুহূর্তে এই চিন্তা তাঁকে পীড়া দিতে লাগলো। এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের বহুপূর্বেই বরিশালের পথে পথে দাঁড়িয়ে অশ্বিনীকুমার জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়ভাব প্রতিষ্ঠা করতে যত্নবান হ'য়েছিলেন। এদিক থেকে তিনি ভারতের সমস্ত রাষ্ট্রনেতার নেতা, রাষ্ট্রগুরুর গুরু। বাংলা ১২৯১ সালে তাঁর 'ভারতগীতি' মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের সহজ প্রাঞ্জল সঙ্গীত দ্বারা তিনি জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলেন জনগণকে। এ কাজে তিনি ব্রজমোহন বিদ্যালয়কে প্রচারকেন্দ্রে পরিণত করেন। অতঃপর বি. এম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে তাও এই স্বদেশী কার্যেই উৎসর্গিত হয়।

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বড়লাট লর্ড কার্জনের আদেশে সর্বপ্রথম বঙ্গদেশ দ্বিধাবিভক্ত হ'লে সমস্ত বাঙালী এই আদেশের বিরুদ্ধে আন্দোলনে জেগে ওঠে। তার অন্যতম মন্ত্রগুরু অশ্বিনীকুমার। ছাত্র-শিক্ষক-অধ্যক্ষ-অধ্যাপক প্রত্যেককে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি এই আন্দোলনে; এবং তার

ফলস্বরূপ বৃটিশরাজশক্তি কর্তৃক বিনাবিচারে নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হন। ভগ্নস্বাস্থ্যে যখন তিনি নির্বাসন থেকে মুক্তিলাভ করেন, তখন নাগপুর কংগ্রেসের পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে বাংলার প্রায় পঞ্চাশ সহস্রাধিক ছাত্র বিদ্যালয় ছেড়ে পথে বেড়িয়ে পড়েছে। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকেরাও পিছিয়ে ছিল না। দেশে ফিরে অশ্বিনীকুমার প্রাদেশিক সম্মেলনীর সভাপতি নির্বাচিত হন। বাংলা ১৩২৭ সালের ১১ই চৈত্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনীর অধিবেশন আরম্ভ হয়। ৩০শে চৈত্র ব্রজমোহন বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক পরিত্যাগ ক'রে জাতীয় বিদ্যালয় ব'লে ঘোষিত হয়।

বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র বরিশালের এই জননায়কত্বই স্বদেশে ও বাইরে অশ্বিনী-কুমারকে মহর্ষি নেতারূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। বাংলা ১৩২৮ সালের ১৭ই ভাদ্র মহাত্মা গান্ধী সর্বপ্রথম বরিশালে আসেন, সঙ্গে ছিলেন মৌলানা মহম্মদ আলী। এখানে তাঁরা অশ্বিনীকুমারের আতিথ্য গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে অশ্বিনী-কুমারের মৃত্যুর পর তাঁর সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী বলেন: 'অশ্বিনীবাবুর গৃহ ছিল তাঁর চিন্তার প্রতিভূস্থল, এ গৃহের অভিজ্ঞতা আমার কাছে এক বিরাট আনন্দের বিষয়। বরিশালে তাঁর অতুল সৃজনশীলতা ও অদম্য শক্তি আমাকে বিশেষভাবে অভিভূত করে। তাঁকে দেখা শুধু আনন্দই নয়, তিনি যে আর পৃথিবীতে নেই, তা চিন্তাই করতে পারি না।'

অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে ১৯০৫ সালে 'বরিশাল স্বদেশ বান্ধব' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল— বিলাতি বর্জন, স্বদেশী গ্রহণ এবং বঙ্গব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন। অশ্বিনীকুমার শিক্ষক ও ছাত্রফৌজ গঠন ক'রে আন্দোলনকে সক্রিয় ক'রে তুললেন। কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে উপস্থিত থেকে শুধু কংগ্রেসের কর্মনীতিই তিনি গ্রহণ করেননি, যথেষ্ট চিন্তাশীলতার সঙ্গে সে-নীতি তিনি প্রয়োজনমতো ব্যক্তিগত দিক হতে প্রয়োগও করেছেন। বাংলায় নীলকুঠীর অত্যাচার দমনে তাঁর সক্রিয় শক্তির ব্যবহার বাংলাদেশ কখনও ভুলতে পারে না। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান পদেও তাঁর কর্মদক্ষতা ছিল অনন্যসাধারণ।

কর্মী, বাগ্মী ও শিক্ষক হিসেবে তিনি সারাজীবন দেশের সেবায় কাজ করেছেন, তার পিছনে সবচাইতে বড় ছিল তাঁর দরদী কবি-মন। তাঁর

কাব্য বিলাসের সামগ্রী ছিল না। ১৯০৯ সালে লক্ষ্ণৌ কারাগারে ব'সে তিনি যে সমস্ত সঙ্গীত রচনা করেন, তার অধিকাংশই ছিল দেশোদ্ধারমূলক, বাকী-গুলো ছিল ভক্তিসঙ্গীত। বিশ্ববিধাতাকে রূপায়িত করেছিলেন তিনি বাংলার চিরশ্যামল মাতৃরূপের মধ্যে। তাঁর 'ভক্তিযোগ' 'কর্মযোগ' 'দুর্গোৎসব-তত্ত্ব'র মধ্যে শুধু আধ্যাত্মিকতারই চরম প্রকাশ দেখতে পাই না, সেই আধ্যাত্মিকতাকে বেষ্টন ক'রে আছে মানব-কল্যাণ ও স্বাদেশিকতা।

দেশের কাজে আত্মবল দিয়ে একসময় সেই আধ্যাত্মিক সেবার পথেই নিঃস্ব অশ্বিনীকুমার যাত্রা করলেন। ইতিপূর্বেই শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে তিনি ব্রাহ্মমতে দীক্ষা নিয়েছিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের সান্নিধ্য লাভ ক'রে ঋষি রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে দীর্ঘকাল আধ্যাত্মিক সাধনায় কাটিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে আলমোড়ায় স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং সেই পরিচয় একসময় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। তাঁর চিন্তার সঙ্গে স্বামীজীর চিন্তার মিল ছিল একান্ত নিকটের। স্বামীজী বললেন: 'সকল সংস্কার ধর্মের ভিতর দিয়েই করতে হবে, নইলে জনসাধারণ তা গ্রহণ করবে না। কংগ্রেস জনসাধারণের জন্যে কিছু করলে তাতে আমার সহানুভূতি আছে। যে ধর্ম হৃদয়ে বল দেয় না, সে ধর্ম আমি জানি না। ছাত্রদের চরিত্র বজ্রের মতো গড়ে তুলুন। দেশে বীর্য সঞ্চার করুন। আর চামার, মেথর, মুদ্দফরাসকে বলুন—তোরাই জাতির প্রাণ। ওদের সবাইকে পৈতা দিয়ে দিন।'

এর কোনোটাই অশ্বিনীকুমারের জীবনে বাকী ছিল না। স্বামীজীর বাণী তাই তাঁকে গভীরভাবে অভিভূত করেছিল।

শেষজীবনে বার্ধক্যজনিত ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তাঁকে অধিকাংশ সময়ই শয্যাশায়ী থাকতে হতো। ১৯২২ সালের আগস্ট মাসে আরোগ্যলাভের জন্য তিনি কলকাতায় ডাঃ নীলরতন সরকারের চিকিৎসাধীনে আসেন। এখানে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, বিঠলভাই প্যাটেল, হাকিম আজমল খাঁ প্রমুখ সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ তাঁকে নিয়মিত দেখতে আসতেন। মাঝে মাঝে তাঁর সংজ্ঞা লুপ্ত হয়ে স্মৃতিবিভ্রম ঘটতে লাগলো। এইভাবেই একটি বছর কেটে গেল।

সেদিন তাঁর নিরাময় প্রার্থনা ক'রে সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে কলকাতা

টাউন হলে এক সভায় অধিবেশন বসলো। ১৯২৩ সালের ৭ই নভেম্বর। ২টা ৫৫ মিনিটে এসে ঘড়ির কাঁটা হঠাৎ যেন একবার স্থির হয়ে দাঁড়ালো। প্রার্থনায় সরোজিনী নাইডুর ভাববিহ্বল কণ্ঠ সহসা মুহূর্তের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেল। সংবাদ এলো—অশ্বিনীকুমার দেহত্যাগ করেছেন।—সভা ভেঙে গেল। শোকবিহ্বলচিত্তে ধীরে ধীরে সকলে অগ্রসর হলো কেওড়াতলা শ্মশানঘাটের দিকে। অশ্বিনীকুমারের নশ্বর দেহকে আঁকড়ে ধরে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। অস্ফুট কণ্ঠে একবার তিনি উচ্চারণ করলেন : 'রাজনীতিক্ষেত্রে সেবা ও মানবতা প্রচার করে গেছেন স্বামী বিবেকানন্দ, আর তা সমস্ত জীবন দিয়ে কাজে পরিণত করে গেলেন অশ্বিনীকুমার। আজ আমরা আমাদের গুরু আমাদের বন্ধুকে হারালাম—যাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ কেটেছে আধ্যাত্মিকতার আলোকে জাতীয়তা সৃষ্টির জন্য স্বদেশ-সেবায়। আমাদের মধ্যে রেখে গেলেন তিনি তাঁর সেই সেবাধর্ম। এই সেবার মধ্য দিয়ে আমরা যেন জীবনে পূর্ণ হতে পারি, সার্থক হতে পারি।'

॥ দুই ॥

১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের আপামর জনসাধারণের সামনে কংগ্রেস যে আবেদন নিয়ে এসে দাঁড়ায়, সেই আবেদনের মূলগত সুরটি দীর্ঘকাল আগে থেকেই তৎকালীন চিন্তানায়কদের হৃদয়তন্ত্রীতে অনুরণিত হচ্ছিল। ১৮৮৫ সালে জাতীয় মহাসমিতি গঠিত হয়ে প্রকাশ্যভাবে সর্বপ্রথম তার অভিব্যক্তি ঘটে। কিন্তু জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠার বহু বছর আগে থেকেই অশ্বিনীকুমার নানা সঙ্গীত ও বাণী প্রচার ক'রে একদিকে যেমন অশিক্ষিত জনসাধারণকে জ্ঞানের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেও সমাজ ও রাষ্ট্রীয় চেতনায় উদ্দীপিত ক'রে তুলেছিলেন। তাঁর 'ভারতগীতি' যখন রচিত, গীত ও প্রচারিত হয়, তখনও বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' জনচিত্তে তেমনভাবে সাড়া জাগায়নি। তা না জাগালেও জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠার দীর্ঘকাল আগে থেকেই বাঙালী চিন্তানায়ক ও কবিরা তাঁদের মননশীল চিন্তাধারা ও কাব্যের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদ তথা সামাজিক কর্মনিষ্ঠাকে সম্প্রসারিত ক'রে

তুলেছিলেন। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, মনোমোহন বসু, গোবিন্দ রায় আর অশ্বিনীকুমারের মধ্যে কোনো তারতম্যই নেই। স্বামী বিবেকানন্দের বাণীও সেখানে একই তন্ত্রীতে অনুরণিত হয়ে উঠেছিল। গোবিন্দ রায়ের—

কতকাল পরে বল ভারত রে,
দুঃখসাগর সাঁতারি পার হবে।

... ...

পরদীপশিখা নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।'

প্রভৃতি সঙ্গীত সেই দেশাত্মবোধ বা জাতীয়বাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। অশ্বিনীকুমারের 'ভারতগীতি'র আবেদন কিন্তু আরও গভীর জনসাধারণের একেবারে মর্মে গিয়ে তা আঘাত করেছিল। তাঁর সঙ্গীতের ভাষা যেমন সহজ ও সর্বজনবোধ্য, তেমনি আবেদনের দিকে থেকেও অত্যন্ত প্রাণধর্মী। নিরক্ষর চাষী থেকে শুরু ক'রে শিক্ষিত ব্যক্তি পর্যন্ত সকলেই তাঁর সেই সহজ প্রাণধর্মকে উপলব্ধি ক'রে এক নবীন জীবনচেতনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। 'ভারতগীতি'র একটি সঙ্গীতে অশ্বিনীকুমার বলেছেন—

'আয় আয় সবে ভাই, যাই দ্বারে দ্বারে,
ভারতের ভাগ্য দেখি ফিরে কিনা ফিরে।
সোনার এই রাজ্য ছিল, ক্রমে ক্রমে সকল গেল,
এমন যে ভারতবর্ষ, গেল ছারেখারে।
অন্নপূর্ণা রাজ্যে হা রে, 'হা অন্ন হা অন্ন' করে,
লক্ষ্মীর ঘরে এমন কষ্ট, কে স হতে পারে ?
ছিল ধনধান্যে ভরা, হ'ল এমন কপাল পোড়া,
অন্নাভাবে হা হতোস্মি, প্রতি ঘরে ঘরে।
এই দেশেতে তুলা হয়, সেই তুলা বিলাতে যায়
এই তুলাতে কাপড় তথায় বোনে ম্যাঞ্চেস্টারে,
ম্যাঞ্চেস্টার হতে এসে ঘরের টাকা নেয় রে শুষে,
এদিকেতে দেশের তাঁতি অনাহারে মরে।

এই কি দেশের ভালোবাসা, তাঁতিভাইদের এই দশা,
তাদের এই দুঃখ তোরা দেখিস কেমন করে ?
আয় রে চেষ্টা করি সবে দেশী কাপড় বিক্রী হবে,
সাজ্‌বো দেশী তাঁতি সবে, ধনরত্নহারে।
ইংরেজশিল্পী দেখ গিয়ে বাঙালীর টাকা নিয়ে
তেতালা চৌতালায় কেমন সুখে বিরাজ করে,
(আর) বাঙালী শিল্পী যারা, অনাহারে মরে তারা,
দেখে তাদের এ দুর্দশা, প্রাণ যে কেমন করে !
একসমান জিনিসও হলে, যেটারে বিলাতি বলে,
দেশী জিনিস ছেড়ে তাই নেয় কুলাঙ্গারে ;
কেন কুলাঙ্গার হবো ? দেশের মোরা ধন বাড়াবো,
সুখে রাখিব যত দেশী দোকানদারে।
আয় সবে দ্বারে দ্বারে, ভাই সকলের পায়ে প'ড়ে
(যাতে) দেশী লোকের টাকা হয়, বলি গে সবারে ,
বিলাতী ফাঁকিতে ভুলে আর যেন না টাকা ফেলে,
যতন যেন করে যাতে দেশের টাকা বাড়ে ॥'

এ যেন ঠিক আজকের যুগেরই কথা। গানখানির অন্তর্নিহিত ভাবটি তাই ব্যাখ্যা ক'রে বোঝোবার অপেক্ষা রাখে না। স্বদেশী আন্দোলনের প্রায় পঁচিশ বছর আগে বরিশালের পথে পথে এই গান গেয়ে অশ্বিনীকুমার স্বদেশানুরাগ ও জাতীয়তাবাদের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন। ব্রজমোহন বিদ্যালয় ছিল তার প্রধান প্রচারকেন্দ্র। সমগ্র ভারত যখন ইংরেজের রক্তচক্ষুর কাছে ভীত সন্ত্রস্ত, অশ্বিনীকুমারের পরিচালনায় বরিশালে তখন দেশী জিনিসের আদর ও তজ্জন্য স্বদেশী ভাণ্ডার স্থাপনার কাজ সুসম্পাদিত হয়ে গিয়েছিল। আপন কাজের ক্ষেত্রে কখনও পরাজয় স্বীকার করেননি অশ্বিনীকুমার। স্বদেশী যুগে তাঁর প্রধান শিষ্য চারণকবি মুকুন্দ দাসের কণ্ঠও বজ্রনির্ঘোষে উচ্চকিত হ'য়ে উঠেছিল। দেশবাসীকে আহ্বান ক'রে তিনি গাইলেন— 'বান ডেকেছে মরা গাঙে

খুলতে হবে নাও ;
তোমরা এখনও ঘুমাও ?'...

এতদ্ভিন্ন অশ্বিনীকুমারের বহু গানই আমরা মুকুন্দ দাসের কণ্ঠে গীত হতে শুনেছি।

লক্ষ্য করবার মতো একটা মস্তবড় বিষয় হচ্ছে এই যে, এ সময় থেকে অশ্বিনীকুমারের মধ্যে একটা অপূর্ব সাম্যবাদী মতবাদ গড়ে ওঠে। সকলকে মিলিয়েই তবে দেশের মুক্তিস্বপ্ন সার্থক, সমষ্টিকে বাদ দিয়ে ব্যষ্টির যে সুখ—তা অর্থহীন। ১৯০৯ সালের ১৭ই মার্চ লক্ষ্ণৌ জেলে ব'সে অশ্বিনীকুমার গান রচনা করলেন—

'মিষ্টিমধুর খাবার তোমার একলা খাবার নয়,
আশেপাশে সবাইকে তা বেটে দিতে হয়।
বেদ বলেছে একলা কেহ
খেলে ভরে পাপে দেহ,
ভালো নাই তার কভু ইহ, পরলোকেও ক্ষয়।
প্রহ্লাদ তাই বল্‌লে দেখ,
একা মুক্তি নেবে নাকো,
কাঙাল ভুকো তাদের ডাকো, নিবি মিলি একসময়।'

এইভাবেই তিনি চিন্তা করতে শিখেছিলেন; এবং এই সমষ্টিগত জাতীয় জীবনকে কেন্দ্র ক'রে যে এক অখণ্ড ব্রহ্মসত্তা বিরাজ করছে, এই অনুভূতির বশেই তিনি আত্মগত সাধনায় বিভোর হয়ে যেতেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, ঋষি রাজনারায়ণ বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির সংস্পর্শলাভের ফলেই যে ধীরে ধীরে অশ্বিনীকুমারের মধ্যে ভূমার সাধনা জাগ্রত হয়ে ওঠে, ত' অস্বীকার করা যায় না। কালের পরিবর্তন যেমন বিশ্বনিয়মের এক অবধারিত ফল, মানবপ্রকৃতির পরিবর্তনও তেমনি সৃষ্টিরহস্যের এক অতিগ্রাহ্য বস্তু। অশ্বিনীকুমারের যে জীবন শুরু হয়েছিল দেশাত্মবাদ ও শিক্ষানীতিকে ভিত্তি ক'রে, সে-জীবন ক্রমে তদ্‌ভূমার অনন্ত রহস্যের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় খুঁজে পেতে চাইল। ১৮৮৬ সালে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে দীক্ষা নিয়ে ভারতের সর্বত্র ভ্রমন ক'রে তিনি যতবেশী মানুষের সংস্পর্শ লাভ করেছেন, ততই তাঁর মন মানুষ থেকে অতিমানুষের দিকে ধাবিত হয়েছে। তাই ব'লে মানুষকে তিনি কোথাও বর্জন করেননি, বরং মানুষের জন্যই তিনি আজীবন কাজ ক'রে গেছেন এবং মানুষকে তিনি নরনারায়ণরূপেই সেবা

করেছেন। এই নরনারায়ণ থেকেই তাঁর সেই অন্তিমামুষ বা পরমপুরুষে উত্তরণ। কারাগারের নিভৃত জীবনে সেই সাধনা তাঁর ক্রমেই একাগ্র হ'য়ে উঠেছে। লক্ষ্ণৌ জেলে থাকতেই ১৯০৯ সালের ২৯শে ডিসেম্বর তিনি তন্ময় সাধনায় সুর রচনা ক'রে লেখেন—

'তুমি মধু, তুমি মধু, তুমি মধু।
মধুর নিঝর, মধুর সায়র, আমার পরাণ বঁধু।
(আমার সকল তুমি বঁধু হে)
(আমি যা কিছু চাই এ সংসারে)
(আমার সাধন ভজন তুমি)
(আমার তন্ত্র তুমি মন্ত্র তুমি)
(ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, বঁধু হে আমার সকল তুমি)।
মধুর মুরতি, মধুর কীরতি, মধুর মধুর ভাষ;
মধুর চলনি, মধুর দোলনী, মধুর মধুর হাস।
মধুর চাহনি, মধুর সাজনী, মধুর রূপের লেখা;
মধুর মধুর মধুর মধুর মাহেন্দ্র ক্ষণের দেখা।
(সে কি ভুলতে পারি)
(সে ক্ষণের কথা কি ভুলতে পারি)
মধুর রূপের মধুর কাহিনী মধুর কণ্ঠে গায়।
শুনিতে শুনিতে গলিতে গলিতে প্রাণ মধু হয়ে যায়।
(তখন) অনলে অনিলে জলে, মধুপ্রবাহিনী চলে,
মেদিনী হয় মধুময়।
(সব মধুময় হয়ে যায়)
(ঐ রূপে নয়ন দিলে বিশ্ব মধুময় হয়ে যায়)
(তখন) প্রকৃতি মোহিনী সাজে, হৃদয়ে মৃদঙ্গ বাজে,
মধুর মধুর ধ্বনি হয়।
(তখন) যে রূপ ভাতে যেখানে, যে কথা পশে গো কানে,
স্তুতি নিন্দা সকলি মধুর;
(তখন গালিও যে মিঠা লাগে)
(তখন বজ্রনাদ কুহুধ্বনি, গুরু সোম রাহু শনি
মধুরসে সকলি ভরপুর।'

অতিমানুষ বা পরমপুরুষকে বন্ধুরূপে কল্পনা ক'রে সখ্যভাবেই সাধনা করেছেন অশ্বিনীকুমার। যিনি ভূর্ভুবঃ সঃ, যিনি রুদ্র, যিনি ক্ষমা, যিনি বিশ্বচরাচরকে আপন মহিমায় ধারণ ক'রে আছেন, যাঁর উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি',
ঘাটে ঘাটে ঘুরবো না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরি।'…

সেই অরূপরতন প্রাণবল্লভের উদ্দেশে আত্মনিবেদন ক'রে অশ্বিনীকুমার গাইলেন—

'আমার সকল তুমি বঁধু হে,…
আমার সাধন ভজন তুমি,
আমার তন্ত্র তুমি মন্ত্র তুমি,
ধর্মঅর্থকামমোক্ষ,
বঁধুহে আমার সকল তুমি।'

সেই 'তুমি'র 'রূপে নয়ন দিলে বিশ্ব মধুময় হয়ে যায়।' তিনি যে বিশ্বরূপ, দীনদয়াময়, পরমব্রহ্ম তিনি। তাঁকে না জানলে, না ডাকলে পরিত্রাণ নেই। প্রাণ যে তাঁর মহিমময় রূপের ঢেউয়ে আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়, তিনিই শরণাগতি; রবি-শশি-গ্রহ-নক্ষত্র-তরু-লতা-আকাশ-মৃত্তিকা—এ সবই যে তাঁর প্রেমময় রচনা, তাঁরই নিত্য খেলার সাথী। জীবন-বল্লভ তিনি, বিশ্বজীবনের সঙ্গে তাঁর নিত্যলীলা। সেই নিত্যপুরুষের উদ্দেশেই ভক্তপ্রাণ অশ্বিনীকুমার প্রাণের নৈবেদ্য উৎসর্গ ক'রে গাইলেন—

'ওহে দীন দয়াময়, মানস বিহঙ্গ সদা চায়,
প্রাণ খুলে মনের সাধে ডাকি হে তোমায়।
ওহে তরুগণ শাখা 'পরে পাখিগণ গান করে,
কেমন মোহন গুণ গায় হে;
কি বা প্রভাত সমীরণ বহে মৃদু মন্দ ঘন,
ভগবৎ-প্রেম বিলায় হে।

ওহে মনের হরষে আজি, নব সাজে সবে সাজি,
প্রেমগুণগানে মাতায় হে ;
তব গুণ গাওত প্রাণমন নাচত,
পাগল ক'রল সবায় হে।
ওহে চিত্তবিনোদন, ভকত জীবন,
সদা বাঁধা রব তব পায় হে ,
যাচত প্রেমদাস, পুরাও হে মন-আশ,
তুমি মম জীবন-সহায় হে।'

গানখানি 'প্রভাতি ঠুংরি' সুরে রচিত। অনুরূপ আর একখানি গান—

'বিষয় বাসনা ভুলি প্রেমের নিশান তুলি,
গাই সবে জয় ব্রহ্মনাম।
ও সেই দেশে যাব, কি সুখে আর হেথা র'ব,
যেথায় নাহি জাতিকুলমান
(যেথায় নাহি মান অপমান) ;
প্রেমে পুলক হবে, সকল জালা দূরে যাবে,
(তাপিত প্রাণ শীতল হবে)।'

দু'খানি গানই ব্রহ্মসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। ইহজন্ম প্রবাসজীবনেরই নামান্তর মাত্র। জাত-কুলের বিচার নিয়ে মান-অপমানের পালা এখানে, এখানে জনে জনে পার্থক্য, মনে মনে বিরোধ। সমস্ত বিরোধের পারে একমাত্র সমন্বয়ের মধুর ক্ষেত্র হচ্ছে ব্রহ্মবিহার ; সৃষ্টির সেই আদি ও অকৃত্রিম প্রচ্ছন্ন ক্ষেত্র। এ সংসারের বিষয়বাসনা ভুলে একবার সেই প্রেমনিকেতনের প্রেম-বান্ধবের সান্নিধ্যলাভ করতে পারলে জরামৃত্যুর ঊর্ধ্বে এক পরম প্রশান্তিতে আত্মা আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। তখন 'সেই তুমি' আর 'এই আমি' একীভূত হয়ে একক হয়ে উঠবে। মানুষে মানুষে ঐক্যবন্ধনের মধ্য দিয়ে একদিন যিনি সাম্যের বাণী রচনা করেছিলেন, পরবর্তী জীবনে তিনিই পরমব্রহ্ম ও ব্যক্তি-মানসের ঐক্যের সঙ্গীত গেয়ে ইহলোক ত্যাগ করলেন।

অশ্বিনীকুমারের সঙ্গীতসাধনার এই অনুবর্তিত ধারা দুটি বিশেষ লক্ষ্য করবার মতো। মহাপুরুষমাত্রের জীবনেই সাধনার এই বিশেষ লক্ষণটি দেখা

যায়। তাঁদের বিপ্লব ও বিদ্রোহের অন্তরালে নির্বাণের যে আলোটি স্তিমিত রেখায় প্রজ্জ্বলিত হতে থাকে, বিপ্লবের অবসানে সেই আলোটিই ধীরে ধীরে একদিন উজ্জ্বল ভাস্করের মতো বহ্নিমান হয়ে ওঠে। সেই বহ্নিযজ্ঞ থেকে যে মন্ত্র উদ্‌গীত হয়, সেই মন্ত্রই হচ্ছে নির্বাণের মন্ত্র, শান্তির মন্ত্র। অশ্বিনীকুমারও তাঁর সারাজীবনের সাধনার মধ্য দিয়ে সেই শান্তি-সাম্যের সঙ্গীতই গেয়ে গিয়েছেন। উত্তরকালে মুকুন্দ দাসের মতো বহু সাধকের জীবনেই আমরা অশ্বিনীকুমারের প্রভাব লক্ষ্য করেছি। এই প্রভাব-কীর্তির মধ্য দিয়েই ভক্তপ্রাণ অশ্বিনীকুমার অমর হয়ে রইলেন।

॥ আচার্য জগদীশচন্দ্র : দ্রষ্টা ও স্রষ্টা ॥

জগদীশচন্দ্রের পদার্থবিদ্যার সাধনায় ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে যেমন শব্দ-তরঙ্গ, ইথর ও বৈদ্যুতিক বা আলোক-তরঙ্গের বিভিন্ন পর্যায়গুলি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো, তেমনি স্পষ্টভাবে ধরা পড়লো প্রাণী-বিজ্ঞানের রহস্য। তার ফলে একদিকে যেমন আমরা শব্দের অনুভূতি পেয়েছি এবং জেনেছি—ইথর-স্পন্দনেই আলোকের উৎপত্তি, দৃশ্য আলোক অদৃশ্য আলোক উভয়েই, তেমনি জেনেছি—নিখিল জীবলোকে উদ্ভিদ থেকে শুরু ক'রে মানুষ পর্যন্ত এক অখণ্ড প্রাণধারা সর্বত্রই প্রবহমান, জীবলোকের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে এ এক অদ্ভুত অচ্ছেদ্য ঐক্য। জগদীশচন্দ্র বললেন : 'যে বাধা এতদিন আত্মীয় হইতে আত্মীয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা দূর হইল। উদ্ভিদ ও প্রাণী একই জীবনধারার বহুমুখী বিকাশ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। এক মহাসত্যকে জানিতে পারিলে জগদ্ব্যাপারে পরম রহস্যের যবনিকা ঘুচিয়া যাইবে না, বরং গভীরতর নিবিড়তর হইয়া উঠিবে। মানুষ যে তাহার অসমাপ্ত জ্ঞান, অসম্পূর্ণ দৃষ্টি ও অক্ষম শক্তি লইয়াও অনির্ণীত-দিক্ মহাসমুদ্রে দুঃসাহসিক জয়যাত্রায় আপনার চিত্ত-তরণী ভাসাইয়া দিল, এ কি কম আশ্চর্যের কথা? সে অবর্ণনীয় রহস্য মুহূর্তকালের জন্য তাহার গোচরীভূত হইতে থাকে, এবং যে আত্মসর্বস্বতা এতকাল বিশ্বব্যাপী প্রাণস্পন্দনের প্রতি বিমুখচিত্ত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার মন হইতে মুহূর্তকালের মধ্যে নিঃশেষে মিলাইয়া যায়।'

উপনিষদ বলেন :

'এ যোঽগ্নিস্তপত্যেস সূর্য এষ পর্জন্যো মঘবানেষ বায়ুঃ।
এষ পৃথিবী রয়ির্দেবঃ সদসচ্চামৃতং চ যৎ ॥'

অর্থাৎ, 'এই প্রাণই অগ্নিরূপে প্রজ্জ্বলিত, সূর্যরূপে প্রকাশিত ; এই প্রাণই মেঘরূপে বর্ষণ করেন, ইন্দ্ররূপে দুষ্টের দমন ক'রে প্রজা পালন করেন ; এই প্রাণই বায়ুরূপে প্রবাহিত ; এই প্রাণই পৃথিবীরূপে সকলকে ধারণ করেন, চন্দ্রমারূপে সকলকে পোষণ করেন ; এই প্রাণই স্থূল সূক্ষ্ম সবকিছুর আধার। মৃত্যুর পারে যে অমৃত জীবন, তাহাও এই প্রাণ।'

উপনিষদ আরও বলেছেন : 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি

নিঃসৃতম্।' অর্থাৎ, 'জগতে এই যে প্রাণের ধারা বয়ে চলেছে, তা এক মহাপ্রাণ থেকে উৎসারিত হয়ে আবার প্রাণের মধ্যেই স্পন্দিত হচ্ছে।'

জগদীশচন্দ্রের চেতন ও অচেতন বা living ও non-living-এর অভি-ব্যক্তিতে এই কথারই আভাস পাওয়া যায়। ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসের এক সন্ধ্যায় Royal Institute এ তিনি 'The response of inorganic matter to mechanical and electrical stimulus' সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। প্রসঙ্গত: তিনি বলেন:

'I have shown you this evening the autographic records of the stress and strain in 60th the living and non-living. How similar are the two sets of writings, so similar indeed that you cannot tell them one from the other! They show you the waxing and waning pulsations of life—the climax due to stimulants, the gradual decline of fatigue, the rapid setting in of death-rigor from the toxic effect of poison.—It was when I came on this mute witness of life and saw an allpervading unity that finds togerher all things—the note that thrills on ripples of light, the teeming life on earth and the radiant suns—that shine on it—it was then that for the first time I understood the message proclaimed by ancestors on the banks of the Ganges thirty centuries ago.—They who behold the one, in all the changing manifoldness of the universe, unto them belongs eternal truth, unto none else, unto none else.'

এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে ১৩০৮ সালের আষাঢ় সংখ্যা নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে' রবীন্দ্রনাথ লেখেন: 'আচার্য জগদীশ জড় ও জীবের ঐক্যসেতু বিদ্যুতের আলোকে আবিষ্কার করিয়াছেন। আচার্যকে কোন কোন জীবতত্ত্ববিদ্ বলিয়াছিলেন, আপনি তো ধাতব পদার্থের কথা লইয়া এতদিন পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু যদি আস্ত একখণ্ড ধাতুপদার্থকে চিম্‌টি কাটিয়া তাহার মধ্য হইতে এমন কোন লক্ষণ বাহির করিতে পারেন, জীব-শরীরের চিম্‌টির সহিত

যাহার কোন সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তবে আমরা বুঝি! জগদীশবাবু ইহার উত্তর দিবার জন্য এক নূতন কল বাহির করিয়াছেন। জড়বস্তুকে চিমটি কাটিলে যে স্পন্দন উৎপন্ন হয়, এই কলের সাহায্যে তাহার 'পরিমাণ' শত লিখিত হইয়া থাকে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমাদের শরীরে চিমটির ফলে যে স্পন্দন-রেখা পাওয়া যায়, তাহার সহিত এই লেখার কোন প্রভেদ নাই। জীবনের স্পন্দন যেরূপ নাড়ী দ্বারা বোঝা যায়, সেইরূপ জড়েরও জীবনীশক্তির নাড়ী-স্পন্দন এই কলে লিখিত হয়। জড়ের উপর বিষ প্রয়োগ করিলে তাহার স্পন্দন কিরূপে বিলুপ্ত হইয়া আসে, এই কলের দ্বারা তাহা চিত্রিত হইয়াছে।'…

১৯০৩ সাল থেকে জগদীশচন্দ্রের সাধনার নবপর্যায় শুরু হয়। জীবের মধ্যে প্রাণীর ও উদ্ভিদের জীবনীক্রিয়া যে এক, বিবিধ পরীক্ষায় তা এই সময় থেকে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি ব্যাপৃত রইলেন। বিজ্ঞান-তত্ত্বকে কি ক'রে নিজের সমগ্র জীবনের তত্ত্বরূপে গ্রহণ ও প্রকাশ করা যায়, তারই চেষ্টা চলেছে তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। তাঁর কাছে এই বিজ্ঞান-তত্ত্ব আর কিছুই নয়, শুধু প্রাণতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব বা আনন্দতত্ত্বেরই নামান্তর মাত্র। প্রাণই ব্রহ্ম, প্রাণ থেকেই সমস্ত বস্তু উদ্ভূত হয়, প্রাণেই স্থিতি করে আবার প্রাণেই বিলুপ্ত হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলীভূত এই যে প্রাণ, এই প্রাণের স্পন্দনই জগদীশচন্দ্র অনুভব করেছিলেন সর্বত্র, বৃক্ষ-লতায়, এমন কি জড়বস্তুর মধ্যেও। তিনি বললেন : 'ভালোবাসিয়া দেখিলে অনেক গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আগে যখন একা মাঠে কিম্বা পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতাম, তখন সব খালি খালি লাগিত। তারপর গাছ, পাখী, কীটপতঙ্গদিগকে ভালোবাসিতে শিখিয়াছি। সে অবধি তাদের অনেক কথা বুঝিতে পারি, আগে যাহা পারিতাম না। এই যে গাছপালা কোন কথা বলে না, ইহাদের যে আবার একটা জীবন আছে, আমাদের মত আহার করে, দিন দিন বাড়ে, আগে এসব কিছুই জানিতাম না ; এখন বুঝিতে পারিতেছি।'

তিনি উল্লেখ করেছেন—'They who behold the One, in all the changing manifoldness of the universe, unto them belongs eternal truth,' তিনি নিজেই ছিলেন সেই অনন্ত এক ও তাঁকে বিশ্বাসজনিত সত্যের পূজারী। অপরাপর বিজ্ঞানীর ন্যায় তিনি নাস্তিক বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব

সম্বন্ধে উন্নাসিক ছিলেন না, বরং তাঁর সমগ্র জীবনসাধনা ও আবিষ্কারের মধ্যে ঈশ্বরকেই তিনি বড় ক'রে ভাবতেন। এই ভাবনাই ছিল তাঁর ধর্ম। এই জন্য তাঁর গবেষণাগারকে Institute বা Museum নামে আখ্যায়িত করেন নি, তার নাম দিয়েছিলেন 'মন্দির'। 'বসু বিজ্ঞানমন্দির' প্রতিষ্ঠার সময় তিনি বলেছিলেন: 'আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম, তাহা মন্দির, কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়েরও অতীত দুই একটি মহাসত্য আছে, তাহা লাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র বিশ্বাস আশ্রয় করিতে হয়। বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধেও পরীক্ষা আছে, তাহা দুই একটি ঘটনার দ্বারা হয় না, তাহার প্রকৃত পরীক্ষা করিতে সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার আবশ্যক। এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই মন্দির উত্থিত হইয়া থাকে।' এই মন্দির সত্যাশ্রয়ী মানুষ মাত্রেরই সাধন-মন্দির, জীবন-মন্দির। জগদীশচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথ তাই সুন্দরভাবে বলেছেন:

'—সতর্ক দেবতা যেথা গুপ্তবাণী রেখেছেন ঢাকি'
সেথা তুমি দীপ হস্তে অন্ধকারে পশিলে একাকী,
জাগ্রত করিলে তারে। দেবতা আপন পরাভবে
যেদিন প্রসন্ন হন, সেদিন উদার জয়রবে
ধ্বনিত অমরাবতী আনন্দে রচিয়া দেয় বেদী
বীর বিজয়ীর তরে, যশের পতাকা অভ্রভেদী
মর্ত্যের চূড়ায় উড়ে।'...

সব-চাইতে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে যে, জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক হয়েও বিজ্ঞানের মধ্যেই মাত্র নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তিনি বৈজ্ঞানিক হয়েও কবি ছিলেন। এই দুইয়ের সমন্বয়ে তিনি ছিলেন দ্রষ্টা ও ঋষি। একদিকে বৈজ্ঞানিক সত্য, অপরদিকে কাব্যসত্য বা জীবনসত্যের স্রষ্টা ছিলেন জগদীশচন্দ্র। এবং এই জীবনসত্যের গভীরতম বোধই তাঁর মধ্যে বিশেষভাবে স্বদেশপ্রীতির সঞ্চার করেছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতই তাই বলেছেন: 'বিজ্ঞান ও রসসাহিত্যের প্রকোষ্ঠ সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন মহলে, কিন্তু তাদের মধ্যে যাওয়া-আসার দেনা-পাওনার পথ আছে। জগদীশ ছিলেন সেই পথের পথিক। সেই জন্যে বিজ্ঞানী ও কবির মিলনের উপকরণ দুই মহল থেকেই জুটত। আমার অনুশীলনের মধ্যে বিজ্ঞানের অংশ বেশী ছিল না, কিন্তু ছিল তা আমার

প্রবৃত্তির মধ্যে। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ছিল অনুরূপ অবস্থা। সেই জন্যে আমাদের বন্ধুত্বের কক্ষে হাওয়া চলত দু'দিকের দুই খোলা জানলা দিয়ে। তাঁর কাছে আর একটা ছিল আমার মিলনের অবকাশ, যেখানে ছিল তাঁর অতিনিবিড় দেশপ্রীতি।'

এই দেশপ্রীতি নিয়েই সারা ভারত তিনি ভ্রমণ করেছেন, জানতে চেয়েছেন—কোথায় কোন্ রহস্য লুকিয়ে আছে। এমনি করেই এদেশের মাটি, মানুষ এবং সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত রসমাধুর্য তিনি আবিষ্কার করেছেন। সেই আবিষ্কারের কিছু অংশের স্বাক্ষর পাই তাঁর 'অব্যক্ত' গ্রন্থে। সহজ সরল বাংলায় এরকম বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থ জগদীশচন্দ্রের পূর্বে আর কেউ রচনা করতে পারেন নি। এদিক দিয়ে সহজ বাংলায় বৈজ্ঞানিক বিষয় রচনায় তিনি পথ-প্রদর্শক সন্দেহ নেই। 'অব্যক্ত' গ্রন্থে মোট কুড়িটি প্রবন্ধ বা কাহিনী স্থান পেয়েছে। কোনো কোনো রচনা এমনও প্রমাণ করে যে, খাঁটি ব্রাহ্মসমাজবাদী হয়ে হিন্দুধর্মের অন্তর-ভূমির আবর্ষণ তিনি কোথাও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। 'অব্যক্তে' যে যে বিষয়ের আলোচনা আছে, তা হচ্ছে—যুক্তকর, আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ, গাছের কথা, উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু, মন্ত্রের সাধন, অদৃশ্য আলোক, পলাতক তুফান, অগ্নিপরীক্ষা, ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে, বিজ্ঞানে সাহিত্য, নির্বাক্ জীবন, নবীন ও প্রবীণ, বোধন, মনন ও করণ, রাণী সন্দর্শন, নিবেদন, দীক্ষা, আহত উদ্ভিদ, স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা, প্রবাহ ও হাজির।

'হাজির'-এ তিনি নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন :…"কোনদিনও লিখিতে শিখি নাই, কিন্তু ভিতর হইতে কে যেন আমাকে লিখাইতে আরম্ভ করিল। তাহারই আজ্ঞায় 'আকাশ-স্পন্দন ও অদৃশ্য আলোক' বিষয়ে লিখিলাম; পরে লিখাইল 'উদ্ভিদ-জীবন মানবীয় জীবনেরই ছায়ামাত্র।' জীবন সম্বন্ধে বেশী কিছুই জানিতাম না, কাহার আদেশে এরূপ লিখিলাম? লিখিয়াও নিষ্কৃতি পাইলাম না; ভিতর হইতে কে সমালোচক সাজিয়া বলিতে লাগিল—'এত যে কথা রচনা করিলে, পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ কি, ইহার কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা?' জবাব দিলাম, যে সব বিষয় অনুসন্ধান করিতে গিয়া বড় বড় পণ্ডিতেরা পরাস্ত হইয়াছেন, আমি সেই সব কি করিয়া নির্ণয় করিব? তাহাদের অসংখ্য কল-কারখানা ও পরীক্ষাগার আছে, এখানে

তাহার কিছুই নাই; অসম্ভবকে কি করিয়া সম্ভব করিব? ইহাতেও সমালোচকের কথা থামিল না। অগত্যা ছুতার, কামার দিয়া তিন মাসের মধ্যে একটা কল প্রস্তুত করিলাম। তাহা দিয়া যে সব অদ্ভুত তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল, তাহা আমার কথা দূরে থাকুক, বিদেশী বৈজ্ঞানিকদিগকে পর্যন্ত বিস্মিত করিল।"

এখানে এই 'ভিতর হইতে কে যেন আমাকে লিখাইতে আরম্ভ করিল,' এই অজানা শক্তির অলৌকিকতাবাদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, জগতের যা কিছু ঘটনা, তার একজন নিয়ন্তা আছেন, তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন কোনো ইচ্ছাই পূর্ণ হয় না। তাই তাঁর সমুদয় বিজ্ঞান কর্মের মূলে তিনি তাঁকেই স্মরণ করেছেন—যঃ একঃ, যিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁর 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে'র মতো রচনা বাংলা-সাহিত্যে বোধ করি দ্বিতীয়টি নেই। এর মূলে 'হিন্দু মাইথোলজি' জগদীশচন্দ্রের মনে যথেষ্ট প্রভাব সঞ্চার করেছে। এই রচনাটির ভাব ও ভাষা অনবদ্য; তা একদিকে যেমন কবিত্বময়, তেমনি বিষয়ধর্মী। নদীকে উদ্দেশ ক'রে জগদীশচন্দ্র বলছেন: 'নদী, আজ বহুকাল অবধি তোমার সহিত আমার সখ্য। পুরাতনের মধ্যে কেবল তুমি। বাল্যকাল হইতে এ পর্যন্ত তুমি আমার জীবন বেষ্টন করিয়া আছ, আমার জীবনের এক অংশ হইয়া গিয়াছ; তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, জানি না। আমি তোমার প্রবাহ অবলম্বন করিয়া তোমার উৎপত্তিস্থান দেখিয়া আসিব।'

'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে'র এই হচ্ছে মূলগত উৎস। বর্ণনার দিক দিয়েও এর অনবদ্যতা অনস্বীকার্য। গোড়াতেই জগদীশচন্দ্র লিখছেন: "নদীকে আমার একটি গতিপরিবর্তনশীল জীব বলিয়া মনে হইত। সন্ধ্যা হইলেই একাকী নদীতীরে আসিয়া বসিতাম। ছোট ছোট তরঙ্গগুলি তীরভূমিতে আছড়াইয়া পড়িয়া কুলুকুলু গীত গাহিয়া অবিশ্রান্ত চলিয়া যাইত। যখন অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিত এবং বাহিরের কোলাহল একে একে নীরব হইয়া যাইত, তখন নদীর সেই কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে কত কথাই শুনিতে পাইতাম! কখন মনে হইত, এই যে অজস্র জলধারা প্রতিদিন চলিয়া যাইতেছে, ইহা ত কখনও ফিরে না, তবে এই অনন্ত স্রোত কোথা হইতে আসিতেছে? ইহার কি শেষ নাই? নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম: 'তুমি

কোথা হইতে আসিতেছ?' নদী উত্তর করিত: 'মহাদেবের জটা হইতে।' তখন ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হইত।"

টেকনিকটা গল্পের অথচ বিষয়টা বিজ্ঞানের। এমন অদ্ভুত সংমিশ্রণ বাংলা-সাহিত্যে অভিনব। এরকম আর একটি কাহিনীমূলক রচনা 'পলাতক তুফান।' এক সময় 'এইচ বসু, পারফিউমার, দেলখোস হাউস, কলকাতা' প্রতি বছর বাংলার লেখক সম্প্রদায়কে গল্প-প্রতিযোগিতায় লেখা পাঠাবার আমন্ত্রণ জানাতেন এবং যাঁর লেখা সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হ'তো, তাঁকে নগদ পুরস্কার দেওয়া হ'তো। এই পুরস্কার 'কুন্তলীন পুরস্কার' নামে খ্যাত। ১৩০৩ সালে প্রথম বছর জগদীশচন্দ্র এই পুরস্কার লাভ করেন। লেখক হিসেবে সেই গল্পে তখন তাঁর নাম ছিল না। পুরস্কারদাতা গল্পটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করবার সময় লেখেন: 'এই উৎকৃষ্ট গল্পের লেখক নাম প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছানুসারে পুরস্কার (৫০৲ টাকা) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত রবিবাসরিক নীতিবিদ্যালয়ে দেওয়া হইয়াছিল। সেই বৎসরের নিয়মাবলীতে রচনাকারীর নমোল্লেখ সম্পর্কে বিশেষ কোনো নিয়ম না থাকায় আমরা বাধ্য হইয়া এই পুরস্কার দিয়াছিলাম।'

এই পুরস্কৃত গল্পটিই 'পলাতক তুফান।'

সহজ কথার আবেদনে ও সহজ ভাষার আশ্রয়ে বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলিকে জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য ভাবে পরিবেশনের এই টেক্‌নিক জগদীশচন্দ্রই প্রথম বাংলা-সাহিত্যে আনলেন। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায়, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতি এই টেক্‌নিকের ভিত্তিতেই বাংলায় বিজ্ঞানালোচনাকে সহজ ক'রে তোলেন। তার প্রথম পথিকৃৎ জগদীশচন্দ্র। অথচ আশ্চর্য যে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর ইংরেজি ভাষায় যাঁর বহু তথ্যবহুল গ্রন্থ সমগ্র পাশ্চাত্ত্যদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে, তাঁর হাতে এমন সহজ-সরল কাহিনীসদৃশ বাংলা-ভাষায় সেই জটিল দুরূহ বিষয়গুলির অনবদ্য প্রকাশ কি ক'রে সম্ভব হ'লো! বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর এমনই অদ্ভুত দখল ছিল জগদীশচন্দ্রের। তিনি একাধারে যেমন নিজে স্রষ্টা ছিলেন, তেমনি অনেকাংশে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির প্রেরণাস্বরূপ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি প্রধানতঃ জগদীশচন্দ্রের প্রেরণাতেই গ'ড়ে ওঠে। তিনি একদিকে ছিলেন কবি ও কবি-সখা, অপরদিকে ছিলেন

বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে তিনি কোনো ব্যতিক্রম বোধ করতেন না। এ সম্পর্কে জগদীশচন্দ্রের ব্যক্তিগত মতবাদ যে কি ব্যাপক ও উদার ছিল, তা তাঁর 'বসু বিজ্ঞান মন্দিরের' অষ্টম বার্ষিক সভায় প্রদত্ত ভাষণের ভাষাতেই বলা যায়: 'জ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে জগৎ কোন বিশেষ জাতির কাছে ঋণী, এ কথা বলার চেয়ে অসত্য আর কিছুই নেই। সমগ্র বিশ্ব পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। যুগের পর যুগ ধ'রে চিন্তাধারার অবিরাম প্রবাহ মানুষের উত্তরাধিকারকে সমৃদ্ধ করেছে। এই নির্ভরশীলতার উপলব্ধিই মানবগোষ্ঠীকে ঐক্যবন্ধনে গ্রথিত করেছে এবং সভ্যতার গতি ও স্থিতি নিশ্চিত করেছে। বিজ্ঞান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কারুরই একার অধিকার নয়, বিশ্বজনীনতায় ইহা আন্তর্জাতিক। তথাপি ভারত মননশীলতায় এবং বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত জ্ঞানের সাহায্যে বিশ্বের জ্ঞানপ্রসারের ক্ষেত্রে মহান্ অবদানের অধিকারী। আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী বস্তুসমূহের মধ্যেও যে ভারতীয় কল্পনা সমন্বয়ের সূত্র আবিষ্কার করতে পারে, যোগসাধনার সাহায্যে সে কল্পনাকে সংযত করতেও জানে। এই সংযমের জোরেই মন তার অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হতে থাকে। মনই আসল গবেষণাগার, যেখানে সবকিছু স্বপ্নের অন্তরালে সত্যের আভাস পাওয়া যায়। গাছপালায় জীবনের কাজ আবিষ্কার করতে হলে নিজেকেও গাছপালার মত হতে হবে, তবেই তার প্রাণস্পন্দন অনুভব করা সম্ভব হবে। এই প্রত্যক্ষ দর্শনকে পরীক্ষার সাহায্যে মাঝে মাঝে যাচাই করে নিতে হবে।'

এই উক্তির আলোকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র আরও বেশী অন্তরঙ্গতায় ও বস্তুসত্যের চমৎকারিত্বে মহনীয়। তিনি এমন এক বীরশ্রেষ্ঠ, যিনি অজানা মহাদেশ জয় করেছেন এবং সেই জয়ের আনন্দ পরিপূর্ণ ভাবে তিনি ভারতকেই দিয়েছেন।

॥ নববর্ষ ॥

নববর্ষ আমাদের জীবনে নিয়ে আসে নব শক্তির উৎস। তখন জীর্ণজরা পুরনো বছরের ব্যর্থতার কালিমা মুছে যায়, মুছে যায় অতীতের তাপদগ্ধতা; মন তার আশ্রিত হলেও চিত্ত তা থেকে স্পর্শবিমুখ। দুঃখের নদী উত্তীর্ণ হয়ে যেখানে আছে উজ্জ্বল বেলাভূমি—আমাদের প্রাণের লীলা সেইখানেই। সেখানে যমুনাপুলিনে বাঁশী বাজে, সমুদ্রগর্ভের যন্ত্রণা থেকে উঠে আসে চিরকালের প্রশান্ত জলদেবতা। দেবতায় মানুষে সেখানে নতুন আলিঙ্গন। কিন্তু তার জন্যেও ধ্যান চাই, চাই প্রাণচর্যা। ধ্যানেই তো জ্ঞান আসে, জ্ঞানেই তো মুক্তি, আর মুক্তিতেই তো আনন্দ। ভয় থেকে মুক্তি, দুঃখ থেকে মুক্তি, বন্ধন থেকে মুক্তি, গ্লানি থেকে মুক্তি। প্রথম ঊষার স্বর্ণকিরণ সেই মুক্তির স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে যায় আমাদের অঙ্গে। তখন অঙ্গের লাবণী নবনীর মতো মনে হয়, আনন্দ-চর্চিত চন্দনে অঙ্গরাগের মদিরা তখন আমাদের মাতোয়ারা ক'রে দেয়। আমরা তখন আনন্দিত হই, উদ্বোধিত হই, জাগ্রত হই, তখন মহাপ্রাণের স্পর্শ হয়ে পৃথিবীর যা কিছু স্থাবর-জঙ্গম আমাদের মধ্যে এসেই লীলা-রসাশ্রিত হয়, উপনিষদের মন্ত্র বাজে তখন আমাদের রক্তকোষে: 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম।' কিন্তু এই উদ্বোধিত জীবনের স্পর্শ পেতে অন্তরসিদ্ধ ধ্যান চাই। প্রার্থনা হয়ে ফুটে না উঠলে প্রার্থিতকে পাওয়া যায় না। আমাদের এক একটা বছরের প্রার্থনা তাই এক-একটি প্রার্থিত নববর্ষের প্রথম ঊষাকে জয় ক'রে আনে, তারপর ক্রমে তাকে ক্ষয় ক'রে ক'রে খুঁজে পাই আর একটি ঊষাকে, 'ওই বছরের' বেদনার ডালিকে 'এই বছরের' পুষ্পগুচ্ছে ভরে' তুলে আবেগ বিহ্বল কণ্ঠে তখন বলি:

'চৈত্র মাসের হাওয়ায় কাঁপা
দোলন চাঁপার কুঁড়িখানি
প্রলয়দাহের রৌদ্র-তাপে
বৈশাখে আজ ফুটবে জানি।'

সেই ফোটার সাধনায় প্রলয়দাহের রুদ্রদেবতার উদ্দেশে আমরা যুক্তকর প্রসারিত ক'রে বলি: 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্'—'হে

রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করো।' রুদ্রের করুণা তখন বৈশাখের আশীর্বাদ হয়ে আমাদের বর্ষারম্ভের উদয়-উষাকে রমণীয় ক'রে তোলে। আত্মজ্ঞানের অমোঘ মন্ত্রে আমরা তখন প্রতিজ্ঞামুখর হই।

তেমনি জীর্ণক্লান্ত পুরনো বছরকে অতিক্রম ক'রে আজ আমরা আর একটি নতুন বছরের নবীন উষা-প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালাম। কাল কেবল চড়কের ঢাকের বাদ্য শেষ হয়েছে, তার অন্তরাত্মাকে আচ্ছন্ন ক'রে ব'সে ছিলেন যে শিব, তিনি এসে মঙ্গল হয়ে আশ্রয় নিয়েছেন আজকের সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাতের প্রাণবেদীতে। সুন্দর এসেছেন তাঁর আপন সজ্জা রচনা ক'রে। যিনি শিব, তিনিই মঙ্গল, তিনিই সুন্দর। তিন চোখে তাঁর এই তিন সত্যেরই প্রকাশ। তিনি যে ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ। তাঁকে উদ্দেশ করেই যে আমরা বার বার উচ্চারণ করি ঃ

'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।'

অর্থাৎ—আমরা জ্যোতির্ময় মহান্ পুরুষকে জেনেছি। তাঁকে দিয়ে যে আজকের প্রভাত এমন উজ্জ্বল, তাঁকে দিয়ে যে আজকের প্রভাত এমন আনন্দমধুর। তাঁর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমাদের জয়যাত্রা শুরু হোক। অতীতের গ্লানি নিয়ে আজ আর আমরা দুঃখ করবো না, অতীতের পরাজয় দিয়ে আজ আর নিজেদের পৌরুষকে খর্ব করবো না, কুহেলিকাচ্ছন্ন তমসার পরপারে আদিত্যের যে উজ্জ্বল প্রকাশ, তাঁকে যুক্তকরে নমস্কার ক'রে নববর্ষের এই নবীন উষাকে আমাদের প্রাণের নিকেতনে সাদর আমন্ত্রণ জানাই। উপনিষদ বলেছেন ঃ 'তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মনঃ সর্বমেবাবিশন্তি', অর্থাৎ—'যিনি সর্বব্যাপী, তাঁকে সর্বত্রই প্রাপ্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত ধীরেরা সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন।' তেমনি নববর্ষের এই যে মহাদ্যুতির স্বপ্রকাশ, যিনি বিশ্বের সবত্র সঞ্চারিত, তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে আমরাও বিশ্বের সকলের মধ্যে প্রবেশ করবো। উপনিষদের ঋষি আমাদের সেই আত্মবিকাশের শিক্ষা দিয়ে বলেছেন ঃ

'যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষুচাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।'

অর্থাৎ—'যিনি সর্বভূতকে নিজের মধ্যে এবং নিজেকে সর্বভূতের মধ্যে দর্শন

করেন, তিনি কখনও প্রচ্ছন্ন থাকেন না, লোক থেকে লোকে লোকে তার উজ্জ্বল প্রকাশ। আমাদের জীবনে আজ সেই প্রকাশের প্রতিশ্রুতি স্বাক্ষরিত হোক্। যেখানে যত গ্লানি, যত ব্যথা, যত হাহাকার, যত পরাজয়, যত ব্যাধি, যত ক্লীবতা—সবকিছুকে বিদূরিত ক'রে আমরা রচনা করবো হাসিউচ্ছল জীবনের জয়গান। নতুন ক'রে আজ আবার আমরা স্বদেশের দীক্ষা গ্রহণ করবো। আমাদের জন্মভূমির ভৌগোলিক রেখাঙ্কিত মাটির মধ্যেই মাত্র আমাদের স্বদেশের সকল পরিচয় নয়, সে যে প্রত্যহ নতুন রূপ নিয়ে আমাদের প্রাণের মধ্যে রূপায়িত হয়ে উঠচে। তার শরীর থেকে শরীর নিয়ে আমরা শরীরী হচ্ছি, তার প্রাণ থেকে প্রাণ নিয়ে আমাদের প্রাণচেতনা জাগ্রত হচ্ছে, তার শ্বাস থেকে শ্বাস নিয়ে আমরা জীবনকে আয়ুষ্মান করছি। একদিকে লক্ষ্মীর মতো সে আমাদের স্নেহ দিচ্ছে, আর একদিকে রাজাধিরাজের মতো সে আমাদের সকল দুঃখের অবসান ঘটাচ্ছে। আমাদের বহুতর ত্যাগের দ্বারা তার সেই অকৃপণ করুণার যদি মর্যাদা না দিই, তবে প্রজা হিসেবে, সন্তান হিসেবে আমরা কর্তব্যভ্রষ্ট হবো। নববর্ষের প্রথম উষায় আমাদের সেই কর্তব্যবোধ জাগ্রত হোক্; স্বদেশের জন্য বলি হয়ে আজ যেন আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে বলতে পারি :

'রাজা তুমি নহ হে মহা তাপস,
তুমিই প্রাণের প্রিয়,
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব
তোমারই উত্তরীয়।'

আমাদের প্রতিদিনের ভিক্ষাবৃত্তির অবসান হোক, আমাদের প্রাণপ্রতিম মহা-তাপস মহাদেশ এই স্বদেশের জন্য আমাদের জীবন উৎসর্গীকৃত হোক, সর্বজাতির স্পর্শে পবিত্র এই তীর্থসলিলে অবগাহন ক'রে আমাদের সকল আশার নিবৃত্তি হোক্। মধু হোক্ আমাদের এই শুভদিন।

মাধুর্যের আর একটি তাৎপর্য আছে এই নব-প্রভাতের। সেটি আমাদের জাতীয় উৎসব। হাল-শুভক্ষণের মধ্য দিয়ে এই উৎসবের শুরু। যেখানে যত সম্মেলন, যত মুখরিত গীত-বাদ্যের উৎস—সর্বত্রই মিলনের মহাধ্বনি, সর্বত্রই-ধ্বনিত হয়ে উঠচে মিলনের ওঁকার। সেখানে সকলের মিলনের দ্বারা আমরা সকলে সার্থক। জাতীয় উৎসবের এই মিলনের মধ্য দিয়ে আমরা নতুন হয়ে

উঠবার সঙ্কল্প গ্রহণ করি। চৈত্রসংক্রান্তিতে আমাদের দেশের বহু অঞ্চলে পায়ের নিচে দিয়ে ছাতু ওড়াবার প্রচলন আছে; এটির তাৎপর্য হচ্ছে—শত্রুক্ষয়, সারা বছর ধরে মতবিরোধ নীতিবিরোধ আর প্রাণ-বিরোধের তো অন্ত নেই. বর্ষশেষে তার প্রায়শ্চিত্তকাল উপস্থিত হয়। তখন ছাতুর মুখে কথা ছুঁড়ে দিয়ে এই সত্যই প্রকাশিত হয় যে, বিশ্বচরাচরে আমার আর কেউ শত্রু নেই, আমি কারুর বৈরী নই। নববর্ষের প্রথম উষায় সেই নিঃশত্রু মানুষেরা মিত্রের মতো এসে সারা প্রাণে ধরা দেয়, সকলকে নিয়ে তবে মিলন সার্থক হয়। আমাদের আজ সেই মিলনের দিন। পৃথিবীর যেখানে যে ব্যক্তি আছেন, মনে মনে তাঁদের সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমরা সকল প্রাণের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হবো। এমনি ক'রে সহিতত্ব না হ'লে আমাদের জীবনের মতো আমাদের শিল্প-সাহিত্যও যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

নব-বৈশাখের এই শুভ দিনে আমাদের জীবনকে যেমন তাই নতুন প্রাণের হিল্লোলে মধুর ক'রে তুলবো, তেমনি আমাদের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকেও নবীনতার স্পর্শে উজ্জ্বল ক'রে তুলবো। নতুনের জয়যাত্রাই জাতীয় কৃষ্টির প্রাণযাত্রা। বিশ্বপ্লাবি উত্তাল সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে সেই প্রাণেরই কল্লোল-ধ্বনি, সেই প্রাণেরই হিল্লোলিত রসধারা প্রবাহিত। সেই ধারায় অবগাহন ক'রে আমরা শুদ্ধ হবো, খাঁটি হবো। জীবনকে মিথ্যায় মিথ্যায় আর পঙ্কিল করবো না, মনুষ্যত্বকে ক্রীতদাসের মতো পর-পদলেহি ক'রে তুলবো না, সংস্কৃতিকে দুর্মতির ঘেরাটোপে আবদ্ধ ক'রে পিষে মারবো না। নবীন প্রাণের জয়যাত্রার পথে আমাদের মনুষ্যত্বের স্বীকৃতিতে মহত্তের ওঁকারধ্বনি মন্দ্রিত হয়ে উঠুক: নববর্ষের প্রথম উষার উৎসবলগ্নে ভাগ্যবিধাতার কাছে এই বরই আমরা প্রার্থনা করি।

॥ নববর্ষ ও রবীন্দ্রনাথ ॥

চৈত্রের পিঙ্গল আভাকে আচ্ছন্ন ক'রে অকস্মাৎ কোথা দিয়ে নব বৈশাখের প্রথম উষালগ্ন আমাদের নব আলোকতীর্থে আহ্বান করে, আমরা আচম্বিতে জড়ত্ব হ'তে জেগে উঠে নববর্ষকে শঙ্খনিনাদে অভিবাদন করি।

রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিতে এই নববর্ষ নানাভাবে এসেছে। তিনি তাকে আহ্বান ক'রে কখনো বলেছেন—

হে নূতন,
তোমার প্রকাশ হোক
কুজ্ঝটিকা করি উদঘাটন
সূর্যের মতন।

কখনো আবার বলেছেন—

হে নূতন এসো তুমি
সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে
ব্যাপ্ত করি লুপ্ত করি,
স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে
ঘন ঘোর স্তূপে।

কখনো বৈশাখকে সম্বোধন ক'রে সংশয়ে তিনি প্রশ্ন করেছেন—

...তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু,
মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ?

লক্ষ্য করবার বিষয় যে, নববর্ষ এই নবীন বৈশাখের সঙ্গে কবির জন্ম-জীবনের একসূত্রে গাঁটছড়া বাঁধা। বৈশাখের রূপ একদিকে ভয়াল, ভীষণ, অন্যদিকে শান্ত, স্নিগ্ধ। তার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে সঙ্গীতের ঝংকার, জীবনের জয়গাথা। এই বৈশাখেই কবির শুভ জন্ম। জন্মসূত্রে রবীন্দ্রনাথ বৈশাখকে পেয়েছেন চির আপনার ক'রে। বৈশাখ যত দীপ্ত রুদ্র, তিনিও তত রবি-

করোজ্জ্বল ভৈরব; আবার বৈশাখ যত মলয়বাহী মধুর, তিনিও তত গীতিমুখর স্নিগ্ধ। দু'জনের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। নানাভাবে তিনি তাই বৈশাখকে বর্ণনা করেছেন, রূপ দিয়েছেন নববর্ষকে, নববর্ষের উৎসবকে। প্রকৃতির কবি তিনি। নবজীবনের অভিষেকের বার্তা এনে দিলেন তিনি বিশ্বপ্রকৃতিকে। বললেন: 'প্রান্তরের মধ্যে পুণ্য নিকেতনে নববর্ষের প্রথম নির্মল আলোকের দ্বারা আমাদের অভিষেক হইল। আমাদের নবজীবনের অভিষেক।…এই যে চির-পুরাতন অন্নপূর্ণা বসুন্ধরাকে আমরা দেখিতেছি, আমরা ধন্য। এই যে গীতগন্ধবর্ণ-স্পন্দনে আন্দোলিত বিশ্বসরোবরের মাঝখানে আমাদের চিত্তশতদল জ্যোতিঃ পরিপ্লাবিত অনন্তের দিকে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে, আমরা ধন্য… এই মহিমান্বিত জগতে অদ্যকার নববর্ষ দিন আমাদের জীবনের মধ্যে যে গৌরব বহন করিয়া আনিল, এই পৃথিবীতে বাস করিবার গৌরব, এই আকাশতলে আসীন হইবার গৌরব—তাহা যদি পরিপূর্ণভাবে চিত্তের মধ্যে গ্রহণ করি, তবে আর বিষাদ নাই, নৈরাশ্য নাই, ভয় নাই, মৃত্যু নাই।'

ভয়ের মধ্যে যিনি অভয়, মৃত্যুর মধ্যে যিনি অমৃত, সেই দেবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথ। তাঁর প্রার্থনায় তিনি নিমগ্নচিত্ত। তাঁকে বাদ দিয়ে নববর্ষের উপলব্ধি মিথ্যে; তাঁকে দিয়েই যে নবীন প্রাণের সোনার থালা পরিপূর্ণ। তাঁর উদ্দেশেই তিনি বললেন: 'হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, এই যে অরুণরাগরক্ত নীলাকাশের তলে আমরা জাগ্রত হইলাম, আমরা ধন্য।' বললেন: 'তাঁহার প্রতিদিনের ইচ্ছাই আমাদের প্রতিমুহূর্তের অস্তিত্ব, আজ নববর্ষের দিনে এই কথা যদি উপলব্ধি করি—আমাদের মধ্যে তাঁহার অক্ষয় আনন্দ যদি স্তব্ধ গভীরভাবে অন্তরে উপভোগ করি—তবে সংসারের কোনো বাহ্য ঘটনাকে আমার চেয়ে প্রবলতর মনে করিয়া অভিভূত হইব না…নিজের মধ্যে ও নিজের বাহিরে সেই ব্রহ্মের আনন্দ জানিয়া কোনো অবস্থাতেই আর ভয় পাওয়া যায় না।'

বৈশাখ থেকে যে নববর্ষের শুরু, সেই আগামী তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের উদ্দেশ্যে এই শুভ নবপ্রভাতে আমাদের চিত্তকে সম্পূর্ণভাবে দান করবো: তার একটি দিনকে যেন অপর একটি দিন থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে আমরা স্বার্থের আঘাতে তাকে মলিন না করি। অতীতের যে দিনগুলি সদ্য অতিবাহিত হয়েছে, তার কোনো একটি মুহূর্তকে আমরা যদি অলক্ষ্যে উপহাসে খর্ব ক'রে

থাকি, তবে তার প্রায়শ্চিত্তও যেন এই নবীন উষায় আমাদের হয়। তবেই এই দিনটিকে শ্রদ্ধায় সৌন্দর্যে আমরা ভ'রে তুলতে পারবো। রবীন্দ্রনাথ বললেন: 'অদ্য বৎসরের অনুদ্ঘাটিত প্রথম মুকুল সূর্যের আলোকে মাথা তুলিয়াছে—ইহাকে আমরা খণ্ডিত করিব না, সৌন্দর্যে সৌগন্ধে শুভ্রতায় ইহাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিব।' বললেন: 'নববর্ষের প্রাতঃসূর্যালোকে দাঁড়াইয়া অদ্য আমাদের হৃদয়কে চারিদিক হইতে আহ্বান করি। আজ শতধারা একধারা হইয়া গোমুখীর মুখনিঃসৃত সমুদ্রবাহিনী গঙ্গার ন্যায় প্রবাহিত হইবে—তাহা হইলে মুহূর্তের মধ্যে প্রান্তরশায়ী এই নির্জন তীর্থ যথার্থই হরিদ্বার তীর্থ হইয়া উঠিবে।'

সেই তীর্থে আমরা উৎসবের বাঁশী বাজাবো, আহ্বান করবো উচ্চ-নীচ ধনী-নির্ধন সকলকে। সকলকে মিলিয়েই যে উৎসব সার্থক। একা কি উৎসব হয়? উৎসব হয় সকলের সম্মিলনে। কিন্তু সেই উৎসবেরও দায়িত্ব আছে। যে আনন্দ শক্তি জোগায় না, সে আনন্দ আর যা হোক্ উৎসবের আনন্দ নয়। রবীন্দ্রনাথ তাই বললেন: 'আজ আমাদের কিসের উৎসব? শক্তির উৎসব। মানুষের মধ্যে কী আশ্চর্য শক্তি আশ্চর্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে।'

মানুষের জীবনে কবে এই উৎসব দেখা দেয়? প্রশ্ন করলেন রবীন্দ্রনাথ। আবার তিনিই উত্তরে বললেন: 'মানুষ যেদিন আপনার মনুষ্যত্বের শক্তি বিশেষভাবে স্মরণ করে, বিশেষভাবে উপলব্ধি করে, সেই দিন। প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র, দীন, একাকী, কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে এক হইয়া বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।'

তাঁর 'নববর্ষ', 'উৎসবের দিন', 'রোগীর নববর্ষ', 'বর্ষশেষ', 'বৈশাখ', 'উৎসর্গ' প্রভৃতি বিভিন্ন রচনায় নববর্ষের অনুভূতিকে তিনি উজ্জ্বল ক'রে তুলে ধরেছেন—যেমন অঞ্জলিপুটে পুষ্পার্ঘ তুলে ধরেছেন স্বদেশের উদ্দেশ্যে—

হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে
শুন এ কবির গান,
তোমার চরণে নবীন হর্ষে
এনেছি পূজার দান।

তাঁর ধ্যানে ভারত, প্রাণে ভারত, স্বদেশের দীক্ষা তাঁর শ্রেষ্ঠ দীক্ষা। বললেন—

নব বৎসরে করিলাম পণ
লব স্বদেশের দীক্ষা,
তব আশ্রমে তোমার চরণে
হে ভারত লব শিক্ষা।

কবির মতো আমাদের জীবনেও আজ স্বদেশ-শিক্ষা সার্থক হোক্, সার্থক হোক নববর্ষ, নববর্ষের উৎসব। রবীন্দ্রনাথের মতই আজ যেন আমরা বিশ্ববিধাতার উদ্দেশ্যে বলতে পারি : …'হে রুদ্র, বৈশাখের প্রথম দিনে আজ আমি তোমাকেই প্রণাম করি—তোমার প্রলয়লীলা আমার জীবনবীণার সমস্ত আলস্যসুপ্ত তারগুলোকে কঠিন বলে আঘাত করুক, তা হলেই আমার মধ্যে তোমার সৃষ্টিলীলার নব আনন্দসঙ্গীত বিশুদ্ধ হয়ে বেজে উঠবে। তা হলেই তোমার প্রসন্নতাকে অবারিত দেখতে পাবো। তা হলেই আমি রক্ষা পাবো।'

অ।

হয়েছে,

॥ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও ভারতরাষ্ট্র ॥

ভারত কি আদর্শবিযুক্ত ও ঐতিহ্যবিস্মৃত হ'য়ে স্বাধীনতা লাভ ক'রে অধিকতর গৌরবান্বিত হয়েছে—না, জ্ঞানে-শিক্ষায়-আদর্শে ও ঐতিহ্যে আরূঢ় হ'য়ে একদা তপঃসিদ্ধ ও মহীয়ান হ'য়ে উঠেছিল?—এই প্রশ্নটিই আজ যেকোনো বিদগ্ধ ব্যক্তির কাছে বড়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একজন একনিষ্ঠ সৈনিক হ'য়েও স্বাধীনতার স্বরূপ দেখে যেতে পারেন নি, কিন্তু লোকচরিত্রের দিক থেকে ভারতীয় দুর্দশার চিত্র তিনি স্পষ্ট দেখে গিয়েছিলেন।

আজকের ভারত নানা দিকে উন্নতির সোপান গ'ড়ে তুলেও জাতির শিক্ষা ও চরিত্রের বনিয়াদকে ধূলিসাৎ ক'রে দিয়েছে, অথচ একটা দেশের সর্বাধিক উন্নতির মূলে এই শিক্ষা ও চরিত্র—যা ব্যক্তিকে স্বাধীন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে ও জাতিকে নানা বিষয়ক সৃষ্টিকর্মে অনুপ্রাণিত করে। একদা ভারতবর্ষ এদিক থেকে যে কতটা উর্ধ্বে উঠেছিল, তার কিছু আভাস প্রফুল্লচন্দ্রের রচনায় ও বক্তৃতায় আমরা পাই।

চার্বাকের কথা উল্লেখ ক'রে তিনি বলেছেন—সে সময়ে স্বাধীন চিন্তা কতদূর উচ্চশিখরে আরোহণ ক'রেছিল, তা চার্বাক দর্শন আলোচনা করলেই বোঝা যায়। তারপর বৌদ্ধধর্মের প্রচারে সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব ভারতের সর্বত্র ঘোষিত হলো। তার ফলে জ্ঞানোন্নতির পথ সর্বসাধারণের পক্ষে উন্মুক্ত হওয়ায় সর্বশাস্ত্রের সম্যক আলোচনা আরম্ভ হয়েছিল। বিশেষতঃ বৌদ্ধগণ রসায়ণ ও চিকিৎসাশাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছিলেন। এক নাগার্জুনের নাম করলেই যথেষ্ট হবে। 'History of Hindu Chemistry'র 'Introduction'-এ প্রফুল্লচন্দ্র এ প্রবাদের কথা উল্লেখ করেছেন যে, সুশ্রুততন্ত্র পরিবর্ধিত ক'রে নাগার্জুনই নতুন আকারে প্রণয়ন করেছিলেন। সুশ্রুতে বৌদ্ধমতের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। এতে শবব্যচ্ছেদের সুন্দর নিয়মাবলী এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত কিছুই করবে না—এরকম উপদেশ পাওয়া যায়। 'অষ্টাঙ্গ হৃদয়' প্রণেতা বাগভটও বৌদ্ধ ছিলেন। চক্রপাণি বলেন : তিনি যে লৌহ-রসায়ণ ব্যবস্থা করেছেন, তা নাগার্জুন কর্তৃকই প্রথম বিবৃত হয়। রসেন্দ্রচিন্তামণিকারের মতে তিনিই রাসায়ণিক তির্যকপাতন প্রক্রিয়ার আবিষ্কর্তা।

প্রাচীন ভারতে শুধু দর্শন ও সাহিত্য নয়, সেই সঙ্গে আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ, গণিত ও রসায়ণ শাস্ত্রেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু কালচক্রে এ সমস্ত বিদ্যা কিভাবে লোপ পেল? কেউ কেউ বলেন—মুসলমান একাধিপত্যে রাজাগণ শ্রীভ্রষ্ট ও বিধ্বস্ত হওয়াই এর প্রধান কারণ, কিন্তু তৎসাময়িক ইতিহাস থেকে এর সারগর্ভ যুক্তি মেলে না। মুসলমানদের আর্যাবর্ত জয়ের অনেক আগে থেকেই নাকি হিন্দুদের এই অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি হ্রাস পেতে শুরু করেছিল! তাই যদি হ'তো, তবে পূর্বোক্ত সমুদয় বিদ্যার আলোচনা দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় গ্রহণ করতো। কারণ, সেখানে মুসলমান আধিপত্য কখনও স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। মুসলীম শাসনকালে বাংলাদেশে, বিশেষতঃ নবদ্বীপে ও বিক্রমপুরে, হিন্দুশাস্ত্রের যথেষ্ট চর্চা ছিল। এই উভয় স্থানই নবাবের রাজধানীর সন্নিকট ছিল।

স্থূলভাবে বলতে গেলে, উপনিষদ রচনাকাল থেকে শুরু ক'রে বৌদ্ধধর্মের প্রৌঢ়াবস্থা পর্যন্ত হিন্দুর মস্তিষ্ক চালনা বা মানসিক চিন্তার যা যা গৌরব করবার, তা সন্নিবেশিত হয়েছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এই সময় অর্থাৎ খ্রীষ্টজন্মের ছ'শো বছর আগে থেকে সাতশো খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের জ্ঞানোন্নতি ও স্বাধীন চিন্তার যুগ ব'লে আখ্যা দিয়েছেন। এই সময়েই পাণিনি সাহিত্য-জগতে অতুলনীয় ব্যাকরণ প্রণয়ণ করেন। অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন মহাতেজা ঋষিগণ ষড়দর্শন রচনা করেন এবং বুদ্ধদেব 'অহিংসা পরম ধর্ম' ধ্বজা উত্তোলন ক'রে মৈত্রী এবং সর্বজীবে ভ্রাতৃভাব জগতে ঘোষণা ক'রে সমগ্র মানবহৃদয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষার আদর্শ উপস্থিত করেন। আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত এবং বরাহ-মিহির প্রভৃতি মনস্বিগণ জ্যোতিষ ও গণিত শাস্ত্রের উন্নতি ও পুষ্টি সাধন করেন। কিন্তু হায় সেসব কোথায় গেল?

বৌদ্ধধর্মের মহত্ত্বের যেরকম উচ্চ আদর্শ প্রদর্শিত হয়েছিল, তাই কিছু পরিমাণে তার অধঃপতনের কারণ ব'লে মনে হয়। বৌদ্ধধর্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দুধর্ম বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুদয় হয়েছিল। ব্রাহ্মণগণ এই সময়ে হিন্দুসমাজের উপর পূর্ণমাত্রায় আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ সেই উপনিষদের ও ষড়্দর্শনের প্রণেতা আর্যকুলগৌরব মহাতপা তেজস্বী ব্রাহ্মণ ন'ন্। তৎপরিবর্তে একদল অযোগ্য স্বার্থপর লোক সমাজে আবির্ভূত হয়ে পূর্বোক্ত মহাপুরুষগণের অযোগ্য পবিত্র নামের দোহাই

দিয়ে সমাজের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছিল এবং স্বকীয় জাতির মহিমা হারিয়ে কেবল একগুচ্ছ শ্বেতসূত্র বা যজ্ঞোপবীতের দোহাই দিয়ে সমাজের শাসনবিষয়ক স্মৃতি পুরাণ ইত্যাদি কতকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছিল। এই সকল গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য কেবল ব্রাহ্মণ কীর্তন, অর্থাৎ স্বার্থপর ব্রাহ্মণ নামধারী প্রভুগণের আধিপত্য বিস্তার ও জীবিকানির্বাহ। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য কুসংস্কারের এক অতি বৃহৎ অধ্যায়। অনুসন্ধান প্রবৃত্তি একপ্রকার লুপ্তপ্রায় হলো। যাকিছু বৈজ্ঞানিক আভাস জাতীয় শিক্ষা ও জ্ঞানের সঙ্গে ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছিল, যাকিছু প্রাকৃতিক দর্শন ইত্যাদি আলোচনার আভাস সূচিত হচ্ছিল, তা অল্পকালের মধ্যেই বিনষ্ট হবার পথে এলো। এই বিলোপের কারণ শাস্ত্রকারগণের কঠোর আদেশ।

এই প্রসঙ্গে রাস্কিনের একটি কথা উদ্ধৃত ক'রে প্রফুল্লচন্দ্র বললেন: মানুষের চরম অবনতি তখনই সূচিত হয়, যখন তার চরিত্র থেকে সম্ভ্রমের ও গুণ-গ্রাহিতার প্রবৃত্তি তিরোহিত হয়। সমাজ যখন এই প্রকার হীনাবস্থায় পতিত হয়, তখন পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় অনন্ত অকল্যাণকর রীতিনীতি এসে সমাজের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করতে থাকে। ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যে জর্জরিত বাংলায় শীঘ্রই তার উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষক 'বল্লালী কৌলিন্য' এসে জুটলো। শাস্ত্রের কঠোর তাড়নায়, আত্যাভিমান, কুলমর্যাদা ইত্যাদির অসহনীয় কশাঘাতে উন্মত্ত হয়ে বাংলার বহুসংখ্যক লোক ইসলামধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হলো। এইভাবে কৃত্রিম অনৈসর্গিক বিধান সকল যখন সৃষ্ট হলো, প্রকৃতি তখন ভীষণ প্রতিশোধ নিল। মুসলমান রাজত্বকালেও প্রকৃতির এই প্রতিশোধ একই খাতে প্রবাহিত হয়ে চললো এবং ক্রমে ইংরেজরাজের সমাগমে প্রতীচ্য দেশের এক প্রবল হাওয়া এসে প্রাচ্য-জলধি বিচলিত করে তুললো। ভারতের গৌরবের ইতিহাস বুঝি শুধু অতীতের সাক্ষী হয়েই রইল, সে-ইতিহাসের আর পুনরাবৃত্তি ঘটাবার সম্ভাবনা দেখা দিল না।

এই ধারাবাহিক ইতিহাসচর্চা রাসায়নিক প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের এক অক্ষয় কীর্তি। দক্ষ ঐতিহাসিকের মতো তাঁর বিচার বিশ্লেষণ এবং কঠোর সংস্কার-কের ন্যায় তাঁর প্রদর্শিত পথের ইঙ্গিত বিদগ্ধ ব্যক্তিমাত্রকেই বিস্মিত, চমকিত ও চিন্তিত করে। ইংরেজ অধিকৃত ভারতের এক দুর্জয় বিপ্লবী প্রাণসত্তার মানুষ ছিলেন তিনি। ইংরেজ অধিকারে আসার পর ভারতের যতটুকু উন্নতি

হয়েছে, অবনতি ঘটেছে তার সহস্রগুণ। একথা প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে ছিল ইতিহাসসিদ্ধ। তিনি স্পষ্টই তাই দেখেছিলেন—প্রতীচ্যের যে প্রবল হাওয়া এসে প্রাচ্য-জলধি বিচলিত করে তুললো, আমাদের সর্বনাশের সূচনা তারই ঘূর্ণিজালে জড়িয়ে গেল। শিল্পবাণিজ্যের বিপুল বিপ্লব পাশ্চাত্য জগৎকে বিচলিত করলো এবং এইভাবে দেশীয় শিল্পের কোমল মূলে সুতীক্ষ্ণ কুঠারাঘাত পড়লো। ক্রমে ভারতীয় শিল্প নির্মূল হলো। কোটি কোটি টাকা দেশ ছেড়ে বৈদেশিক সমৃদ্ধি বর্ধনে ব্যয়িত হতে লাগলো। এ সময়ে বাঙালী কেরাণীর সৃষ্টি ইংরেজের আর এক কৃতিত্ব। অনেক নিরক্ষর হৌসের মুৎসুদ্দিরা এই সুযোগে ক্রোড়পতি হয়ে পড়লেন।

কিন্তু অশিক্ষিতের হাতে বিপুল ঐশ্বর্যের আগমনে যা ঘটবার তাই ঘটতে লাগলো। ইন্দ্রিয়ের প্রবল প্ররোচনায় ও স্বাচ্ছন্দ্যের বাতাসে বিলাসিতার আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠলো; কর্মময় হ'য়েও বাঙালী স্বাধীন ব্যবসার দ্বারা স্বাধীন জীবিকার্জন ক'রতে অক্ষম হ'য়ে পড়লো। ইত্যবসরে গুজরাট, রাজপুতনা ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলবাসিগণ ঝাঁকে ঝাঁকে এসে সমস্ত ব্যবসা দখল করতে লাগলো,আর বাঙালী ধ্রুবতারার ন্যায় কেরাণীগিরি লক্ষ্য ক'রে ইংরেজী শিখতে লাগলো। এই প্রকারে ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মীর অনুগামী হ'য়ে বাঙালী কেরাণী পাঞ্জাব হ'তে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। এক কলকাতা সহরেই দেখা যায়—ইউরোপীয়ান, মাড়োয়ারী, পার্শি, ভাটিয়া, দিল্লিওয়ালা প্রভৃতি দূর দেশ হতে এসে প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে, আর বাঙালী নিশ্চেষ্ট ভাবে তা দাঁড়িয়ে দেখছে। কলকাতার অনেক অধিবাসীই তো বাঙালী নয়, এবং পেটের জ্বালায় তারা হাহাকার ক'রছে। দশ হাজার ভাটিয়া ক'লকাতায় সওদাগরি ক'রে ধনবান হ'চ্ছে, আর মসীজীবি বাঙালী আধপেটা খেয়ে কোনোমতে বেঁচে আছে।

বঙ্গবিভাগের উপর ভিত্তিশীল ভারতীয় স্বাধীনতার ফলে আজ এ ইতিহাস আরও নির্মম ও নগ্নরূপ ধারণ করেছে। আজকের এই রূপের প্রারম্ভিক চিত্র এঁকে গিয়েছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র, তেমনি জাতির চোখের সামনে স্পষ্ট ক'রে তুলে ধরেছিলেন তিনি ভারতের মানচিত্র। সে-চিত্র আজ নানাদিকে সমৃদ্ধিশালী হয়েও হৃতমর্যাদায় আচ্ছন্ন, তাই মান বাঁচাতে ভারত আজ প্রাণান্ত।

॥ গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ॥

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রাসায়নিক হয়েও শুধু যে রসায়ণশাস্ত্রের মধ্যেই নিজেকে নিমগ্ন রেখেছিলেন, এমন নয়। তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল যেমন বিপুল, তেমনি ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র। একদিকে তিনি যেমন ছিলেন রসপ্রবক্তা ও সেক্স্‌পীয়ার-ভক্ত, অন্যদিকে তেমনি ছিলেন সমাজকর্মী ও খাদি প্রচারক। কিন্তু সব কিছুর উপরে ছিলেন তিনি শিক্ষাবিদ। ব্যবসাবিমুখ বাঙালীকে তিনি শুধু ব্যবসাতেই অনুপ্রাণিত করেন নি, অনুপ্রাণিত করেছিলেন জাতীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠতে। এজন্য জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। ইংরেজ-প্রভাবিত এদেশের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের যে সব পাঠ্যতালিকা, তার মধ্যে এদেশের চিন্তাধারার স্থান খুবই নগণ্য; এদেশের মানুষকে যদি গভীর তত্ত্বানুশীলনের মধ্য দিয়ে স্বজাতি-ইতিহাস ও স্বজাতি-ঐতিহ্য সম্পর্কে সজ্ঞান হ'তে হয়, তবে তা ইংরেজ-পৃষ্ঠপোষিত বিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে নয়, একমাত্র জাতীয় বিদ্যালয়ই তার যথোপযুক্ত ক্ষেত্র। সংযম, ত্যাগ, আত্মনির্ভরশীলতা ও দেশোন্নয়ণ শিক্ষার এত বড ক্ষেত্র আর দ্বিতীয়টি নেই।

এ সম্পর্কে উদাহরণ টেনে প্রফুল্লচন্দ্র নিজেই ব'লেছেন: 'যেমন সৈন্যগণ সেতুবন্ধন করিয়া নদী পার হয় এবং সম্মুখে শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পশ্চাদ্ধাবিত হইবার সম্ভাবনা দূর করিবার জন্য নিজেরাই সেই সেতু নষ্ট করিয়া দেয়—সেইরূপ জাতীয়ভাবে শিক্ষালাভ করিলে শিক্ষার্থীদিগের অনন্যোপায় হইয়া চাকুরী অবলম্বন করিবার আশা থাকে না। জাতীয় শিক্ষার আর একটা উপকারিতা আছে। অতি অল্পদিনের মধ্যে ভারতকে জগৎসভায় স্থান পাইতে হইলে তাহার সন্তানগণকে জাতীয়ভাবে শিক্ষিত হইতে হইবে। জাপান নিজের জাতীয়তা রক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়াছিল বলিয়াই গত ৫০ বৎসরের মধ্যে তাহার এই অভূতপূর্ব্ব উন্নতি। জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিলে একই সময়ের মধ্যে ১০গুণ অধিক শিক্ষালাভ করা যায়। কারণ, এখানে মাতৃভাষায় সমুদয় বিষয় শিক্ষালাভ করিয়া শিক্ষার্থিগণ পাশ্চাত্য ভাষার শব্দগাম্ভীর্য্য, ব্যাকরণ-বিভীষিকার হাত হইতে

নিষ্কৃতি পায়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলিয়াছেন, মহামতি জষ্টিশ রাণাডে একদিন প্রশ্ন উত্থাপন করেন—ইংরেজ-শাসনে আমাদের কি কি অপকার সাধিত হইয়াছে? তিনি উত্তরে বলেন, আমাদের দেশের সমস্ত ধন শোষিত হইয়া বিদেশে যাইতেছে এবং শাসনে আমাদের কোনও হাত নাই। কিন্তু রাণাডে মহাশয় মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্ট এই যে, আমরা সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়াছি। আমাদের wider outlook কমিয়া যাইতেছে। দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তা কমিয়া গিয়া আমরা খুঁটিনাটি লইয়া আছি। এবং তাহাতে আমাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে। যদি আমাদের স্বরাজ থাকিত, তাহা হইলে আর এমনটি হইত না। জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়িলে (এই) কোপীনধারী মহাত্মা এবং যাঁহারা দধীচির মতো সর্ব্বস্ব দিয়া দেশের সেবা করিয়াছেন, তাঁহারাই ছাত্রদিগের আদর্শ হন। সেই সব ভারত-মাতার সন্তান ধন্য।'

জাতীয় শিক্ষা যার পাকা হ'লো না, পৃথিবীর কোনো জ্ঞানই তার কাজে এলো না। প্রফুল্লচন্দ্র একথা বলেননি যে, বিদেশী শিক্ষা কুফলদায়িনী; বরং বলেছেন—জ্ঞান-সমুদ্রের এপার-ওপার নেই, পৃথিবীর সর্ববিধ জ্ঞানই ছাত্রের জীবনে প্রয়োজন, এজন্য শুধু জাতীয় বিদ্যালয়ই মাত্র নয়, জাতীয় গ্রন্থাগারও সেই জ্ঞান আহরণের যথোপযুক্ত ক্ষেত্র। কিন্তু এসবের মূলে একটা পরিমিতিবোধ থাকা বাঞ্ছনীয়। সেই বোধটি হচ্ছে শিক্ষার প্রারম্ভিক সূত্র সম্পর্কে। আগে আত্মশিক্ষা, স্বদেশশিক্ষা, তারপর সর্ববিধ শিক্ষা। এই প্রসঙ্গে তিনি সম্পূর্ণভাবেই ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুসরণকারী ছিলেন। এই শিক্ষাপ্রসঙ্গেই গ্রন্থাগারবিজ্ঞানকে তিনি অনেক উঁচুতে স্থান দিয়েছিলেন। যে জ্ঞান কোনো বিদ্যালয় সম্পূর্ণভাবে দিতে পারে না, কোনো বিদ্যায়তনই যে জ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ ক্ষেত্র নয়, সেই জ্ঞানের পূর্ণকুম্ভ সাজানো থাকে গ্রন্থাগারে। এখানে পৃথিবীর সকল মনীষীর একত্র সমাবেশ। বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্য দিয়ে এই সব মনীষী পাঠকের কাছে এসে উপস্থিত হন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ভাষায়—'জগতে যা কিছু সৎচিন্তা, উৎকৃষ্ট ভাব আছে, যা কিছু উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং মানুষের হৃদয়ে প্রেরণা দেয়, তার সবই (এই সব) পুস্তকে নিহিত। উপনিষদ ও ষড়দর্শনের তত্ত্ব, গ্রীসদেশের সক্রেটিস, প্লেটো ও আরিষ্টটল প্রভৃতি মহানুভবগণের চিন্তারাশি এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে যে

মনীষিগণ জন্মগ্রহন করেছেন, তাঁদের বাণী, সকলই (এই সব) পুস্তকের মধ্যে। তাঁরা যা দিয়ে গেছেন, তা অমূল্য সামগ্রী। আমরা সকলেই উত্তরাধিকারসূত্রে তার অধিকারী। ...প্রতিভাশালী ব্যক্তি ভাবসমুদ্র মন্থন ক'রে যে রত্ন আহরণ করেন, তাতে সকলের সমান অধিকার। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্মানী প্রভৃতি দেশের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি সকলের সাধারণ সম্পত্তি। তাই গ্রন্থকার ও বৈজ্ঞানিকগণ মহামান্য, জগৎকে তাঁরা মহা-ঋণপাশে আবদ্ধ ক'রে রেখে যান।'

গ্রন্থাগারের মাধ্যমে এই ঋণের বোঝা গ্রহণ ক'রেই সাধারণ পাঠক বা ছাত্রের আনন্দ। এ ঋণ কাকে পরিশোধ ক'রলে তবে ঋণমুক্ত হওয়া যায়? মুক্ত হওয়া যায় জাতির সেবায় সেই জ্ঞান কাজে লাগালে। তার জন্যেই গোড়ায় জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন; নইলে মন ক্রমে বিদেশী ভাবাপন্ন হ'য়ে বিদেশী সওদাগরের গোলামখানার চাকর হ'য়ে ওঠে। প্রফুল্লচন্দ্র বললেন: 'আমাদের মুস্কিল এই যে, পাঠ্যপুস্তক ছাড়া আর কিছু বড় কেউ পড়তে চায় না। তাই বলি, আমাদের কপাল পুড়ে গেছে। ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্ত্তনের সূচনা থেকে ছাত্রগণের একমাত্র চিন্তা হ'য়ে উঠেছে—কি ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উপাধি নেবো। তারপর উকীল, ডাক্তার, মাষ্টার, কেরাণী—এ ছাড়িয়ে যাবার আর যোগ্যতা নেই, কেবল দাসত্ব আর গতানুগতিকে গা ঢাল। স্বাধীন জীবিকা ব'লে যে একটা কথা আছে, শিক্ষিতদের সে ধারণা নেই। পোষ্ট্ অফিসের ছাপের মতো তাঁরা ইউনিভারসিটির ছাপটাকেই সার বুঝেছেন। য হোক্, এখন সুবাতাস ব'য়েছে, সময় এসেছে। তাই ধীরে ধীরে পাঠাগারের আদর বাড়ছে।'

১৯২০ থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে একথা বহুবার বহুভাবে বলেছেন প্রফুল্লচন্দ্র। গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি এমার্সনের নজির টেনে ব'লেছেন: "এমার্সন বলেন: গোলাপ বাগান কার?—আমার; আমার দেখে সুখ, চোখের তৃপ্তি, হৃদয়ের আনন্দ। বাগানের মালিক বেড়া বাঁধান, মালি রাখেন, জল সেচন করেন, সে অনেক কাণ্ড। কিন্তু অমন শোভা কাহারও একার নয়।' কারণ গোলাপের সার্থকতা ফুটে, সৌন্দর্য্যের বিকাশ ক'রে। আর সে সৌন্দর্য্য দর্শকমাত্রেই উপভোগ ক'রতে পারেন। কথাটি গ্রন্থাগার সম্পর্কেও সত্য। পাঠাগারের যাঁরা উদ্যোগী, তাঁরা পয়সার

জোগাড় ক'রবেন, জমি কিনবেন, ঘর তুলবেন ; তারপর উৎকৃষ্ট পুস্তকরাশি সংগ্রহ ক'রে জনসাধারণের হাতের কাছে এনে দেবেন। সে পুস্তকের অধিকার কারো একার নয়। পাঠকমাত্রেই তার সৌন্দর্য্যরস উপভোগ ক'রতে পারবেন। এই গ্রন্থশালা জ্ঞানলিপ্সুদের বড় আদরের জিনিষ।"

কিন্তু এই গ্রন্থশালার অর্থ কেবল মেম্বার বাড়িয়ে তাঁদের প্রাত্যহিক চাহিদামতো মাত্র নাটক নভেল পরিবেশন করাই নয় ; তাতে রসের জগৎ মধুক্ষরা হ'লেও জ্ঞানের জগৎ উন্মুক্ত হয় না। তার জন্য চাই জ্ঞানগর্ভ নানা বিষয়ক গ্রন্থ। সেই গ্রন্থ একদিকে যেমন সাধারণ পাঠকের তৃষ্ণা মেটাবে, অপর দিকে তেমনি জ্ঞানান্বেষি ও তথ্যসন্ধানী ছাত্রদের জীবনে সুহৃদের মতো কাজ ক'রবে। অথচ মজা এই যে, এই কিছুকাল আগে পর্যন্তও একমাত্র পাঠ্যপুস্তক ভিন্ন সাধারণ জ্ঞানমূলক গ্রন্থ পাঠের প্রবৃত্তি জনসাধারণের মধ্যে ছিল না। এদিক থেকে বাঙালীর চাইতে মাদ্রাজীরা অনেকটা অগ্রগামী ছিল। সেখানকার নটেশন্ কোম্পানীকে একদা দেখা গেছে—টেক্‌ষ্ট বুকের বদলে তাঁরা শুধু চিন্তাশীল পণ্ডিতদের বক্তৃতা, রাজনীতি, সমাজনীতি, মনীষীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রভৃতি প্রকাশ ক'রছেন। এ ব্যবসায়ে তাঁরা হ'টে যাননি, বরং প্রচুর লাভবান হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র উল্লেখ ক'রেছেন—people's library প্রভৃতি সংস্করণের অল্প দামের বই মাদ্রাজীরা বেশী কেনেন, বাঙালীরা বড় একটা কেনেন না। দুঃখের সঙ্গে তিনি বলেন : "ছেলেদের চিড়িয়াখানায় নিয়ে গেলে জীবজন্তু সম্বন্ধে কৌতূহল হ'তে পারে, এই ভেবে একখানা ছোট প্রাণীবিজ্ঞান লিখেছিলাম। কিন্তু বইখানা কয়েক বৎসর প'ড়ে রইল, কাটতি হ'লো না। কিছুকাল পরে জানিনা কেন সেখানা 'টেক্‌ষ্ট বুক কমিটি'র অনুমোদিত হ'য়ে গেল। একজন ইন্সপেক্টার পূর্ব্ব বাংলার একটা অঞ্চলের জন্য সেখানা পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিলেন ; ব্যস, একনিঃশ্বাসে সব বই বিক্রী হয়ে গেল।"

এই যেখানে অবস্থা, সেখানে লোকের জ্ঞানলিপ্সা ও রুচি সম্পর্কে কি মনে করা যেতে পারে ? যেকোনো ভালো গ্রন্থাগারেরই কর্তব্য হ'চ্ছে পাঠকের প্রচলিত এই রুচি পরিবর্তিত ক'রে তাঁর মধ্যে জ্ঞানানুশীলনের উন্মাদনা জাগিয়ে তোলা। প্রফুল্লচন্দ্র বললেন : 'উৎকৃষ্ট বিষয়ের অনুশীলন করতে লোকের যাতে প্রবৃত্তি বা রুচি জন্মে—তারই বন্দোবস্ত করবার জন্যে আমাদের

সচেষ্ট থাকতে হবে। লাইব্রেরীর যাঁরা প্রতিষ্ঠাতা, এই কার্যের ভার তাঁদেরই উপর বিশেষ ভাবে ন্যস্ত রয়েছে।'

লাইব্রেরীগুলির এই জাতীয় কর্তব্য পালনের অভাবে একদিকে যেমন জাতীয় শিক্ষা সম্প্রসারিত হ'য়ে এদেশীয় লোকেরা নিছক কেরানী হবার পরিবর্তে জীবনের বহুবিচিত্র ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, তেমনি বিশ্বের বহুতর জ্ঞানের দিকটা একেবারেই অন্ধকার থেকে যাচ্ছে। প্রফুল্লচন্দ্র উল্লেখ ক'রেছেন: অথচ 'ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে মুটে, মজুর, গাড়োয়ান কাগজ পড়ছে, রাজনীতি আলোচনা করছে। যারা মাটির নিচে খনিতে কাজ করে, তারাও পড়ে। চাকরাণী মেথরাণীও দেশের খবর রাখে। জাপানেও তাই। রবিবাবু বললেন—জাপানে তাঁর বাসার দাসী তাঁর গীতাঞ্জলির খবর রাখে। দেখুন এই সব যায়গায় জ্ঞানস্পৃহা কত ফলবতী। আর আমাদের দেশের দিকে চেয়ে দেখুন। যে বই কেনে, সে পড়ে না। আর যার পড়বার ইচ্ছা আছে, তার কেনবার পয়সা জোটেনা। তারপর বই চেয়ে নিয়ে গিয়ে ফেরৎ দেয় না—ওজর দেখায়, অমুক নিয়ে গেছে। এইরকমে দিন কতক কাটিয়ে দিয়ে শেষে বইখানার অস্তিত্ব বিলোপ ক'রে দেয়। এইরকম জঘন্য আচরণে লাইব্রেরী উজাড় হ'য়ে গেছে শুনেছি।'

এই প্রসঙ্গে তিনি শিবনাথ শাস্ত্রীর কথা উল্লেখ ক'রে লণ্ডনের লাইব্রেরীর রীতি সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছেন। লণ্ডনে পাঠাগারের প্রচলন দেখে শাস্ত্রীমশাই বিস্মিত হ'য়েছিলেন। তিনি লিখেছেন—

'আমি গিয়া দেখিলাম শিক্ষিত দেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগের মনে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উৎসাহ অতিশয় প্রবল। তাহার ফলস্বরূপ ঐ শ্রেণীর মানুষের মনে জ্ঞানস্পৃহা দিন দিন বাড়িতেছে এবং ব্যবহারের জন্য চারিদিকে অসংখ্য ছোট ছোট পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক রাজপথে দুইখানি বাড়ীর পরেই একটি ক্ষুদ্র পুস্তকালয়; নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা সেখানে নামমাত্র কিছু পয়সা জমা দিয়া সপ্তাহে সপ্তাহে বই লইয়া যাইতেছে ও ঘরে গিয়া বসিয়া পড়িয়া সে-পুস্তক আবার ফিরাইয়া দিতেছে। ইহার অনেক পুস্তকালয় দোকান-ঘরের মধ্যে। দোকানদার অপরাপর জিনিষের ব্যবসা করিতেছে, সেই সঙ্গে একপাশে একটি পুস্তকালয় রাখিয়া কিছু উপার্জন করিতেছে। ইহা ভিন্ন স্বল্পমূল্যে বিক্রেয় ব্যবহৃত পুস্তকের দোকান অগণ্য।

এইরূপ একটি পুস্তকালয়বিশিষ্ট দোকানে গিয়া একদিন যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম, তাহা মনে রহিয়াছে। আমি দোকানে অন্য কাজে গিয়া দেখি—একপার্শ্বে দুইটি আল্‌মারিতে কতকগুলি পুস্তক রহিয়াছে। মনে করিলাম পুস্তকগুলি স্বল্পমূল্যের ব্যবহৃত পুস্তক। জিজ্ঞাসা করিলাম—এসব পুস্তক কি বিক্রয়ের জন্য ?

উত্তর—না, এটা সার্কুলেটিং লাইব্রেরী।

আমি—এ সব পুস্তক কারা লয় ?

উত্তর—এই পাড়ার নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা।

আমি—আমি কি বই লইতে পারি ?

উত্তর—হ্যাঁ, পারেন, এ তো সাধারণের জন্য।

তারপর, আমি একখানি ৬।৭৲ টাকা দামের বই লইয়া দুই আনা পয়সা জমা দিয়া ও আমার নাম ও বাড়ীর ঠিকানা রাখিয়া আসিলাম। আবার সপ্তাহান্তে বই ফেরৎ দিয়া আবার দুই আনা দিয়া আর একখানি বই লইয়া আসিলাম। এইরূপ তিন চারি সপ্তাহের পর একদিন গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—এ ব্যবসা তোমরা কতদিন চালাইতেছ ?

উত্তর—গত ৮।৯ বৎসর।

আমি—মধ্যে মধ্যে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হও না ?

উত্তর—কিরূপে ?

আমি—লণ্ডনের মতো বড় সহরে মানুষ এক পাড়া হইতে আর এক পাড়ায় উঠিয়া গেলে খুঁজিয়া পাওয়া ভার। মনে করো যদি বই ফিরাইয়া না দিয়া কেহ এপাড়া হইতে উঠিয়া যায়, তাহা হইলে বই কি করিয়া পাইবে ?

এই প্রশ্নে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহারা বলিল—তা কি করিয়া হইতে পারে ? এ যে আমাদের বই ! উঠিয়া যাইবার সময় ফিরাইয়া দিতেই হইবে।

আমি—মনে করো যদি না দিই !

তাহারা হাসিয়া কহিল—'সে হইতেই পারে না।'—বই না দিয়া যে কেহ চলিয়া যাইতে পারে, ইহা যেন তাহাদের ধারণাই হয় না।

'আপনারা হাজারখানা বই নিয়ে লাইব্রেরী করুন, মাসিক চাঁদা দু'আনা। দেখবেন—মাসে মাসে অনেক বই ফাঁক হয়ে যাবে।'

বিলেতের তুলনায় এ দেশের লাইব্রেরী সম্পর্কে এত বড় অপ্রিয় সত্য আর

নেই। তার জন্য লোকচরিত্র সংশোধন আমাদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির আর একটি বড় কাজ। যতক্ষণ না এ দেশের লাইব্রেরীগুলি সে কাজের ভার নিয়ে দাঁড়াতে পারছে, ততক্ষণ জনসাধারণের মধ্যে শুধু গ্রন্থপাঠ ও গ্রন্থ-পরিবেশনের দ্বারা কোনো মহৎ কর্মই সাধিত হবে না। এ দেশকে বড় হ'তে হ'লে ডিগ্রীর মোহ ত্যাগ ক'রে জনসাধারণকে যেমন প্রকৃত শিক্ষার পথে আসতে হবে, তেমনি এখানকার বিদ্যালয়গুলিই মাত্র যথেষ্ট নয়, এখানকার গ্রন্থাগারগুলিকেও অনেক বেশী সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে—যাতে জনসাধারণের রুচি পরিবর্তিত হ'য়ে তাদের জীবনে মহত্তের স্পর্শ ঘটে। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান প্রসঙ্গে এই কথাটিই আমাদের কাছে বড় ক'রে তুলে ধ'রেছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র॥

।। স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য ।।

জগতের বিচিত্র রহস্য ও জীবনের গভীরতম উপলব্ধিকে যিনি ভাষায় রূপায়িত ক'রে তোলেন, তাঁকেই আমরা কবি ব'লে অভিহিত করি। আর কবিমানসিকতার দ্বারা আমরা শুধুমাত্র কাব্যপ্রকাশই বুঝি না, সেই সঙ্গে জীব-জগতের প্রত্যক্ষ সত্যোপলব্ধি ও তার অভিব্যক্তিও বুঝি। এই সত্যোপলব্ধি ও তাব অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে কবিকে আমরা ব'লে থাকি সাধক ও ঋষি। এদিক থেকে সাধক বিবেকানন্দকে বিচার করলে তাঁকে ঋষি ভিন্ন আর কোনো নামেই আমরা তাঁর সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারি না। জগৎ-রহস্য ও জীবন-রহস্যের বিচিত্র দিকগুলি তাঁর ভাবতরঙ্গে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে এবং সেই তরঙ্গ-স্পর্শে তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগৎকে বহু যুগের কুসংস্কার ও ধ্যান-ধারণা থেকে নতুন চেতনায় উদ্বোধিত ক'রেছেন। যখন পাশ্চাত্যের জড়বাদী শিক্ষার বাইরে স্বদেশে ও বিদেশে কোনো অন্যতর শিক্ষানুভূতি দেখা দেয়নি, সেইকালে চিকাগোর ধর্মসভায় ভারতীয় বেদান্ত ব্যাখ্যা ক'রে তিনি জগৎকে চমকিত ক'রে দিলেন। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের এই বৈদান্তিক অনুভূতির আলোকেই ফরাসী দার্শনিক ভিক্টর কুঁজো একসময় ব'লেছেন: 'আমরা যখন ভারতের দার্শনিক গ্রন্থসকল পাঠ করি, তাদের মধ্যে এমন সুগভীর সত্য দেখতে পাই এবং সেগুলি য়ুরোপের প্রতিভার এত ঊর্ধ্বে এত বিস্ময়কর যে, ভারতের দর্শনের কাছে নতজানু হ'তে বাধ্য হই।'

স্বামীজী ছিলেন এই দার্শনিক ভাবমানসিকতার ধারক ও বহির্বিশ্বে ভারত-সংস্কৃতির বাণীবাহক। তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে একসময় রোমাঁ রোলাঁকে রবীন্দ্রনাথ বলেন: 'If you wish to know India, study Vivekananda. In him everything is positive and nothing negative.' তিনি ছিলেন একদিকে বৈদিক ভারতের বেদব্যাস ও ব্রাহ্মণ্য ভারতের শঙ্করাচার্য। ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ধ্যান-ধারণাকে তিনি নবভাবে রূপায়িত ক'রে গেছেন। তিনি সেই অর্থে কবি—যে অর্থে কাব্য-মাধুর্যে তিনি সমস্ত জাতিকে শ্রীমণ্ডিত ক'রে গেছেন, আবার সেই অর্থে ঋষি—যে অর্থে ধর্মে, জ্ঞানে ও কর্মে তিনি সমগ্র দেশকে উদ্বোধিত ক'রে

গেছেন, আবার সেই অর্থে শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক—যে অর্থে নতুন শিক্ষাদর্শ প্রবর্তন এবং ভাষা ও সাহিত্য-ব্যঞ্জনায় জাতীয় সাহিত্যকে উন্নীত ও গৌরবান্বিত ক'রে গেছেন।

তাঁর বাংলা রচনাবলী আয়তনে অল্প, সন্দেহ নেই, তবু তার মধ্যেই তাঁর প্রকাশভঙ্গীর লালিত্য ও শব্দসৌকুমার্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া র'য়েছে। তার প্রত্যেকটিকেই স্বতন্ত্রভাবে এক একখানি পূর্ণাঙ্গ কাব্য ব'লে অভিহিত করা চলে। তবে তাঁর যে শ্রেণীর জীবনযাত্রা ছিল, তাতে সাহিত্য রচনা করতে হবে ব'লে সাহিত্য করার মতো অবকাশের একেবারেই অভাব ছিল, দ্বিতীয়তঃ 'Art for Art sake'-এর তিনি পক্ষপাতীও ছিলেন না, তাঁর জীবনবোধের সঙ্গেই সাহিত্য ছিল অঙ্গাঙ্গীসূত্রে গাঁথা।

সেই জীবনবোধে প্রধান হ'য়ে দেখা দিয়েছিল স্বজাতিহিতৈষণায় উদ্বুদ্ধ স্বদেশপ্রেম। তবু সাহিত্যকেন্দ্রানুগ তাঁর ধ্যান-ধারণা ও শিল্পচিন্তার যেটুকু পরিচয় আমাদের কাছে জ্ঞাত, তা আমরা প্রধানতঃ পাই তাঁর 'বর্তমান ভারত,' 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'ভাববার কথা' এবং কবিতা ও পত্রাবলীতে। বহুজনহিতায় চ বহুজনসুখায় চ তিনি অনলস জীবনযাত্রার পথে-পথে যে মননসম্পদ আহরণ ক'রেছেন, তাকেই তিনি ভাষায় রূপ দিয়েছেন। তাঁর রচনার প্রারম্ভিককালে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রকে যেভাবে প্রভাবিত ও আচ্ছন্ন ক'রেছিলেন, তাতে বিবেকী ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গীর উপর তাঁর প্রভাব পড়া অত্যন্তই স্বাভাবিক ছিল কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, রচনার স্টাইল ও ভিকসনে বিবেকানন্দ সর্বদা আপন স্বকীয়তায় ভাস্বর ছিলেন। কথ্যভাষায় গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচনা সর্বপ্রথম বিবেকানন্দের লেখনীদ্বারাই সম্ভব হ'য়েছিল। তাঁর 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'ভাববার কথা'র নানা অংশ জুড়ে তার উজ্জ্বল উদাহরণ র'য়েছে। বাংলা কথ্যভাষায় যে অফুরন্ত শব্দসম্পদ র'য়েছে, একথার উল্লেখ ক'রে ১৯০০ সালে 'উদ্বোধন' পত্রের সম্পাদককে লিখিত এক পত্রে স্বামীজী বলেন : "স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ, ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না, সেই ভাব, সেই ভঙ্গী, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও, সেদিকে ফেরে, তেমন তেমন

কোন তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেন সাফ ইস্পাত, মুচ্ড়ে মুচ্ড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল নকল ক'রে অস্বাভাবিক হ'য়ে যাচ্ছে।"...

'পরিব্রাজকে' তিনি নিজেই বাংলার প্রচুর চল্তি বুলি ও প্রবচন ব্যবহার করেছেন, যেমন—'গায়ে মানে না আপনি মোড়ল', 'টালমাটাল', 'ডম্ফ', 'গদাইলস্করি', 'ছুঁচোর গোলাম চামচিকে' ইত্যাদি। ভাষার মাঝে মাঝে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ শব্দ ব্যবহার ক'রে তিনি ভাষাকে ওজস্বিনী ও বলিষ্ঠ ক'রে তুলতেও কম প্রয়াস পাননি। এই প্রসঙ্গে 'পরিব্রাজকের' একটি অংশ উদ্ধৃতিযোগ্য, যেমন—"আযবাপগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিন-রাতই কর, আর যতই কেন তোমরা ডম্মম্ ব'লে ডম্ফই কর, তোমরা হচ্ছো দশ হাজার বছরের মমি!! যাদের চলমান শ্মশান বলে তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ঘৃণা করেছেন, ভারতের যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর চলমান শ্মশান হচ্ছো তোমরা।..এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা! তোমরা ভূতকাল, লুঙ লঙ লিট সব একসঙ্গে। বর্তমান কালে তোমাদের দেখছি বলে যে বোধ হচ্ছে, ওটা অজীর্ণজনিত দুঃস্বপ্ন! ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য, তোমরা ইৎ-লোপ-লুপ্। স্বপ্নরাজ্যের লোক তোমরা, আর দেরী ক'রচো কেন? ভূত-ভারত-শরীরের রক্তমাংসহীন কঙ্কালকুল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হ'য়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছো না?...তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধ'রে চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপ্ড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদীর দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে,—তাই পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখভোগ করেছে, তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরে না, এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচারবল যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ

ক'রে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম !! অতীতের কঙ্কালচয়, এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মাণিক্যের আংটি, ফেলে দাও এদের মধ্যে যত শীঘ্র পার ফেলে দাও; আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো; তোমার যেই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটি জীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন-ধ্বনি, ওয়াহ্ গুরু কি ফতে।"

স্বামীজীর কোনো কোনো রচনায় স্যাটায়ারও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশে যেখানে ধর্ম লোকাচারে পর্যবসিত হয়েছে এবং অনুশাসনের চাইতে লোকের কাছে লোকাচারের মর্যাদাই বড়, এই অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত ক'রতে গিয়ে 'ভাববার কথা'য় বিবেকানন্দ বলেছেন : "সনাতন হিন্দু ধর্মের গগন-স্পর্শী মন্দির—সে মন্দিরে নিয়ে যাবার রাস্তাই বা কত ! আর সেথা নাই বা কি? বেদান্তীর নির্গুণ ব্রহ্ম হ'তে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সুয্যিমামা, ইঁদুর-চড়া গণেশ আর কুচ দেবতা ষষ্টি, মাকাল প্রভৃতি নাই কি? আর বেদ-বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ তন্ত্রে ঢের মাল আছে, যার এক একটা কথায় ভববন্ধন টুটে যায়। আর লোকেরই বা ভিড় কি, তেত্রিশ কোটি লোক সেইদিকে দৌড়েছে। আমারও কৌতূহল হলো, আমি ছুটলুম। কিন্তু গিয়ে দেখি, এ কি কাণ্ড! মন্দিরের মধ্যে কেউ যাচ্ছে না, দোরের পাশে একটা পঞ্চাশমুণ্ড, একশত হাত, দু'শ পেট, পাঁচশ ঠ্যাঙওয়ালা মূর্তি খাড়া। সেইটার পায়ের তলায় সকলেই গড়াগড়ি দিচ্ছে। একজনকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলুম যে, ওই ভেতরে যে সকল ঠাকুর দেবতা, ওদের দূর থেকে একটা গড় বা দুটি ফুল ছুঁড়ে ফেললেই যথেষ্ট পূজা হয়। আসল পূজা কিন্তু এঁর করা চাই—যিনি দ্বারদেশে, আর ঐ যে বেদ-বেদান্ত, দর্শন, পুরাণশাস্ত্র সকল দেখছো, ও মধ্যে মধ্যে শুনলে হানি নাই, কিন্তু পালতে হবে এর হুকুম। তখন আবার জিজ্ঞাসা করলুম—তবে এ দেবদেবের নাম কি? উত্তর এলো—এর নাম লোকাচার।"

সমাজের প্রতি এর চাইতে শ্লেষাত্মক ব্যঙ্গ আর কি হ'তে পারে? অথচ প্রকাশে জ্বালা নেই, কেবল জন উপলব্ধিতে সেই জ্বালার তীব্রতা।

রচনায় তিনি যেমন চলিত ভাষা ব্যবহার ক'রেছেন, তেমনি ক্ষেত্র-বিশেষে

গৌড়ীয় রীতিও অনুসরণ ক'রেছেন। এবং উভয় ক্ষেত্রেই ভাষা তাঁর ভাবের অনুসারী হ'য়েছে। তাঁর 'বর্তমান ভারত' বাংলা সাহিত্যের এক অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। বিবেকানন্দের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বিশ্লেষণ শক্তি ও দিব্যদৃষ্টির পরিচয় আছে এই গ্রন্থের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে। বিশেষ ক'রে ভাষার যে পরিমিতিবোধ সাহিত্যের উচ্চতম গুণ, 'বর্তমান ভারত' তার উজ্জ্বল নিদর্শন। এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই চার বর্ণই ক্রমিক পর্যায়ে পৃথিবী ভোগ করে। পৃথিবীর নানা দেশের ইতিহাস পর্যালোচনা ক'রে বিবেকানন্দ এই সিদ্ধান্তেই এসেছিলেন। তেমনি ভারতবর্ষেও ক্রমে ব্রাহ্মণ্যশক্তি, ক্ষাত্রশক্তি ও বৈশ্যশক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। বৈদিক ঋষির আধিপত্যের অবসানে এদেশে যে ক্ষাত্রশক্তির অভ্যুত্থান হয়, সে সম্পর্কে তিনি ব'লেছেন, "রাজশক্তিরূপ মহাবল যজ্ঞাশ্ব আর পুরোহিত হস্তধৃত দৃঢ়-সংযত রশ্মি নহে; সে এবার আপন-বলে স্বচ্ছন্দচারী। এযুগের শক্তিকেন্দ্র সামগায়ী, যজুর্যাজী পুরোহিতে নাই, রাজশক্তিও ভারতের বিকীর্ণ ক্ষত্রিয়বংশ সম্ভূত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীপতিতে সমাহিত নহে; এ যুগের দিগ্‌দিগন্তব্যাপী, অপ্রতিহত শাসন, আসমুদ্র ক্ষিতীশগণই মানবশক্তিকেন্দ্র। এ যুগের নেতা আর বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ নহেন, কিন্তু সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত, ধর্মলোক প্রভৃতি।"

রচনায় সমাসবদ্ধ পদের জন্য হয়তো সর্বসাধারণের পক্ষে স্থানে স্থানে অর্থোদ্ধার কঠিন হ'য়ে পড়বে, কিন্তু স্বল্পবাক্যের দ্বারা অধিকতর ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে এরকম সমাসবদ্ধ শব্দ ব্যবহার ভিন্ন দ্বিতীয় পথ নেই। অন্যত্র ভারতে বৈশ্যশক্তির অভ্যুত্থান সম্পর্কে বিবেকানন্দ লিখেছেন: "যে নূতন মহাশক্তির প্রভাবে মুহূর্তমধ্যে তাড়িৎপ্রবাহ এক মেরুপ্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে বার্তা বহন করিতেছে, মহাচলের ন্যায় তুঙ্গ-তরঙ্গায়িত মহোদধি যাহার রাজপথ, যাহার নির্দেশে একদেশের পণ্যচয় অবলীলাক্রমে অন্যদেশে সমানীত হইতেছে এবং যাহার আদেশে সম্রাড়কুলও কম্পমান, সংসার সমুদ্রের সর্বজয়ী এই বৈশ্যশক্তির অভ্যুত্থানরূপ মহাতরঙ্গের শীর্ষস্থ শুভ্র ফেনরাশির মধ্যে ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত।—অতএব ইংলণ্ডের ভারতাধিকার বাল্যে শ্রুত ঈশামসি বা বাইবেল পুস্তকের ভারত জয়ও নহে, পাঠান-মোগলাদি সম্রাড়গণের ভারত-বিজয়ের ন্যায়ও নহে। কিন্তু ঈশামসি, বাইবেল, রাজপ্রাসাদ, চতুরঙ্গিনীবলের ভূকম্পকারী পদক্ষেপ, তুরীভেরীর নিনাদ, রাজসিংহাসনের বহু আড়ম্বর,

এসকলের পশ্চাতে বাস্তব ইংলণ্ড বিদ্যমান। সে ইংলণ্ডের ধ্বজা কলের চিম্‌নি, বাহিনী—পণ্যপোত, যুদ্ধক্ষেত্র—জগতের পণ্যবীথিকা এবং সম্রাজ্ঞী—স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী।"

এ ভাষা এবং এ কথা বজ্রদীপ্ত পুরুষ বিবেকানন্দেরই উপযোগী ভাষা ও কথা। অন্যত্রও তাঁর উদাত্ত ধ্বনি আমাদের সচকিত করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সংঘর্ষে বাঙালীমন যে ভাবে উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে, তারই ভিত্তিতে তিনি লেখেন: "একদিকে প্রত্যক্ষ শক্তি সংগ্রহরূপ প্রমাণ বাহন, শত সূর্যজ্যোতিঃ আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টি প্রতিঘাতী প্রভা, অপরদিকে স্বদেশী বিদেশী বহু মনীষী উদ্ঘাটিত, যুগ যুগান্তরের সহানুভূতিযোগে সর্বশরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী, বলদ, আশাপ্রদ, পূর্বপুরুষদিগের অপূর্ব বীর্য, অমানব প্রতিভা ও দেবদুর্লভ অধ্যাত্মতত্ত্ব কাহিনী। একদিকে জড় বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূত বলসঞ্চার, তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ, বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে; অপরদিকে এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া ক্ষীণ অথচ মর্মভেদী স্বরে পূর্বপুরুষদিগের আর্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গী অপূর্ব বাসনার উদয় করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া ব্রত, উপবাস, সীতা, সাবিত্রী, তপোবন, জটাবল্কল, কষায়, কৌপীন, সমাধি, আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে। একদিকে পাশ্চাত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, অপরদিকে আর্যসমাজের কঠোর আত্মবলিদান। এ বিষম সঙ্ঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? পাশ্চাত্য উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিদ্যা, উপায়—রাষ্ট্রনীতি। ভারতের উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায়—ত্যাগ।"

এই অকাট্য যুক্তি তৎকালীন বঙ্গসমাজের বহু বিদগ্ধ ব্যক্তিকেই আলোড়িত করেছে এবং আজও আমাদের কাছে সেই ইতিহাসের সত্যতা উপস্থাপিত ক'রে আমাদের চমকিত করে।

গদ্য ব্যতীত বিবেকানন্দ বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজিতেও বহু কবিতা রচনা করেছেন। সেই কবিতাবলী পরে 'বীরবাণী' নামে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর ইংরেজি কাব্যের দু'একটি কবিতা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক অনূদিত হয়। তাঁর বাংলা কবিতায় অধিকাংশই অধ্যাত্ম সুরের উপর ভিত্তি ক'রে রচিত। কেবল

'সখার প্রতি' কবিতাটিতে তাঁর 'আত্মদর্শন' বা 'আত্ম জিজ্ঞাসা'র সঙ্গে আমরা প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হই। তিনি লেখেন—

"বিদ্যা হেতু করি প্রাণ পণ, অর্ধেক ক'রেছি আয়ুক্ষয়--
প্রেমহেতু উন্মাদের মত, প্রাণহীন ধ'রেছি ছায়ায়,
ধর্ম তরে করি কত মত, গঙ্গাতীর শ্মশান আলয়,
নদীতীর পর্বত গহ্বর, ভিক্ষাশনে কত কাল যায়।
অসহায়—ছিন্নবাস ধ'রে দ্বারে দ্বারে উদর পূরণ
ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে কি ধন করিনু উপার্জন?"

কিন্তু তখনই তিনি বুঝতে পারলেন—

"ভ্রান্ত সেই যে বা সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ সে জন,
মৃত্যু মাগে সেও যে পাগল, অমৃতত্ত্ব বৃথা আকিঞ্চন।"

এতদ্ব্যতীত বীর ও মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে তিনি যে কাব্য রচনা করেন, তা আজও বাঙালী মাত্রকেই অনুপ্রাণিত ও উদ্বোধিত করে। যেমন—

"জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার, এ সব ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার প্রেতভূমি চিতামাঝে।
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক্ স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।"

অন্যত্র জীবপ্রেমের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর-সেবার সার্থকতায় দেশবাসীকে আহ্বান ক'রে তিনি বললেন—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

জীবই শিব। জীবের দুঃখ দূর ক'রে জীবের সেবা ক'রে যে মানুষ নিজেকে ভুলতে পারে, সেই একমাত্র ঈশ্বরকে লাভ করে, কারণ দরিদ্রের পর্ণকুটিরেই ঈশ্বরের অবস্থিতি। জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করার আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্যেই ১৮৯৭ সালের ১লা মে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করলেন এবং ক্রমে সন্ন্যাসী সঙ্ঘ গড়ে তুললেন। তার মূল উৎস তাঁর গুরু পরমহংসদেবের উপদেশ। বিবেকানন্দ যখন তাঁর কাছে নির্বিকল্প সমাধি চেয়েছিলেন, গুরু তখন বললেন: 'এখন না, তোকে যে লোকশিক্ষা দিতে হবে; খালি নিজের চিন্তাই করছিস, কিন্তু এই দুর্ভাগা দেশের আপামর

সাধারণের চিন্তা কে করবে ?' সঙ্গে সঙ্গে আত্মচিন্তা থেকে জগৎ-চিন্তায় মগ্ন হ'য়ে গেলেন বিবেকানন্দ, আপন মনেই একবার উচ্চারণ করলেন: 'জগদ্ধিতায়।' জগতের সেবার জন্যই তিনি বেরিয়ে পড়লেন পথে, ভ্রমণ করলেন সারা ভারত ও পৃথিবীর বহু দেশ। দেখলেন—কী নিদারুণ দারিদ্র্য-ক্লিষ্টতার মধ্যে সারা ভারত নিমজ্জিত হয়ে আছে! গোটা ভারতবর্ষ রোগে, দারিদ্র্যে, অনাহারে এবং অর্ধাহারক্লিষ্টতায় প্রতি মুহূর্তে ধুকছে। এই দীন দরিদ্র তেত্রিশ কোটি (তখন জনসংখ্যা তেত্রিশ কোটিই ছিল) ভারতবাসীকে লক্ষ্য ক'রে তাঁর শিষ্যবৃন্দ ও যুবকদের আহ্বান ক'রে তিনি বললেন—

—"এই গরীব নিরক্ষর মানুষগুলি কি সরল! তোমরা কি ইহাদের কণামাত্রও দুঃখ লাঘব করিতে পারিবে না? যদি না পার, তবে গেরুয়া পরিয়া লাভ কি? তাই আমি মাঝে মাঝে খুবই ভাবি—মঠ, আশ্রম প্রভৃতি গড়িয়া লাভ কি? সেগুলি বিক্রয় করিয়া টাকা পয়সা গরীবদের মধ্যে, দুঃস্থ নারায়ণের মধ্যে বিলাইয়া দিলে হয় না? দেশের লোকের মুখে যখন অন্ন নাই, পরনে যখন বস্ত্র নাই, তখন আমরা মুখে গ্রাস তুলি কেমন করিয়া? ইহাদের দুঃখ-দারিদ্র্য দেখিয়া আমি ভাবি—কি কাজ এই সব শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া? এই সব মূর্তির সম্মুখে বাতি ঘুরাইয়া উপাসনার বাহ্যাড়ম্বর করিয়া? কি কাজ পাণ্ডিত্যে, কি কাজ শাস্ত্রপাঠে, কি কাজ ব্যক্তিগত মুক্তির লোভে সাধনায়? এসব ফেলিয়া গ্রামে গ্রামে যাই, দরিদ্রের সেবায় জীবন দিই, আমাদের উন্নত চরিত্র, আধ্যাত্মিক শক্তি এবং সংযত জীবনযাত্রার মধ্য দিয়া ধনীদিগকে দরিদ্রের প্রতি তাহাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলি, অর্থসংগ্রহ করিয়া কিম্বা অন্য উপায়ে দীন-দুঃখীর সেবা করি। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে দীন-দুঃখীদের কথা কেহই চিন্তা করে না। যাহারা জাতির মেরুদণ্ড, যাহারা খাদ্য উৎপন্ন করে, তাহাদের জন্য আমাদের দেশে কে সহানুভূতি দেখায়, তাহাদের সুখে দুঃখে কে-ই বা অংশ লয়? তোমাদের সকল শক্তি একত্রিত কর। আমি দিবালোকের মতো একেবারে স্পষ্ট দেখিতেছি —সেই একই ব্রহ্ম, একই শক্তি—তিনি আমাদের মধ্যে আছেন, তিনি তাহাদের মধ্যেও আছেন। শুধু প্রকাশের তারতম্য—এইমাত্র। নিশ্চয় জানিও, যে দেহের একটি অঙ্গ পঙ্গু, সে দেহের দ্বারা কোনও শ্রেষ্ঠ কাজ কখনও

সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না। এত তপস্যা করিয়া এই সত্যটুকু আমি জানিয়াছি যে, তিনি' সকলের মধ্যেই আছেন। ইহারা সকলেই 'তাঁহার' বহুরূপে প্রকাশ মাত্র। আর, অন্য কোনও ভগবানের সন্ধান করিতে হইবে না। যে সকলের সেবা করে, কেবল সেই ভগবানের প্রকৃত পূজা করে। সকল মানুষই সমান, সকলেই সেই একই ভগবানের সন্তান, সকলের মধ্যেই সেই একই ভগবান রহিয়াছেন। আর কোনও ভগবান নাই। যে ভগবানের সেবা করিতে চায়, তাহাকে মানুষের সেবা করিতে হইবে, এবং প্রথমে হীনতম, দীনতম, পতিততম মানুষের সেবা করিতে হইবে; সব বাধাবিঘ্ন ভাঙ্গিয়া ফেল। অস্পৃশ্যতার, অমানুষিকতার জবাব দাও। দুই বাহু প্রসারিত করিয়া মহানন্দে গাহিয়া উঠ: এস, এস আমার ভাই। এস দরিদ্র, এস নিঃস্ব। এস নিপীড়িত, এস নিষ্পেশিত। রামকৃষ্ণের নামে আমরা অভিন্ন, আমরা এক।"

বিবেকানন্দের ধর্মীয় অভিজ্ঞতা বলতে আমরা একেই বুঝি। তিনি যে কখনও সাহিত্য রচনা ক'রতে হবে ব'লে সাহিত্য ক'রেছেন, এমন নয়। তাঁর ধর্মীয় অনুভূতির মধ্যে সবকিছুই এসে আশ্রয় নিয়ে'ছিল। সেখানে সমাজ, রাষ্ট্র, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার মতো দেশীয় সংস্কার, চরিত্র গঠন, স্ত্রীশিক্ষা, শিক্ষার বাহন, ভাষা সমস্যা, সাহিত্য, কাব্য, দর্শন ও ইতিহাস—সবই একসঙ্গে এসে মিলেছিল। এখানে তিনি এক বিরাট সমুদ্রের সঙ্গেই মাত্র তুলনীয়। সব দিক থেকে সব নদী এসে এই সমুদ্রে মিশেছে।

মাতৃভাষাই .য শিক্ষার একমাত্র বাহন হওয়া উচিত, একথা নিয়ে ইদানীন্তনকালে নানা মুনির নানা মত ব্যক্ত হ'চ্ছে এবং কখনও কখনও তা নিয়ে বিতর্ক ধূমায়িত হ'য়ে উঠচে। কিন্তু বহু পূর্বেই এ সম্পর্কে নিজস্ব মত ব্যক্ত ক'রে গেছেন বিবেকানন্দ। বিশেষ ক'রে সাধুভাষার ও কথ্যভাষার দ্বন্দ্ব নিয়ে দীর্ঘকাল ধ'রে বাংলা সাহিত্যে যে দ্বন্দ্ব চলে এবং প্রধানতঃ প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ পত্র'কে কেন্দ্র ক'রে যে কথ্যভাষার সাহিত্য গড়ে ওঠে, তৎসম্পর্কেও বহু পূর্বেই বিবেকানন্দ তাঁর 'ভাববার কথা'য় ব'লেছিলেন: "চলতি ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈয়ার ক'রে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর, তবে লেখবার বেলা ও একটা কি

—কিম্ভূতকিমাকার—উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় ত নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও সকল তত্ত্ববিচার কেমন ক'রে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ, ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গী, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন কোন তৈয়ারি ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে যেন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতর গদাইলস্করী চাল—ঐ এক চাল—নকল ক'রে অস্বাভাবিক হ'য়ে যাচ্ছে।"

সে যুগে এমন ক'রে কথ্যভাষাকে বাঙ্গালীর মনে কেউ ধরিয়ে দেয়নি। অথচ স্বাভাবিক বিচারে যেহেতু বিবেকানন্দ শিক্ষকতাকার্যে বা সম্পূর্ণভাবে সাহিত্যকর্মে নিযুক্ত ছিলেন না, এবং যেহেতু তিনি তাঁর অধিকাংশ রচনা ও বক্তৃতাবলী ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই ক'রেছেন, সেই হেতু তাঁর স্বরচিত এই সব অত্যাবশ্যকীয় কথা দেশবাসী উদ্ধার করবার সুযোগ পায়নি এবং পেলেও তাকে বৃহত্তর সমাজে রূপ দেবার মতো প্রবৃত্তিলাভ করেনি। ফলে বিবেকানন্দর যে ক'খানি বাংলা গ্রন্থ এই শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়, বিগত ষাট বছর কালের মধ্যেও এদেশে তার ব্যাপক পঠন-পাঠন সম্ভব হয়নি। এখনও যে হচ্ছে, একথা বলবো না, তবে অনেকে বিবেকানন্দকে নতুন ক'রে বুঝতে চেষ্টা করছেন এবং এর দ্বারা ক্রমে যে বৃহত্তর জনসাধারণের মনে তাঁর চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গী ও বাণী অনুপ্রবেশের সুযোগ ঘটবে, তাতে সন্দেহ নেই॥

॥ জনসেবা, জনস্বার্থ ও গণভোট ॥

জনসেবা বলতে আমরা কি বুঝি? জনগণের সর্ববিধ কল্যাণের পথে তার সহায়ক হওয়া, এই তো জনসেবার মূল কথা। জনগণের খাদ্য, বাসস্থল, আর্থিক মান, ব্যাধি, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সংস্থিতি, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষা, নিরাপত্তা প্রভৃতি অবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হ'য়ে যিনি মানুষের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ ক'রতে সক্ষম হন, তাঁকেই চল্‌তি কথায় আমরা জনসেবক ব'লে আখ্যায়িত ক'রে থাকি। সেবার দিক দিয়ে এর বাইরেও কতকগুলি নীতির দিক আছে। যেমন -রুচিশীলতা, সুষ্ঠু জীবনযাত্রা, শালীনতা, সাংস্কৃতিক মানোন্নয়ন প্রভৃতি। সেবার মধ্য দিয়ে এগুলোকে ক্রমিক উন্নতির পথে তুলে ধরা যায়। এর কোন্‌টা আগে কোনটা পরে, সে কথা অবান্তর। যে রুগী, তাকে যেমন শুশ্রূষা দিয়ে, পথ্য দিয়ে সুস্থ ক'রে তুলতে হবে, তুলতে হবে স্বাস্থ্যবান ক'রে, তেম্‌নি একই সঙ্গে তাকে রুচিশীল ক'রে তোলারও প্রয়োজন আছে। সমাজে এমন বহুলোক আছে, যাদের অর্থের অভাব নেই, কিন্তু দেখা যায়—তাদের অনেকেরই হয়তো রুচি নেই বা চরিত্র নেই। নীতিগত সেবার মধ্য দিয়ে এর পরিবর্তন হ'তে পারে।

কিন্তু প্রচলিত অর্থে সাধারণতঃ এ কাজকে কেউ সেবাগতভাবে দেখে না। সেবা অর্থে আমরা বুঝে নিয়েছি এমন কতকগুলো কাজ—যার উল্লেখ গোড়াতেই ক'রেছি। জনসেবা মানেই সমাজ-সেবা, দেশ সেবা। সমাজ বা দেশ তো ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে নয়। সমাজ ও দেশের উন্নতি মানে তার অধিবাসীদেরই উন্নতি। যখন কোনো নদীতে বাঁধ দেবার বা কোনো খাল খননের প্রয়োজন হয়, তখন সেই প্রয়োজন মানুষকে কেন্দ্র ক'রেই দেখা দেয়। মানুষের প্রয়োজনে মানুষের সেবার জন্যেই নদীতে বাঁধ দিতে হয়, আবার দরকার মতো খালও খনন ক'রতে হয়। সুতরাং সেবা কথাটি বহু-ব্যাপক সন্দেহ নেই। এই ব্যাপতাকে যাঁরা লালন করেন, এই ব্যাপক কল্যাণে যাঁরা জীবন ব্যয় করেন, তাঁরাই প্রকৃত সেবক। তাঁদের দেশ সেবক বলুন, সমাজ-সেবক বলুন, আসলে তাঁরা দুইয়েরই সেবক, প্রকৃত জনসেবক তাঁরা।

এই সেবাকার্যকে কে কতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন ক'রতে পারেন, সেইটাই প্রশ্ন। প্রশ্ন এই কারণে যে, কর্মী আর সেবকের মধ্যে পার্থক্য আছে। যে কোনো মানুষই কর্মী হ'তে পারে, কিন্তু সকলেই সেবক হ'তে পারে না। সেবক হ'তে হ'লে কতকগুলো বিশিষ্ট গুণের অধিকারী হ'তে হয়। যেমন—নিষ্ঠাবান, নির্মলচিত্ত, সৎচরিত্র ও সৎভাবাপন্ন। সর্ববিধ স্বার্থত্যাগ ও আত্মশুদ্ধির মধ্য দিয়েই সেবাকার্য গ'ড়ে ওঠে। জীবের প্রতি জীবন উৎসর্গই হ'চ্ছে সেবা। স্বামীজী ব'লেছেন—'জীবই শিব, জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' জনস্বার্থের জন্যই আত্মস্বার্থ বলির প্রয়োজন হয়। আবার জনসেবাই আত্মসেবা।

ধরা যাক, কোনো অনুন্নত ক্ষেত্রকে উর্বর ক'রে সর্ববিধ কল্যাণকর কাজে হাত দেওয়া হলো; স্কুল তৈরী হলো, ডাকঘর বসলো, কারিগরি শিল্প গ'ড়ে উঠলো, চ্যারিটেবল হাসপাতাল থেকে রুগীদের জন্যে ওষুধের ব্যবস্থা হলো। এর দ্বারা স্থানীয় অধিবাসীদের প্রভূত উপকার হ'লো সন্দেহ নেই। যিনি সেবক, যিনি এতকিছু গ'ড়ে তুলবার মূলে, এর দ্বারা তাঁর নিজেরও উপকার হ'লো বৈকি! কারণ তিনিও তো ঐ অধিবাসীদেরই একজন! সকলের ভাগ্যের সঙ্গে তাঁর নিজের ভাগ্যও জড়িত।

এই ভাবে আপাতদৃষ্টিতে যেটা জনস্বার্থ ব'লে মনে হয়, সেটা মূলতঃ আত্মস্বার্থও বটে। কিন্তু এ স্বার্থে সম্ভোগ নেই। এখানে কবির ভাষায় 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

পরের জন্য না হ'লে নিজের জন্য হওয়া যায় না। পরকে স্বীকার করা মানেই নিজেকে স্বীকার করা। কোনো ব্যক্তিবিশেষের মূল্য নেই—যদি না সে সমষ্টির হ'য়ে কাজ ক'রে পুরোপুরি সমষ্টির হ'চ্ছে। কোনো শিল্পী যখন ছবি আঁকে, তখন সে সমষ্টির আনন্দের উদ্দেশ্যেই আঁকে। নিজের তৃপ্তির সঙ্গে সমষ্টির তৃপ্তি মিশিয়ে তবে সে সার্থক হয়। তেমনি, গ্রামে যদি দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় কিংবা প্লাবন আসে, অথবা অগ্নিকাণ্ড ঘটে, তখনও যিনি সেবক, তিনি জনস্বার্থে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে একই সঙ্গে আত্মস্বার্থও চরিতার্থ ক'রে থাকেন। কারণ, এখানেও সকলের বিপদের সঙ্গে তাঁর নিজের বিপদ অজাঙ্গীভাবে জড়িত। এই কথাটি বুঝোবার জন্যেই উপনিষদ ব্যাপক অর্থে ব'লেছেন—

'যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি,
সর্বভূতেষু চ আত্মানং ন তত বিজুগুপ্সতে।'

অর্থাৎ—যিনি সর্বভূতের মধ্যে নিজেকে দর্শন করেন, এবং নিজেকে সকলের সঙ্গে সংযুক্ত মনে করেন, তিনি বিনাশপ্রাপ্ত হন না।

সেবার মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন নব নব ভাবে বিকশিত হ'তে থাকে। যিনি যত বড় সেবক, গণসৌহার্দ্য তাঁর তত বেশী।

এ কথার দ্বারা আমরা এই বুঝি, আমি সমষ্টির জন্যে কাজ ক'রলে সমষ্টির সমর্থন আমি পেতে পারি। 'ইম্প্রেশন' বা 'ধারণা' শব্দটির দ্বারা এই বুঝোয় যে, আচরণের দ্বারা প্রত্যেকের কাছে প্রত্যেকে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। এটা একটা আইডিয়া, এই আইডিয়া থেকেই ইম্প্রেশনের জন্ম। জগতের সমস্ত কিছুর মূলে এই আইডিয়া বা ইম্প্রেশন কাজ ক'রছে। তাই রাষ্ট্রক্ষেত্রে, সমাজে বা শিক্ষায়তনে যখনই ব্যক্তিসমর্থনের সূত্রে ভোটের প্রশ্ন ওঠে, তখন এই ইমপ্রেশন শব্দটিই আগে এসে মানুষের মন অধিকার করে। আমি তখন সেই ব্যক্তিকেই ভোট দিতে ব্যালট বক্সের দিকে এগিয়ে যাই—যে ব্যক্তির জনস্বার্থে কিছু দান আছে, যে ব্যক্তি প্রকৃত সেবক। তিনিই প্রকৃতক্ষেত্রে পরিচালকের ভূমিকা নিতে পারেন ; তিনিই পারেন গ্রামপঞ্চায়েতের মোড়ল হওয়া থেকে শুরু ক'রে শিক্ষায়তনের বা কো-অপারেটিভের সেক্রেটারী হ'তে, তিনিই পারেন ভলান্টিয়ার, ডিরেক্টর আর প্রেসিডেন্ট হওয়া থেকে শুরু ক'রে দেশের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ক'রতে। তিনিই গণভোট লাভের একমাত্র অধিকারী।

আধুনিক বিশ্বে টাকার লড়াই যেখানে বড়, অর্থব্যয়ে দলগঠনের মাধ্যমে যেখানে গণভোট অধিকাংশ ক্ষেত্রে টাকার দাস, সেখানে প্রকৃত সেবকের মূল্যমান স্বীকারে অনেকেই পরাঙ্মুখ হ'য়ে থাকেন। ফলে বিপর্যয় আসতেও বিলম্ব ঘটে না। এই বিপর্যয়ই আজ সমস্ত বিশ্বে। এ থেকে ত্রাণ পেয়ে বিশ্ব-পরিস্থিতিকে শোভন ক'রে তুলতে হ'লে প্রয়োজন প্রকৃত সেবকের মূল্যমান স্বীকার ক'রে কাজে অগ্রসর হওয়া। পারস্পরিক সেবার মধ্য দিয়ে জগৎ-কল্যাণের দিকে মন না দিলে এপৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য। তার জন্য হাইড্রোজেন প্রক্ষেপ বা অষ্টগ্রহ মিলনের প্রয়োজন হয় না, একটা সপ্তরথীর চক্রব্যূহই যথেষ্ট॥

॥ জনপ্রিয়তা ॥

এমন মানুষ হয়তো সংসারে কদাচ দেখা যায়— যিনি জনপ্রিয়তার আকাঙ্ক্ষী নন। যা-হোক কিছু একটা ক'রে অপরের প্রশংসা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা মানুষ মাত্রেরই রয়েছে। একে মানবিক আকাঙ্ক্ষাই বলবো। সংসার-জীবনে অত্যন্ত বাল্য বয়স থেকেই এ আকাঙ্ক্ষার উৎপত্তি ঘটে। চল্‌তি কথায় একে 'তারিফ'ও বলে। যেমন অমুক ব্যক্তি অমুকের খুব তারিফ করে, কিম্বা অমুক ব্যক্তি বিশেষ প্রশংসার পাত্র—এ দু'টোর অর্থ শেষ পর্যন্ত একই দাঁড়ায়। এই প্রশংসা আর তারিফই অবশেষে জনপ্রিয়তার জন্ম দেয়। কোনো ব্যক্তি কিছু ভালো কাজ করতে করতে দু'জন থেকে দশজন এবং ক্রমে দশজন থেকে সহস্রজনের প্রশংসার অধিকারী হয়। এ অধিকার তার জনপ্রিয়তারই অধিকার। জন অর্থে জনসাধারণ; শিক্ষিত-অশিক্ষিত এবং সগুণ ও নির্গুণ ভাবের জনসমষ্টি। যে কাজ তাদের মনে গিয়ে স্পর্শ করে, সে-কাজের কাজী তাদের স্বভবতঃই প্রিয় হ'য়ে ওঠে। এই প্রিয়তার প্রশংসাই জনপ্রিয়তার মূল কারক। কাজ বা আচরণের দ্বারাই জনপ্রিয়তা গ'ড়ে ওঠে।

কিন্তু জনপ্রিয়তা অর্জন করা বড় সহজ নয়। এ একটা কঠিন বিষয়। সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে পরিমিত সংখ্যক মানুষের কাছে প্রিয় হ'য়ে ওঠা যত সহজ, বৃহত্তর পরিবেশে সংখ্যাগণনার বাইরের লোকালয়ের মধ্যে জনপ্রিয়তার দাবীতে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ ঠিক ততখানিই কঠিন। সমাজে নানা স্তরের মানুষ রয়েছে, ভিন্ন তাদের রুচি, ভিন্ন তাদের জীবনযাত্রা। কোনো বিশেষ কাজের দ্বারা তাদের সমবেত মনের সমর্থন বা তারিফ পাওয়া প্রায়শঃই কঠিন হ'য়ে ওঠে। কিন্তু মানুষ বিভিন্নধর্মী হলেও সৃষ্টিরহস্যে তারা এমন কয়েকটি ক্ষেত্রে সমমানসিকতায় সংযুক্ত যে, সেই সমমানসিকতায় যে এসে ললিতরাগের সৃষ্টি ক'রতে পারে, তাকে সহজেই আপামর জনসমষ্টি সাদরে গ্রহণ করে এবং ক্রমে এমন হয় যে,সেই বিশেষ ব্যক্তির কথা নির্বিশেষেরা মাথা পেতে নিয়ে তারই নির্দেশিত পথে পরিচালিত হয়। কিন্তু এই বাণীবিস্তার বা পরিচালন-ক্ষমতাই বা ক'জনের থাকে? যার থাকে, তাকে কিছু মহৎগুণের অধিকারী

হ'তে হয়। মানুষ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট অথচ স্বচ্ছ ধারণা অবশ্যই তার থাকতে হবে, সেই সঙ্গে তার নিজের বিদ্যা এবং বুদ্ধি এবং জনসাধারণের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার সহজাত প্রবৃত্তি থাকা একান্তই আবশ্যক। এই গুণাবলীর দ্বারা মানুষের মনের কাছে গিয়ে পৌঁছানো যতখানি সহজ, এর বাইরে কোনো ঐন্দ্রজালিক বিষয়ের দ্বারা মানবচিত্ত জয় করা তত সহজ নয়। কোনো ক্ষেত্রে তার আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠলেও কাচপাত্রের মতই তা ক্ষণভঙ্গুর। কোনো বিশেষ যুগ বা কালের ইতিহাসে তা স্থায়িত্ব পায় না। কিন্তু গুণগত জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে তার উল্টো। কর্মের দ্বারা সেখানে একদা নেতৃত্বের অধিকার জন্মে।

কিন্তু এই জনপ্রিয়তা অর্জন করা যত কঠিন, তার চাইতেও বেশী কঠিন জনপ্রিয়তা রক্ষা করা। প্রশংসা বা তারিফ যখন অতিরিক্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়, তখন প্রশংসিত ব্যক্তি যদি সংযমশীল হন, তবু রক্ষা; কিন্তু প্রায়শঃই তার মধ্যে এই সংযমশীলতার বাঁধ ভেঙ্গে যায়। সে তখন মনে করে—'আমি যেন কী হলাম!' এই 'কী হলাম'ই তার মধ্যে অহমিকার জন্ম দেয় এবং জনসাধারণের স্বার্থ থেকে তার নিজের স্বার্থকে বড ক'রে তোলে। তখন, একদা যে প্রশংসা তাকে জনচিত্তবিহারী ক'রে তুলেছিল, সেই প্রশংসাই নিন্দায় পরিণত হ'য়ে তাকে জনবিযুক্ত ক'রে তোলে এবং জনপ্রিয়তা তখন শতধা ধিক্কারে পরিণত হয়। শিল্প, সাহিত্য বা আর্টই বলি, আর সমাজকর্ম বা রাষ্ট্রকর্মই বলি, সর্বক্ষেত্রেই একথা সমভাবে প্রযোজ্য। এই কথারই মূল সূত্র ধ'রে খুব সম্ভব তথাগত বুদ্ধদেব রচনা করেছিলেন 'মঝ্‌ঝিম নিকায়'। তাতে তিনি মধ্যপথ অবলম্বন ক'রে চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বেশী উঁচলে ওঠারও যেমন বিপদ আছে, তেমনি অধঃপাতে নেমে যাবারও বিপদ আছে, অতএব মধ্যপন্থাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পন্থা। তার দ্বারা মানুষের স্পর্ধা যেমন উদ্ধত হয় না, তেমনি নিচের সিঁড়িগুলিও তার পায়ের নাগালের বাইরে চ'লে যায় না। সমস্ত মানুষের যোগে সে হয় সিদ্ধপুরুষ। মানবসমাজের কান্না এবং তার কান্না তখন একীভূত হয়ে যে বেহাগের সৃষ্টি করে, তার সুরের মধ্যে ব্যক্তি-মানুষের প্রিয়তা স্ফুরিত ও বিচ্ছুরিত হয়ে ওঠে। মানুষ তার নিজের স্তরের লোকের মধ্যে তার নিজেকেই খোঁজে, খুঁজে আনন্দ পায় এবং আনন্দের সঙ্গেই তাকে দ্বিগুণভাবে গ্রহণ করে। কিন্তু

অপরের দ্বারা এই গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন ক'রে এবং সেই অর্জিত জনপ্রিয়তা রক্ষা করা স্বভাবতঃই কঠিন।

বিশ্বের কোনো কোনো মহান সাধকজীবনকে বাদ দিলে দেখা যায়—বহুজীবনের ক্ষেত্রেই জনপ্রিয়তা একটা কালগত পর্যায়ে আসে। কোনো নির্দিষ্ট কালের মধ্যেই তার ব্যাপ্তি ও সমাপ্তি। যে সময়ে যে জনগোষ্ঠীর কাছে যে ব্যক্তি বিশেষভাবে আদৃত হয়, সেই সময়ের পরিবর্তনে ও সেই জনগোষ্ঠীর অভাবে বা তাদের বিপরীত মানসিকতার ফলে সেই আদৃত ব্যক্তির আদর আর থাকে না। রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যাপারে এমন ঘটনা আমরা প্রায়শঃই লক্ষ্য করি। কিন্তু এ ঘটনা সর্বক্ষেত্রেই। পৃথিবীতে এমন মানুষ খুব কমই আসে—যার জনপ্রিয়তা দেশ কাল ছাপিয়ে চিরন্তন হয়ে ওঠে। ক্লাসিক বইয়ের মতো এরকম 'ক্লাস ম্যান' দুর্লভ সন্দেহ নেই। তার জন্যে বিভিন্ন গুণের নানা উপাদান প্রয়োজন, কিন্তু ক'জনের মধ্যেই বা তার সন্ধান মেলে? মেলে না ব'লেই কালজয়ী জনপ্রিয়তার অভাব ঘটে এবং যেটুকু বা ঘটে, তার পরিধি নিতান্তই সীমিত। আবার এমনও দেখা যায়—কোনো ব্যক্তি তার নিজের অবহেলাতেই সমসাময়িককালে তার জনপ্রিয়তার সমাধি রচনা করে।

এমনি ক'রে জনপ্রিয়তা যখন সঙ্কুচিত হতে থাকে, তাকে নতুন ক'রে জাগিয়ে তোলা বোধ করি সব চাইতে কঠিন। পৃথিবীতে এমন মানুষের পরিচয় খুব কমই পাওয়া গেছে—যিনি একবার লোকচক্ষুর অন্তরালে ঢাকা প'ড়ে পুনরায় লোকসমাজে সগৌরবে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা ক'রে নিয়েছেন। সুতরাং জনপ্রিয়তা যেমন ব্যক্তিমাত্রেরই আকাঙ্ক্ষিত, তেমনি তাকে শুধু রক্ষা করা নয়—তাকে উত্তরোত্তর গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ বৃহত্তর মানবসমাজের মধ্যে চিরন্তন ক'রে তোলবার কাজটা বড় কঠিন কাজ।

॥ বাঙালী হিন্দু নারীর সমস্যা ॥

আমাদের দেশে হিন্দু নারীর সমস্যা চিরন্তন। তেমনি সেই সমস্যা নিয়ে নানা যুগে নানা মনীষীর আলোচনাও মুখর হয়ে উঠেছে। যখন এদেশে বহু-বিবাহ প্রচলিত ছিল, যখন শাস্ত্রকাররা বলতেন: 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা', যখন নারী শুধু পুরুষের ভোগেরই মাত্র সামগ্রী ছিল এবং যখন দেবদাসী ক্রীতদাসী ও বাঁদি হয়ে নারী পুরুষের সেবায় নিযুক্ত থাকতো, সেই সব কাল থেকে শুরু ক'রে নারী-শিক্ষা, নারী-প্রগতি, নারী-স্বাধীনতা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধাপগুলো অতিক্রম ক'রে অর্থনৈতিক চাপে নারীর চাকরি গ্রহণ এবং রুচিবিগর্হিত অবস্থার চাপে নারীর স্বামীত্যাগ ও স্বাবলম্বী জীবন যাপনের সমস্যা পর্যন্ত নানা সমস্যা আমাদের সমাজ-দেহকে ভারী ক'রে তুলবার ফলে ভারতীয় আইনে হিন্দু-কোড-বিল পাশ হয়েছে। এর ফলে শুধু যে নারী-জীবনের সমস্যাই অনেকটা মিটবার সুযোগ হয়েছে, তা নয়, সে সুযোগ পুরুষের জীবনেও বর্তেছে। পূর্বে আইনগতভাবে বিবাহ-বিচ্ছেদের সুযোগ ছিল না, এখন আছে। কিন্তু স্ত্রী পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই এ আর এক সমস্যা। ফলে আইন পাশ হবার পর আদালতগুলিতে যে পরিমাণ বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদনপত্র জমা পড়তে দেখা গেল, তার হিসেব রাখতে গিয়ে জজ সাহেবদের মাথা ঘুরে গেল। দেখা গেল—আবেদনকারিদের বয়সের কোনো সীমানির্দেশ নেই; তাতে যুবক-যুবতী যেমন আছে, তেমনি আছে প্রবীণ-প্রবীণা। দীর্ঘকালের সঞ্চিত বেদনার স্ফুরণ, সন্দেহ নেই। কিন্তু এইটেই বোধ করি এর শেষ নয়। যেভাবে নানা বুদ্ধিজীবী মানুষের ঐকান্তিক সংযমে পৃথিবীর এতবড় সভ্যতা টিকে আছে, ঠিক সেইভাবেই স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সহিষ্ণুতা, সহানুভূতি ও সংযম দিয়ে তাদের দাম্পত্য বা বিবাহিত জীবনের বাঁধনকে অক্ষুন্ন রাখতে হবে। সেই পথেই শান্তি, সেই পথেই সংসার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ।

নারীশিক্ষা ও নারীর প্রগতি-আন্দোলনের ফলে এদেশে মেয়েদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন সম্প্রসারিত হয়েছে, তেমনি নারীশিক্ষাও বহুগুণে বেড়েছে। তার উদ্দেশ্য এই নয় যে, শিক্ষাপ্রাপ্তা নারীমাত্রকেই জীবিকার্জনের

জন্য জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে, বরং তার উদ্দেশ্য এই যে, শিক্ষিতা নারীরা এক একজন মহীয়সী নারী, উপযুক্ত জননী ও প্রাণময়ী গৃহিনী হবেন। কিন্তু আমাদের আধুনিক সমাজে শিক্ষার এই আদর্শ অনেক ক্ষেত্রেই কেন্দ্রভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। এজন্য সমাজ দায়ী। কারণ সামাজিক অর্থনৈতিক চাপেই নারীকে আজ গৃহ ছেড়ে বহিরাঙ্গনে গিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে, চাকরী ক'রে সংসার প্রতিপালন করতে হচ্ছে। ফলে সংসারের স্বাভাবিক ললিতক্ষেত্র পাষাণের অবরুদ্ধ অর্গলে আছাড় খেয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ছে। স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্ক অবধি অনেক ক্ষেত্রে বিনষ্ট হচ্ছে। অবিবাহিতা নারীদের চাকরী-জীবনটাও প্রায় এরই অনুরূপ। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হচ্ছে না যে, প্রয়োজনবোধে নারী জীবিকার ক্ষেত্রে নিজের পায়ে দাঁড়াবে না। নর-নারীর সমান অধিকারের ক্ষেত্রে নারীকেও আজ নিজের ভাগ্য জয় ক'রে নেবার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্টই আছে। কারণ, পুরুষ-শাসিত সমাজে নারী যেখানে পুরুষ-নির্ভরমাত্র, সেখানে নারীর স্বাবলম্বী হবার স্পর্ধা রাখা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তার পূর্বে তার উপযুক্ত ক্ষেত্রে তাকে মহীয়সী হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ সমাজকেই ক'রে দিতে হবে। দেখা প্রয়োজন—অর্থনৈতিক চাপ প্রবল হয়ে নারীর মানসিক ললিত-বিভাসকে চর্বিত না করে। সামাজিক অর্থনৈতিক বিষয়টা বড় জটিল। এই জটিলতার কঠিন জালে আবদ্ধ হয়ে নারীকে শ্রমিকবৃত্তি থেকে শুরু ক'রে বেশ্যাবৃত্তি পর্যন্ত নিম্নগামী জীবনের বহু ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়তে হয়, এবং তার সুযোগ গ্রহণ করে পুরুষেরাই; কারণ সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার তারা, তাদের হাতেই বিধান এবং সংবিধান।

অপরপক্ষে পুরুষের জীবনেও নারীর নির্যাতনটা লক্ষ্য করবার মতো। উপযুক্ত শিক্ষা এবং প্রজ্ঞার অভাবে নারীর এইরূপ আচরণশীলা হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। পুরুষশাসিত সমাজের ন্যায় নারী-শাসিত বা মাতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীরই প্রাধান্য, নারীই ডিক্টেটর। সেখানেও পুরুষের অবস্থাটা অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীর অবস্থার অনুরূপ। ফলে এই উভয় ক্ষেত্রেই বিবাহিত জীবনে উভয়পক্ষীয় বিচ্ছেদ বা ডাইভোর্স মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। তাতে সংসার ভাঙে, সমাজ ভাঙে, রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ে। তাকে পরিহার ক'রে নর-নারীকে সুস্থ জীবনযাত্রায় উদ্বুদ্ধ করবার দায়িত্বও সমাজেরই।

আইনগতভাবে ভারতীয় সমাজে নারী যদিও পুরুষের সমান স্তরে

সম্পত্তির অধিকারিণী হয়েছে, কিন্তু ব্যক্তিত্ববিকাশে সে-অধিকার এদেশের নারীদের কবে জন্মাবে, সেইটেই প্রশ্ন। কোনো কোনো নারীর মধ্যে এইরূপ চারিত্রিক ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়ে উঠলেও অধিকাংশ নারীই এখনও পুরুষ-নির্ভর জীবন যাপনে অভ্যস্ত এবং আগ্রহশীল। এমন বহু চাকরীজীবিনীর সন্ধান পাওয়া যায়, যারা জীবিকার্জনের পথ বেছে নিয়েও জীবনের ভার পুরুষের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। এর কারণ বোধ করি নারীর শারীরিক ও মানসিক গঠন। তার দেহের রহস্যের সঙ্গে মিশে আছে মানসিক দুর্বলতা। দেহ নিয়ে পুরুষের কাছে যেমন তার ইন্দ্রজাল রচনার শেষ নেই, তেম্‌নি মন নিয়েও তার দুর্বলতার অন্ত নেই। আসলে সৃষ্টিগতভাবে পুরুষের চাইতে নারী দুর্বল। যে সমস্ত নারী রাষ্ট্রিক আন্দোলনে বা সমাজ-বিপ্লবে এগিয়ে এসে সংগ্রাম করে কিম্বা পুলিশ হয়ে বা প্লেনের হোষ্টেস হয়ে অথবা জজ-ব্যারিষ্টার হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ায়, তারা ভীরুতা ও দুর্বলতাকে অনেকখানি জয় ক'রে উঠলেও সাধারণ নারী-সমাজ সেই প্রকৃতিগত দুর্বলতাকে জয় ক'রে সমাজে ও রাষ্ট্রে পুরুষের সমান-স্তরে এসে দাঁড়াতে পারে নি। কিন্তু তাই ব'লে তাকে যদি সক্ষম ক'রে তোলা না হয়, তবে সমাজই বিপন্ন হবে। যৌন সম্পর্কের দিক থেকে শুরু ক'রে সমাজ-জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্র পর্যন্ত স্ত্রী বা পুরুষের কোথাও একক সত্তা নেই। উভয়ের সঙ্গেই উভয়ে যুক্ত। সুতরাং স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার যেমন স্বীকৃত, তেমনি নারীমুক্তির দিক থেকে নারীকে উচ্চতর জীবনের সুযোগ পেতে হবে।

অর্থনৈতিক চাপ প্রবল হয়ে আজ আমাদের সমাজে পুরুষের ন্যায় নারীকেও যেমন জীবিকার্জনে নামতে হচ্ছে, তেমনি তার বিবাহ সমস্যাও ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠচে। সাধারণ শিক্ষিতা নারী দূরে থাক্, উচ্চশিক্ষিতা নারীরা অবধি উপযুক্ত বয়সে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে না পেরে সমাজের একটি অতি প্রয়োজনীয় দিক ও সমস্যাকে ক্রমেই ভারী করে তুলছে। পুরুষের ক্ষেত্রেও একথা আজ সমভাবেই প্রযোজ্য। কিন্তু যেখানে পুরুষের সামর্থ্য নেই, নারীর সেখানে উপায় নেই। এমন বহু বাঙালী পরিবার আছে —যার ভার বহন করতে হচ্ছে পরিবারের মেয়েকে। মেয়ের বিয়ে হ'লে পিতৃপরিবার রসাতলে ডুববে; অতএব বিবাহে মেয়ের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তার বিয়ে হবার সুযোগ নেই। এ অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়—হয়

সেই মেয়ে কোনো দূষিত পরিবেশের প্রভাবে নিষ্পিষ্ট হয়েছে অথবা ছিটগ্রস্ত হয়ে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। যতক্ষণ না রাষ্ট্র এই জাতীয় পরিবার ও জীবনের ভার নিচ্ছে, এবং যতক্ষণ না উপযুক্ত বিবাহবন্ধনের দ্বারা সে আবদ্ধ হতে পারছে, ততক্ষণ এই বন্ধ্যা অর্থনৈতিক সমাজে এ সমস্যার সমাধান নেই।

এই ভাবের আরও বহু সমস্যায় আমাদের বাঙালী হিন্দু সমাজ কণ্টকিত। যে সমস্ত নারী ধর্ষিতা, যে সমস্ত নারী প্রাক্-বিবাহ জীবনে সন্তানসম্ভবা— আমাদের হিন্দু সমাজ সাধারণতঃ তাদের সম্পর্কে নির্মম। এই নির্মমতার জন্য প্রধানতঃ পুরুষের মস্তিষ্কেই। অথচ পুরুষের প্রাধান্যেই সাধারণতঃ নারীদের এই দুর্গতি। এমন কথা বলবো না যে, নারীরা সর্বত্রই নিরপেক্ষ। অনেক ক্ষেত্রে তারা নিজেরাই ইন্দ্রিয়বশবর্তী হ'য়ে সংযমহীন হ'য়ে পড়ে, কিন্তু তারও আধার পুরুষ, এবং পুরুষ নারীর সেই সুযোগ গ্রহণ ক'রে স'রে পড়ে। এ সমস্যা চিরন্তন। এ ক্ষেত্রে সংসার যদি কোনো নারীকে গ্রহণ না করে, তবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নারীকে জীবিকার পথ বেছে নিতে হয়। এক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের দায়িত্ব সমধিক। অপরাপর স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতি তাকালে এর সার্থক উদাহরণ খুঁজে পেতে আমাদের দেরী হয় না। চীনে, রাশিয়ায় কি গ্রেট বৃটেনে নারীসমস্যা আজ একটা সমস্যাই নয়, অথচ এদেশ এ সমস্যায় এখনও কণ্টকিত।

বিবাহিতা এবং অনূঢ়া নারীর মতো বৈধব্যপীড়িত নারীর সমস্যাটিও এখানে সমভাবেই জড়িত।

এদেশীয় ব্রাহ্মণ্যসমাজ একদিন নারীর বৈধব্যের যেমন সুযোগ নিয়েছিল, তেমনি সেই বৈধব্যকে কতকগুলো অনুশাসনে বেঁধে দিয়েছিল। তার দ্বারা কিছু কিছু মঙ্গল যে হয়নি, একথা বলবো না, কিন্তু নারীজীবনের শ্রী নষ্ট হয়েছিল, একথা ধ্রুব। যে ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংযম ও সহিষ্ণুতা হিন্দু বিধবা নারীদের উপর সেদিন বিশেষভাবে আরোপ করা হ'য়েছিল, সেগুলো নারীদের ঠিক প্রকৃতিগত ছিল না, অথচ সামাজিক আইনের কঠোরতায় সেই আরোপিত সবকিছুকে তাদের মাথা পেতে মেনে নিতে হ'য়েছিল। তার ফলে একদিকে মানসিক দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে সামাজিক আচার-নিষ্ঠা—এই দু'য়ে মিলে নারীদের জীবনে একদিকে এলো মানসিক সঙ্কীর্ণতা, অন্যদিকে এলো সংস্কার ও ছুঁৎমার্গ।

প্রকৃতিগত না হ'য়েও সামাজিক চাপে এগুলো ধীরে ধীরে তাদের প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গেল এবং এই প্রকৃতিগত ধারা বংশপরম্পরায় যুগের পর যুগ সমাজদেহে আবর্তিত হ'তে লাগলো। বালবিধবার করুণ কান্না, সম্পত্তিহীনা বার্ধক্যপীড়িত বিধবার পরনির্ভরশীলতা প্রভৃতি যেমন সমাজকে ভারী ক'রে তুললো, তেমনি উপযুক্ত শিক্ষা ও সমাজ-জীবনের স্বাভাবিক সুযোগসুবিধেগুলো থেকে বঞ্চিতা হ'য়ে বিধবাদের জীবনে কলহপ্রিয়তা ও মানসিক সঙ্কীর্ণতা প্রবলভাবে দেখা দিল। এইভাবে নারীসমাজের একটা বৃহৎ অংশ জীবনের সম্পূর্ণতা ও মননের পূর্ণাঙ্গতা থেকে ঝ'রে পড়লো। সেদিনের সমাজ তাদের মানসিক-স্ফূর্তির কোনো দরজাই খোলা রাখেনি। যে স্ত্রী একবার স্বামীহীনা হ'লো, অমনি নানা সংযম ও সংস্কারে তাকে বেঁধে দেওয়া হ'লো। কতকগুলো বিশেষ কাজ ছাড়া বহুমুখি কাজ থেকে তারা বঞ্চিত হ'লো। সালঙ্কারা নারীর নিরাভরণতাই তো একটা মস্তবড় শাস্তি, তার উপরেও বহুতর শাস্তি এসে তাদের সুস্থ মানসিক প্রবণতাকে নষ্ট ক'রে দিল। বিধবার পুনর্বিবাহ ও জননী হবার সুযোগ, সম্পত্তিতে বিধবার অধিকার, আহার্য ও পরিধানে তাদের রুচিগত প্রবণতা—এগুলো যেমন দোষনীয় হ'লো, তেমনি দোষনীয় হ'লো সামাজিক ক্রিয়াকর্মের বহুদিকে তাদের উপস্থিতি। যে নারী একদা স্বামী-পুত্র নিয়ে সমাজের সবদিকে অধিকার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করলো, পরবর্তী কোনোকালে সেই প্রতিষ্ঠা হারিয়ে যে-মানসিকতা নিয়ে তাকে সমাজে বাঁচতে হয়, তার মধ্যে "সিনিসিজ্‌ম" আসা এমন কিছু অসম্ভব নয়, বা তাকে দোষারোপ করাও যায় না।

অথচ কার্যতঃ তাই হয়েছে। এমনি ক'রে হ'তে হ'তে যুগের পর যুগ অতিবাহিত হ'য়ে বর্তমানে এসে পৌঁছেচে। মাঝখানে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মতো কোনো কোনো মহান চরিত্র আবির্ভূত হ'য়ে এদেশের বিধবা নারীদের আহ্বান জানিয়েছেন এগিয়ে আসতে, কিন্তু লোকাচার ও সামাজিক অনুশাসনের আরোপিত ধারাগুলো এতই প্রবল যে, সে আহ্বানে খুব কম সংখ্যক নারীই সাড়া দিয়েছেন।

এর প্রধান কারণ ঐ একটি: বহু শতাব্দীর অভ্যাস ও কুসংস্কার তাদের প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গিয়ে জীবনকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেবার সাহস নেই, বুদ্ধি বা প্রবৃত্তিও নেই। অথচ মানসিক আকাঙ্খাগুলি তাদের মধ্যে

অনুপস্থিত, এমন নয়। এ পরিচয় আমরা বহুভাবে বহু নারীর জীবনে পেয়েছি। বিধবা-বিবাহ-আইন পাশ হওয়া সত্ত্বেও ভূরি ভূরি বিবাহ এদেশে হয় নি ; হয় নি শুধু বিধবাদের ইচ্ছায় নয়, অভিভাবক এবং সমাজকর্তাদের ইচ্ছায় এবং স্বার্থে, সেই সঙ্গে পুরুষদের এ জাতীয় বিবাহের অনিচ্ছায়। এমন প্রমাণ অনেক আছে। এর যে ব্যতিক্রম নেই, তা নয়, কিন্তু সংখ্যায় তা নগণ্য। নারী-জীবনের বিকাশ ও সার্থকতা যে যে উপাদানের দ্বারা সম্ভব, এদের জীবনে সেই উপাদানগুলির অনুপস্থিতির ফলে এদের তপশ্চারিণী হ'য়ে থাকতে হ'য়েছে, আর তার ফলে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বিক্ষোভ ও অনাসক্তি এসে মানসিক ক্ষেত্রে এদের পুরোপুরি অকর্মণ্য ক'রে তুলেছে। বাইরের কর্তব্যে যেখানে তারা মহীয়সী, সেখানে কর্তব্যটাই বড়, মনটা নয়, মনের আগ্রহ যেখানে প্রধান, সেখানে কর্তব্যেরও প্রাধান্য থাকে। অথচ সেই মনটাকে কেউ খুঁজে দেখে নি। সেখানে তাদের মানসিক আকাঙ্ক্ষা সধবাদের মতো একই রকম আছে, কিন্তু সধবার মতো চল্‌বার রীতিটা কেবল নেই। কারণ এ দেশের সরকারী আইনের চাইতে লোকাচার এবং সামাজিক অনুশাসন ও আচরণবাদ অনেক বেশী বড। অথচ মজা এই যে, যুগ এবং সমাজ পাল্টে যাওয়া সত্ত্বেও এ দেশের বিধবা নারীরা খুব একটা পাল্টালো না। তারা চিরকাল পূর্বতন সংস্কারকে আঁকড়ে নিয়েই সংসার-জীবনে প্রত্যহ সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বাল্‌লো।

নারীর পুনর্বিবাহের সমস্যাটি জটিল সন্দেহ নেই। সেই জটিলতায় পুরুষও আবদ্ধ। যে সমস্ত ডাইভোর্সড বা বিধবা নারী নিঃসন্তান অথচ স্বল্পবয়স্কা, তাদের পুনর্বিবাহের পথ সুগম ; অনুরূপ যে সমস্ত ডাইভোর্সড্ বা উইডোয়ার পুরুষ নিঃসন্তান অথচ স্বল্পবয়স্ক, তাদেরও পুনর্বিবাহের পথ সুগম সন্দেহ নেই। কিন্তু এই উভয় ক্ষেত্রে সন্তান বিদ্যমান থাকলে পুনর্বিবাহের ব্যাপারে সন্তানের প্রশ্নটা প্রধান। এ জাতীয় বিবাহ আপাত রোমাঞ্চকর হ'লেও অধিকক্ষেত্রেই ভবিষ্যৎ কল্যাণকর হয় না, এবং সন্তানদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়। এর দ্বারা সমাজ আক্রান্ত হয়। সুতরাং এইরূপ স-সন্তান বিবাহে নারী-পুরুষ উভয় পক্ষীয় এমন প্রতিশ্রুতি থাকা বাঞ্ছনীয় যাতে সন্তানদের ভবিষ্যৎ নষ্ট না হয়। পুনর্বিবাহের ক্ষেত্রে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন ; সেটা হচ্ছে উভয় পক্ষীয় বয়স। নর-নারীর বয়সের একটা সীমানির্দেশ থাকা

একান্তই আবশ্যক—যে সীমা উল্লঙ্ঘন ক'রে পুনর্বিবাহে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। সমুদয় বিষয়টিই সম্পূর্ণ উভয়পক্ষীয় রুচি ও শক্তির উপর নির্ভর করে। তবে এ সম্পর্কে সমাজে পুরুষের যে স্বাধীনতা রয়েছে, নারীর তা নেই; ফলে দুর্ভোগ ভুগতে নারীকেই হয়। এ ক্ষেত্রে নারীকে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যে মাথা তুলে না দাঁড়িয়ে উপায় নেই। তার জন্য তাকে উপযুক্ত শিক্ষিতা হ'য়ে ওঠা প্রয়োজন।

কোনো কোনো বিধবা নারী হাল আমলে আমিষ আহার ও অলঙ্কার-পরিচ্ছদের পক্ষপাতী হ'লেও আসলে সমাজের চোখে তা বিসদৃশ। ওতে হয়তো ইন্দ্রিয়চেতনা আসে, ফলে চারিত্রিক অবৈধতার সম্ভাবনা থাকে। এ জাতীয় নানা মত এপর্যন্ত নানা মুনির কাছ থেকে শোনা গেছে। অথচ সংযম যে একান্তভাবেই মনের ব্যাপার, এটা খুব বেশী কেউ স্বীকার করেন নি। তারও প্রমাণ আছে। নিরামিষাশী কোনো বিধবা নারী কখনও যে পদস্খলিতা হয় নি, এমন নয়; স্বাভাবিক প্যাসানকে প্রতিরোধ করা অনেক সময় দুঃসাধ্য হ'য়ে দেখা দেয়, সেই প্যাসানকে তার স্বাভাবিক গতি দিয়ে সমাজ-জীবনে বহু নোংরামি ও বহু আলোড়নের সৃষ্টি হ'য়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু প্যাসানের বশে পদস্খলিতা হলেও তারা পুরুষের স্থায়ী আশ্রয় পায় নি। তেমনি ব্যক্তি-জীবনে বিধবা মাত্রকেই নিরামিষাশী ও নিরালঙ্কারা থাকতে হবে, এটা অনুশাসন। এ রকম বহু ঘটনায় জীবন তাদের পঙ্গু হ'য়ে আছে। জন্মাবধি পারিপার্শ্বিক পরিবেশে বৈধব্যাচরণ লক্ষ্য ক'রে ক'রে নিজেরাও তারা সংস্কারবাদিনী হয়ে উঠেছে। তারা জেনেছে—এই নিয়ম, এর বাইরে যাওয়া চলে না। চলে—যদি সমাজ চালায়। নইলে নিন্দা ও অপবাদের বিস্ুভিয়াস তার গলিত লাভায় ফেটে পড়বে। কিন্তু সমাজ কোথায়? সে সমাজ এখনও একাদশী আর অম্বুবাচিতে বিধবা নারীকেই তিতিক্ষা ও সহিষ্ণুতায় বেঁধে রাখে। বিধবা বিবাহের মতো সরকারী আইন নয়, সামাজিক অনুশাসন প্রয়োজন—যার দ্বারা প্রচলিত এই ধারার পরিশোধন হ'তে পারে। বিধবা বিবাহ সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়তো—যদি তার পিছনে সরকারী আইন না থেকে সামাজিক অনুশাসন থাকতো। এ দেশ পল্লীমুখি সমাজকেন্দ্রিক দেশ। সরকার একটা উপরতলার ব্যাপার মাত্র। সামাজিক ব্যাপারটা অনেকের ধারণায় প্রায় অপৌরুষেয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

ফলে এদেশে বিধবা বিধবাই, তারা নারী নয়, সংসারে তারা আপন মর্যাদায় সমারূঢ়া নয়। তাদের যে ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংযম আর সহিষ্ণুতা, তা তাদের উপর চাপানো। চাপাতে চাপাতে তাদের মনের সঙ্গে মিশে গেছে। সেই মনকে যদি যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রগতিশীল ক'রে তোলা না গেল তবে সমাজের প্রগতি আন্দোলনটা মিথ্যেই একটা ভোজবাজির মুখোসমাত্র, কাজের কিছু নয়। তার জন্য প্রয়োজন—

(ক) স্বল্পবয়স্কা বিধবা নারীদের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা,

(খ) সবৎসা অসহায়া বিধবা নারীদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা এবং ধর্মান্তরিতা নারীদের সম্ভাব্যক্ষেত্রে স্বীয় ধর্মীয় সমাজে প্রতিষ্ঠা করা,

(গ) সংসারে তাদের উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিয়ে কেতাবি শিক্ষায় ও ব্যবহারিক শিক্ষায় শিক্ষিতা ও সংস্কারমুক্ত ক'রে তোলা।

(ঘ) যুগচেতনায় তাদের মধ্যে চারিত্রিক লক্ষণ পরিস্ফুট করা, এবং—

(ঙ) ধর্ষিতা বা পদস্খলিতা বিধবাদের পুনরায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা, এবং পৈত্রিক বা স্বামীর সম্পত্তির অধিকার দেওয়া।

এই পঞ্চাঙ্গিক কার্যক্রমের জন্য রাষ্ট্রের সহযোগিতা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

সাম্প্রতিককালে যদিও নাগরিক জীবনে কোনো কোনো শিক্ষাপ্রাপ্তা বিধবা নারী বিভিন্ন জাতীয় চাকরীর মাধ্যমে স্বাবলম্বিনী হ'য়ে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু সংখ্যায় তা এতই নগণ্য যে, তাকে পার্সেন্টেজ ধরা যায় না। যদিও ইদানিং ভারতীয় সংবিধানে হিন্দু নারী সম্পর্কে নানা সুবিধে আরোপ করা হয়েছে, কিন্তু তাতেও বৈধব্যপীড়িতা নারী—বিশেষ ক'রে পল্লীকেন্দ্রিক নারীরা চৈতন্যপ্রাপ্ত হ'য়ে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পেরে যুগচেতনায় এগিয়ে আসতে পারে নি। এগিয়ে আসতে হ'লে যে মানসিকতা, যে পরিবেশ ও যে সংস্কারমুক্তি প্রয়োজন, আজও তার অভাব আছে!

একথা স্বীকার্য নয় যে, তাদের মনের বিরুদ্ধে আবার কিছু একটা নীতি আরোপ করা হোক। যে নারী তার মৃত স্বামীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে নিজেকে সারাজীবন ত্যাগের পথে পরিচালনা করতে চায়, তাকে নিয়ে প্রশ্ন নয়; প্রশ্ন তাদের নিয়ে—যারা স্বল্পবয়স ও যৌবনাবস্থায় বিধবা হ'য়ে নতুন ক'রে বিবাহের মাধ্যমে নতুন সংসারে প্রতিষ্ঠিতা হতে চায়, এবং যারা নিজেদের

নিয়ে স্বীয় রুচিতে জীবনে এগোতে চায়,—তাদের নিয়ে। স্বামীহীনা হলেই নারীত্ব বিসর্জিত হ'লো, নারীর বাসনা-কামনা ও আকাঙ্খার নিবৃত্তি হলো, একথা গায়ের জোরের কথা, সমাজের প্রবলদের কথা, আসল কথা নয়। বিবাহ ব্যাপারে এদেশে এপর্যন্ত স্ত্রী বর্তমানে ও স্ত্রীবিয়োগে যত পুরুষ যত সংখ্যক পুনর্বিবাহ করেছে, তত সংখ্যক নারী যদি স্বামীবিয়োগে পুনর্বিবাহে মিলিত হতে পারতো', তবে আর বিধবা বিবাহ বিল নিয়ে এদেশে এতবড় আন্দোলনের অবকাশ থাকতো না। কিন্তু তাদের কাছে সামাজিক দিক দিয়েই সে-সুযোগ ছিল না। কোনো পুরুষ-শাসিত সমাজেই তা থাকেনা। ফলে একবেলা উপোষ দিয়ে একবেলা দুটী আতপান্ন সিদ্ধ ক'রে গলাধঃকরণ করবার প্রত্যাশায় পরিবারের বহু ব্যক্তির খুসীর কারণ হ'য়ে তাদের থাকতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এদেশের পণ্ডিত সমাজ এতই গোঁড়া ও প্রতি-ক্রিয়াশীল যে, তাঁদের দ্বারা কোনো নববিধান প্রত্যাশা করা যায় না। এই পণ্ডিত সমাজের উর্ধ্বতন আত্মীয়েরাই একদা রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, সম্ভবমতো আজও করছেন। এ অবস্থা যদি আরও দীর্ঘকাল চলে, তবে এদেশের নারী সমাজের এবং বিশেষ ক'রে স্বামীহীন নারীসমাজের দুর্গতি ঘুচবার নয়।

স্বাধীন ভারতে আজ যেখানে নতুন জীবনচর্যা শুরু হ'য়েছে, সেখানে নারী এবং বিশেষ ক'রে বৈধব্যপীড়িত নারীদের পেছনে ফেলে রাখলে চলবে না, পুরুষের স্বেচ্ছাচার একদিন তবে অভিশাপ হ'য়ে দেখা দেবে। তাতে ঘর ভাঙবে, সমাজ আছি-আছি করেও যেটুকু আছে, সেটুকুও যাবে। কিন্তু তার জন্য নারী-সমাজকেও সক্রিয় হ'য়ে ওঠা প্রয়োজন। পূর্ববর্তী সমাজের ধারা অনুসরণ ক'রে চলায় হয়তো কিছু কিছু সুবিধে আছে, কিন্তু তা প্রচলিত কালের জাতীয় সুবিধে নয়। তারা সংযমী হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু জীবন ও মনন থেকে সংক্ষিপ্ত হবে না। আজ অবধি তাদের মধ্যে শুধু নারীত্বের সংক্ষিপ্ত রূপটিই আমরা দেখতে পাই, বহুবিস্তৃত রূপের সন্ধান বড় পাই না। তার জন্য সংস্কারের বাঁধন কাটতে হবে; তাকে কেউ উচ্ছৃঙ্খলতা বল্‌বে না, বল্‌বে জীবনের নব উন্মেষ।

॥ কলকাতার পোষ্টার ও বাঙালী সমাজ ॥

আমরা মাঝে মাঝে অবচেতন মনে এমন সব কল্পনা করি, বাস্তবে যার মূল্য নিরূপণ করা কঠিন। কিন্তু এমনও দেখা যায়, সেই সব অবচেতন কল্পনা অনেক সময় বাস্তবতার ইন্ধন জোগায় অথবা বাস্তব কর্মকাণ্ডের পরিপূরকরূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। যেমন একদিন ভাবা গেল—কলকাতা সহর থেকে সমস্ত সাইন-বোর্ড যদি সরিয়ে দেওয়া হয়, তা'হলে এখানকার দোকানপাট বা বিভিন্ন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের একটা ডেমোক্রেটিক রূপ দেখা যায় না কি? হয়তো যায়, কিন্তু তার বাস্তব রূপায়ণ কি সম্ভব?—একথা ভাবতে ভাবতেই মন ক্রমে অবচেতনা থেকে চেতনায় ফিরে এলো। মনে হ'লো—এতক্ষণ যেটা ভাবছিলাম, সেটা আসল ভাবনা নয়, ভাবনার সূত্র মাত্র। আসলে মূল ভাবনাটা এরই ঠিক কাছাকাছি।

ভাববার বিষয় ছিল—কলকাতা সহরের পোষ্টার নিয়ে। এটাই আসল ভাবনা। মানুষের ব্যবসা থেকে শুরু ক'রে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম যত প্রসার লাভ করে, তত তার বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হয়। কোনো জিনিষকে জনসাধারণ্যে বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত না ক'রলে সে জিনিষের চাহিদা বাড়ে না। বিশেষ ক'রে আধুনিক যান্ত্রিক যুগে মানুষের মন এত বেশী বিস্মৃত যে, সর্বদা তার চোখের সামনে কোনো জিনিষকে তুলে না ধ'রলে সে সম্পর্কে কোনো কথা লোকের মনে থাকে না। এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হ'য়েই ইদানিং-কালের বিজ্ঞাপন বেড়েছে, বিজ্ঞাপনের টেকনিক ও ফর্মও নতুন আকার নিয়েছে। এবং এই বিজ্ঞাপনের একটি বৃহত্তর অংশ হচ্ছে পোষ্টার।

মফঃস্বলের সহরাঞ্চলে এর প্রচলন কম হ'লেও একেবারে যে নেই, তা নয়। কিন্তু কলকাতার মতো মহানগরীতে যেখানে প্রতিদিন নানা দেশের লক্ষ লক্ষ লোক চলাফেরা করে, সেখানে এই বিজ্ঞাপন এবং বিশেষ ক'রে এই পোষ্টারের প্রাধান্য অধিক। এর দ্বারা পোষ্টারদাতারা লাভবান হন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্নটা এখানেই। এর লাভের দিকটা অতিরিক্ত মাত্রায় দেখতে গিয়ে অধিকাংশ পণ্যজীবীকেই সাংস্কৃতিক রুচি থেকে নিচে নেমে আসতে হয়। ফলে পোষ্টারে যে ভাষা ও যে চিত্র উৎকীর্ণ ক'রে সারা সহরের

দেয়ালে দেয়ালে গেঁথে দেওয়া হয়, সমাজের উপর তার প্রভাব পড়তে দেরী হয় না। তেমনি শিক্ষণীয় সুরুচিসম্পন্ন পোষ্টার সমাজ-জীবনকে অনেকখানি উন্নত করতে সহায়তা করে বৈ কি। এ জাতীয় পোষ্টার অনেক ক্ষেত্রে 'ওয়াল পেপার' বা 'দেয়াল-পত্রিকা'র কাজ করে। তাতে কিশোর ও যুবক শ্রেণীর মধ্যে নিজেদের গ'ড়ে তুলবার ও সমাজোন্নয়নমূলক কাজের উন্মাদনা জাগে এবং অল্পকালের মধ্যেই সমাজ উন্নত হয়ে দেশের চেহারা পাল্টে যায়।

কিন্তু যুদ্ধোত্তর বা উত্তর-স্বাধীনতা কালের কলকাতার দিকে তাকালে আমরা কি দেখতে পাই? দেখতে পাই সারা সহরে একটাও ইঁটের দেয়াল নেই, আছে শুধু পোষ্টার—পোষ্টারের দেয়াল। তার অধিকাংশই সিনেমার পোষ্টার, কিছু বা গান-বাজনা-জলসার, কিছু বা ষ্ট্রাইক ও ধর্মঘটের, কিছু বা লুক কথিত যীশু তন্ত্রের, বাকীগুলো বিভিন্ন শ্রেণীর। সিনেমা পোষ্টারের ইংরেজি ও হিন্দী সংস্করণগুলোর অধিকাংশই রুচি-বিগর্হিত। সেখানে অনেক সময়ই যেভাবে নর-নারীর নগ্নতা প্রকাশ ক'রে তাকে আর্ট বলে চালানো হয়, তা অত্যন্ত আপত্তিজনক। ইতিপূর্বে বিনোবা ভাবে এক বক্তৃতায় এ জাতীয় পোষ্টারগুলোর উচ্ছেদ-সাধনের কথা উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু কর্পোরেশন বা সরকারী মহল থেকে তা গ্রাহ্যে আসেনি। অন্যান্য শ্রেণীর পোষ্টারের মধ্যে গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্ট্রিকৃত নারীর গর্ভরোধ বটিকা থেকে শুরু ক'রে বহুবিধ বিষয় আছে—যা সবদাই পথযাত্রীর কৌতূহলী চোখকে কণ্টকিত করে। এমনকি নর-নারী নির্বিশেষে বহু লোককে তা প্রভাবিত ক'রে উন্মার্গগামী ক'রে তোলে। ফলে সমাজের কোন্ স্তর পর্যন্ত যে এর দূষিত নিশ্বাস গিয়ে পৌঁছাচ্ছে, উপর থেকে তা বুঝবার উপায় নেই।

কথা উঠতে পারে—বাঙ্গালীর প্রশ্নটাই কল্‌কাতায় বড় নয়; অবাঙ্গালী এবং এ্যাংলো ও ইউরোপীয়ের সংখ্যা এখানে প্রায় বাঙ্গালীর সমান সমান। তাদের ইণ্টারেষ্ট এখানে রক্ষা পাবে বৈ কি? নইলে ডেমোক্রাসির কথাটা যে একটা ভুয়ো কথায় দাঁড়ায়। কিন্তু ইতিহাসে হয়তো ডেমোক্রাসি অর্থ এই নয় যে, কোনো একটা বিশেষ রাজ্যের সমাজকে উৎসন্নে দিয়ে বিদেশী বা বাকী রাজ্যগুলোর সমাজ আপন আপন খেয়ালে উল্লম্ফন করবে? বাঙ্গালী জীবন ও বাঙ্গালী সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিকটাই এতকাল বড ছিল। যুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে যদিও তার কাঠামো অনেকটাই ভেঙেছে, তবু

তার রক্তের মধ্যে সেই নৈতিকবোধ ও অধ্যাত্ম চেতনার ধারা অবরুদ্ধ হ'য়ে যায়নি। এর ফলে তার যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম, চাল-চলন ও জীবনধারা অন্যান্য প্রদেশ ও জাতি থেকে চিরকালই পৃথক। কিন্তু সেই জীবন-ধারার উপর আজ সর্বদিক থেকে এমন চাপ পড়েছে—যার ফলে তার শুধু ঘরই ভাঙ্গতে শুরু করেনি, শুরু করেছে তার চরিত্র ভাঙ্গতে। এই ভাঙ্গনের একটি অন্যতম অস্ত্র শালীনতা-বিবর্জিত পোষ্টার।

কল্‌কাতা যেমন বৃহত্তর ভারত ও সমগ্র এশিয়ার প্রাণকেন্দ্র, তেম্‌নি পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী। বাঙ্গালীর রক্তে বাঙ্গালীর শ্রমে কলকাতার জন্ম। তার সাংস্কৃতিক রুচি অক্ষুণ্ণ রাখবার মতো উপাদানের অভাব যখন এখানে বড় হয়ে দেখা দেয়, তখনই তার জাতীয় ইতিহাসের পাতায় কালির আঁচড় পড়ে। আজ সেই অবস্থার মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে হয়েছে বাঙ্গালীকে। শুধু দেয়ালে দেয়ালে নয়, এর পরেও আছে ট্রাম-বাসের পোষ্টার, আছে আরও বহুরকমের বিজ্ঞপ্তিসূচক প্রাচীরলিপি। অথচ কোনো বিদেশী সভ্যসমাজেই প্রকাশ্য রাজপথের দেয়ালে বা টেলিগ্রাফ-পোষ্টে উল্লেখযোগ্য কোনো রকম যৌনবোধসূচক বা শিল্পবোধবিবর্জিত পোষ্টারের নিদর্শন পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও তা নিয়ে আন্দোলন হয় এবং বন্ধ হয়। অথচ এখানে তার বিপরীত। এ জাতীয় নগ্ন রুচিবিগর্হিত পোষ্টারের প্রভাব এ রাজ্যের কিশোর ও যুব-জীবনের উপর যে কী বিষক্রিয়া সৃষ্টি করছে, তার বহু উদাহরণ আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে। চলচ্চিত্রজাত পত্রিকার দিক থেকেও তেমনি ইদানীং এদেশীয় কোনো কোনো বিদগ্ধ প্রতিষ্ঠান অনুরূপ পোষ্টার ও সাইনবোর্ড ব্যবহার করতে শুরু করেছেন, যদিও তার আবেদন যৌন সম্পৃক্ত নয়, কিন্তু তাকে কোনোক্রমেই রুচিকর বলা যায় না। জানা উচিত যে, পাঠ-অধ্যয়ন ও সাহিত্যের ব্যাপারটা বাজারের মৎস্য-ক্রয়ের ব্যাপার নয়। কিন্তু কাকে কি বল্‌বেন? খাদ্যদ্রব্যের ভেজালের মতো বুদ্ধিবৃত্তিতে ভেজাল ঢুকলে যা হয়, এ তারই বহিঃপ্রকাশ। এ সবেরই উন্মাদনা এসেছে একশ্রেণীর পণ্যজীবী মননের পল্লবগ্রাহী মানস থেকে—যা ধীরে ধীরে ইন্‌জেক্‌শনের মতো এদেশের ধমনীতে কাজ ক'রছে।

এ থেকে সমাজকে যাঁরা বাঁচাতে পারেন, তাঁরা হচ্ছেন গভর্ণমেণ্ট এবং কর্পোরেশন, অন্যথায় জনসাধারণ; কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁরা উদাসীন। জাতির

চরিত্র সম্পর্কে তাঁদের হাতে কোনো বিল বা প্রোগ্রাম আছে ব'লে আমাদের জানা নেই। অথচ তার আশু প্রবর্তন আবশ্যক, আবশ্যক আইন জারী ক'রে এ জাতীয় পোষ্টার বন্ধ ক'রে দেওয়া। এ শুধু বাঙালী জীবনের পক্ষেই ক্ষতিকারক নয়, ক্ষতিকারক সর্বভারতীয় সমাজদেহের। অতএব আইন জারী হোক, দেশের শিল্পরুচি বৃদ্ধি পাক, সমাজ সুন্দর হোক, এই কাম্য।

॥ চলচ্চিত্র ও সাহিত্য ॥

বিজ্ঞান আজ জ্ঞানকে নানাদিকে সম্প্রসারিত ক'রছে। আজকের চলচ্চিত্র সেই বিজ্ঞানেরই একটি বিশেষ অঙ্গ। যতদিন চলচ্চিত্রের স্ফুরণ হয়নি, ততদিন পর্যন্ত জনসাধারণকে একমাত্র মঞ্চাভিনয়ের রস গ্রহণ ক'রেই খুসী থাকতে হ'তো। মঞ্চাভিনয়ে যে জ্ঞান বা আনন্দের ভাগ কিছু কম, তা নয়। আসল বিষয় হচ্ছে নাটক। সেই নাটক যত জ্ঞানগর্ভ, বিষয়বিচিত্র এবং জীবন ও সমাজের সঙ্গে অঙ্গসম্বন্ধযুক্ত হবে, ততই দর্শকের মানসিক ব্যুৎপত্তি ও সম্প্রসারণ ঘটবে। একথার অর্থ এই নয় যে নাটকে কেবল জ্ঞানের কথাই থাকবে, রসের কথা থাকবে না। বিষয়টা আসলে তা নয়। যাকিছু পাচ্য, তার সঙ্গে জলের সংযোগ না ঘটলে যেমন কঠিন বস্তু দ্রবীভূত হয় না, তেমনি যাকিছু প্রজ্ঞাশীল বিষয়, তার সঙ্গে রসের সংমিশ্রণ না ঘটলে জ্ঞান ললিতধর্মী হয় না। তাই কি নাটক, কি সাহিত্য—সর্বাগ্রে তাকে রসোত্তীর্ণ হতে হয়, ললিতধর্মী হ'তে হয়। নইলে সে সমাজ ও জীবনের যতবড় আবেদন নিয়েই উপস্থিত হোক না কেন, দর্শক বা শ্রোতা বা অভিনেতা কারুর মনকেই তা স্পর্শ করে না। এই কারণেই বোধ করি নাট্যমঞ্চকে রঙ্গমঞ্চ বলা হয়েছে। রঙ্গ অর্থে ব্যঙ্গ বা প্রহসন নয়, রঙ্গ অর্থে রস। এই রসকে যখন আমরা চিরায়ত দর্শন বা 'পেরিনিয়াল ফিলজফি'তে রূপান্তরিত করি, তখন আর সে রসের সংজ্ঞায় আবদ্ধ থাকে না, সে হয় জীবনের একটি মহত্তর আনন্দ। শিল্পের জগৎ তাই আনন্দের জগৎ, নাটক সেই আনন্দের একটি বৃহৎ বস্তু।

ইদানিং মঞ্চক্ষেত্রেও অবশ্য বিজ্ঞানের ছায়াপাত ঘটেছে সন্দেহ নেই। তাতে যত বেশি পরিমাণে ইলেক্‌ট্রিকাল ড্রামা হচ্ছে, ঠিক ততবেশি পরিমাণেই ড্রামেটিক ড্রামা ক'মে আসচে। এ বিষয় নিয়ে আজ নানা মত দেখা দিয়েছে। তা নিয়ে কোনো মন্তব্য করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবু ব'লবো—চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের যে সুবিধে রয়েছে, মঞ্চে তা নেই। যেমন ধরুন, কোনো ভৌগোলিক পরিবেশ, মঞ্চে তাকে কৃত্রিম ক'রে নিতে হয়, ছোট ক'রে আনতে হয় সেই পরিবেশকে। অনেক ক্ষেত্রে তার প্রবর্তন আদৌ সম্ভব হ'য়ে ওঠে না। তার ফলে মানব-জীবনে অরণ্য, সমুদ্র, পর্বত বা ঐতিহাসিক ও

ভৌগোলিক জনপদগুলির আবেদন অসম্পূর্ণ এবং অগ্রাহ্যই থেকে যায়। এই কারণেই নাট্যকারেরা মঞ্চাভিনয়ের সুবিধের জন্য তাঁদের নাটকে স্থান প্রভৃতির আংশিক ইংগিত রাখেন মাত্র। এখানে দর্শকের জ্ঞান নাটকের সাধারণ বিষয়বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যায়; নাট্যবস্তুর উপরে যে দেশ-কাল-পাত্রের প্রভাব অনেকখানি, তা হৃদয়ঙ্গম করবার অবকাশ থাকে না।

কিন্তু চিত্রাভিনয়ে তা নয়। তার স্থান বহু ব্যাপক এবং আবেদন বৃহত্তর। এর কারণ হচ্ছে চলচ্চিত্রক্ষেত্রে আজকের বিজ্ঞানের সহজ প্রবেশ। শুধুমাত্র ক্যামেরা, সাউণ্ড রেকর্ড আর সেলুলয়েডের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন কালের বিভিন্ন বিষয়বস্তুগুলিকে যথাযথরূপে ধ'রে রাখা যায়। এখানে নাটক গ'ড়ে ওঠে বৃহত্তর পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে—রঙ্গমঞ্চে যে সুবিধে একেবারেই নেই। ধরুন, নাটকের কাহিনীর একটি যায়গায় বর্ণিত আছে—নায়ক সীমাচলম তখন লছমনঝোলার দুর্গম পথ পেরিয়ে চলেছে তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে, নায়িকা মীনাক্ষী-রাণী শিলংয়ে তার নিজের ঘরের জানালায় ব'সে বিরহে কাল গণনা করছে নায়কের প্রত্যাগমনের আশায়। ধীরে ধীরে ঋতুর পরিবর্তন ঘটচে, বর্ষার ঝটিকার মেঘ এসে আচ্ছন্ন ক'রে দিচ্ছে তার ধারাবর্ষণে, শরৎ এসে ফিরে যাচ্ছে তার বোধনের বাদ্য শুনিয়ে, শীত এলো তার মরা ডালের কান্না নিয়ে, তারপর বসন্ত এলো তার রূপের পসরা সাজিয়ে। এমনি করেই বছর কেটে গেল।

মঞ্চে কি এ চিত্র ফুটিয়ে তোলা সম্ভব? অথচ ছায়াচিত্রে উল্লেখিত এই দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখতে দেখতে দর্শকেরা একদিকে যেমন ঋতু-পরিবর্তনের মাধুর্যে মুগ্ধ হন, তেমনি বিরহিনী মীনাক্ষীরাণীর জন্য অনুতপ্ত হন এবং তীর্থলীলা লছমনঝোলাকে কেন্দ্র ক'রে নায়ক সীমাচলমের দুর্গম যাত্রার ক্লান্তিতে ক্লান্ত হন। এখানে রস আছে, এবং সেই সঙ্গে আছে বহির্জগতের প্রাকৃতিক জ্ঞান; সুতরাং রস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের মননক্ষেত্রেরও সম্প্রসারণ ঘটচে। রসের সঙ্গে এই জ্ঞান থেকে দর্শক বঞ্চিত হতেন—যদি প্রযোজকের অর্থ-সংকোচনের ফলে পরিচালক নাটক থেকে প্রাকৃতিক এই দৃশ্যাবলীকে বাদ দিতেন বা এই দৃশ্যের পরিবর্তে একটি সহজ হাল্কা দৃশ্যের প্রবর্তন করতেন।

কেন একথার অবতারণা করলাম, ক্রমে সেই প্রসঙ্গে আসি।—কাহিনীকার অর্থে আমরা যে সাহিত্যিক সমাজকে বুঝি, প্রধানতঃ তাঁদের রচিত কাহিনীগুলি

সাহিত্যের এক একটি প্রাণময় অঙ্গ ও শিল্পধর্মী হয়ে থাকে। কিন্তু এই শিল্পধর্মী সাহিত্যিক সমাজ বাদেও চলচ্চিত্রের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অপর এক সাহিত্যিক সমাজের পরিচয়ও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই সাহিত্যিক সমাজ বা কাহিনীকারদের ভিত্তি প্রধানতঃ চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রযোজকশ্রেণীর উপর নির্ভরশীল। অনেক সময় পরিচালকেরাও প্রযোজনের তাগিদে অথবা অর্থানুকূল্যের খাতিরে সাহিত্যকর্ম ক'রে থাকেন। জনৈক প্রযোজকের ইচ্ছে—বাজারের গতি বা ট্রেণ্ড্ অনুসারে কম টাকার মধ্যে একখানি ছবি তুলতে হবে। ভার পড়লো পরিচালকের উপর। কিন্তু এজন্য তিনি জাতশিল্পী বা যুগসাহিত্যিকদেব সঙ্গে সম্পর্ক রচনার কে নো প্রয়োজন-বোধ ক'রলেন না। নিজেই তিনি জোড়াতালি দিয়ে একটি কাহিনী খাড়া ক'রে তার চিত্রনাট্য ও সংলাপ নিজেই রচনা ক'রে নিলেন, সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় সঙ্গীতাংশও তাঁর নিজের রচিত হ'লে ভালো হতো, অন্যথায় কোনো গীতিকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হ'লো। সব মিলিয়ে তিনি যখন প্রযোজককে প্রভাবিত ক'রতে সমর্থ হ'লেন, তখন শুরু হ'লো শুটিংয়ের কাজ। তারপর সম্পাদনা ও সেন্সারবোর্ড পেরিয়ে ছবি এলো সহর ও মফঃ-স্বলের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে; দিনকয়েক দর্শকের কম বেশি বেশ ভিড় হ'লো, তারপর কিছু প্রশংসা ও ততোধিক নিন্দা কুড়িয়ে কোথায় যে সে-ছবি আত্মগোপন ক'রলো, তাব আর সন্ধান পাওয়া গেল না। একাজে প্রযোজকের ব্যয় অল্পই হ'লো সন্দেহ নেই; পরিচালক তাঁর একমাত্র পরিচালনার জন্য যে অর্থ পেতেন, একাধারে কাহিনী—চিত্রনাট্য ও সংলাপ তার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় তার চাইতে আরও কিছু অধিক অর্থ পেলেন। কিন্তু মূল যে ছবিখানির উপর শুধু একটা ব্যবসামাত্রই নয়, জাতীয় শিল্প এবং সেই সঙ্গে বিরাট একটা ঐতিহ্য দাঁড়িয়ে আছে, তা নষ্ট হ'লো। এদেশে চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলি গ'ড়ে ওঠার পর থেকে এমন বিনষ্টি আমরা বহুবার বহুক্ষেত্রে লক্ষ্য ক'রেছি। এর সঙ্গে আরও যে যে টেক্নিক্যাল বিষয়গুলি জড়িত আছে, সেগুলোর উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক।

এখানে একথা ব'লবো না যে, কাহিনী রচনা সম্পর্কে উক্ত পরিচালকের ক্ষমতা নেই। কিন্তু কাহিনী রচনা এক জিনিষ, আর তা শিল্প বা সাহিত্য-পদবাচ্য হওয়া আর-এক জিনিষ। সেকাজের জন্য প্রয়োজন হয় সাহিত্যিককে।

একটি বিশেষ গুণ ও সৃজনশীল শক্তির দ্বারা সাহিত্যকর্ম সংশোধিত হ'য়ে থাকে। সুতরাং যিনি সাধক শিল্পী, তার সঙ্গে সাধারণ ব্যবসা-বুদ্ধিজাত লিপিকারের পার্থক্য আকাশপাতাল। গল্প তো সাধারণ রাজমিস্ত্রী আর কিষাণ থেকে শুরু ক'রে যে কোনো মানুষই তৈরী করতে পারে। তার সঙ্গে সাহিত্যিক-গল্পের সম্পর্কটা যে নিকটের নয়, তা সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই উপলব্ধি ক'রবেন। যতক্ষণ না সেই উপলব্ধি চিত্র-প্রতিষ্ঠানের মালিক ও পরিচালকবর্গ করতে সক্ষম হন, ততক্ষণ ছবির কৃতিত্ব অর্জন করা তাঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য হ'য়ে দাঁড়ায়। কথায় বলে—'যার কাজ তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।' সাহিত্য সম্পর্কেও সেই একই কথা। প্রকৃত সাহিত্য কখনও প্রকৃত সাহিত্যিক ভিন্ন হয় না। কথা-সাহিত্য, গীতিসাহিত্য—সব সাহিত্য সম্পর্কে এই একই কথা। যেহেতু সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের নিবিড়তম যোগ র'য়েছে, সেই হেতু এই কথাগুলো এমন ক'রে বলতে হলো। যে কাহিনীকে চিত্রে গ্রহণ করা হবে, তার কতকগুলো বিশেষ গুণ থাকা আবশ্যক। হয় তাতে সামাজিক সমস্যা তথা সমাজ সংস্কারের নানা বিষয়ক বস্তু থাকবে, না হয় তাতে মানব-জীবনের সুখ-দুঃখ বিজড়িত গভীর রহস্য থাকবে, অথবা তাতে প্রহসনের আবরণে সমাজ ও জীবনের বিশেষ কোনো তত্ত্ব রূপ পাবে। সাহিত্যেও এই বিষয়গুলিরই প্রাধান্য।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে—সাহিত্যের যা উপজীব্য, চিত্রেরও তাই উপজীব্য। অন্য ভাবে বলা যায়, সাহিত্যে যা আক্ষরিক, চিত্রে ও মঞ্চে তাই জীবন্ত সজীব। চিত্রে ও মঞ্চে যে কথা, যে কাহিনী ও যে সঙ্গীত রূপ পাচ্ছে, তা সাহিত্যেরই নায়ক-নায়িকার কথা, সাহিত্যেরই কাহিনী ও সঙ্গীত। সুতরাং যে সাহিত্য যত সার্থক কাহিনাসমন্বিত হবে, তার চিত্র-রূপায়ণও ততই সার্থক হ'য়ে উঠবে। অনেকে এই ব'লে তর্ক ক'রে থাকেন যে, সার্থক সাহিত্য মানেই সার্থক চিত্র নয়। কিন্তু কেন নয়, একথা আমার উপলব্ধিতে আসে না। পাশ্চাত্য দেশগুলির শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও তার চিত্ররূপারোপের প্রতি লক্ষ্য ক'রলেই এ বিষয়ের যথার্থতা প্রতিপন্ন হবে। দুঃখের বিষয়, আমাদের মেধা এবং আর্থিক সামর্থ্য সম্ভবতঃ ততদূর অবধি গিয়ে পৌঁছাবার উপযোগি নয় ব'লেই আমরা দু'য়ের মধ্যে একটা গোলযোগ খাড়া ক'রে আমাদের অযোগ্যতার উপর একটা কৃত্রিম সান্ত্বনার মুখোস এঁটে আশ্বস্ত হ'তে ভালোবাসি। তার ফলে যা হবার

স্তাই হ'চ্ছে। এদেশের শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যগুলির চিত্রাভিনয় দেখতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা হতাশ হ'য়ে ফিরে আসি। তার একটা কারণের ইঙ্গিত আমি গোড়ায় দিতে চেষ্টা ক'রেছি। আমাদের দেশের কোনো চিত্র-প্রতিষ্ঠানই এ পর্যন্ত তাঁদের চিত্রনির্মাণের আভ্যন্তরীণ কাজে সাহিত্যিককে সংযুক্ত রাখেননি। গ্রন্থকারের সঙ্গে সাধারণতঃ তাঁদের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষণকালের। অর্থকরী সম্পর্কিত একটা-কিছু চুক্তি হ'য়ে গেলেই লেখক পরিত্যাজ্য। তারপর তাঁর কাহিনীর উপর যথেচ্ছ কাঁচি ও রোলার চালনা ক'রে চিত্রে যে বস্তুটি দাঁড়ালো, দেখে লেখক নিজেই স্তম্ভিত হ'য়ে যান—এ কাহিনী যথার্থ ই তাঁর নিজের রচিত কি না!

ইদানিং চিত্রপ্রযোজকদের মধ্যে আরও একটি নতুন সুর লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তা হ'চ্ছে ট্রাজেডিকে বর্জন ক'রে চিত্রকে মিলনাত্মক কাহিনীসম্বলিত করা। অর্থাৎ কোনো মহৎ উপন্যাসের পরিণতি যদি ট্রাজিক হয়, তবে যে-প্রকারেই হোক তাকে কমেডি ক'রে তুলতে হবে। দর্শক মাত্রেই নাকি কমেডি চায়। সুতরাং দর্শকের যখন দাবী, তখন আর কথা নেই। ফলে গ্রন্থকারের কাহিনী মার খায়। এরকম স্থলে দুটো বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ পাঠকের বহুপঠিত গ্রন্থসম্পার্কে যে ধারণা, ছবি দেখতে গিয়ে সেই ধারণা নষ্ট হয়; এবং দ্বিতীয়তঃ যে পাঠক বই পড়েনি, সে ছবি দেখে মূল বই সম্পর্কে যে মানসিকতা তৈরী করে, তা লেখকের অনুকূলে না গিয়ে বিরুদ্ধেই যায়। অথচ প্রযোজককে এ কাজ করতে হয় ব্যবসার খাতিরে। বলতে বাধা নেই যে, ইদানিংকালের কোনো কোনো সার্থক লেখক প্রযোজকের সঙ্গে তাল দিয়ে নিজের কাহিনীকে নিজেই চিত্ররূপের মাধ্যমে হত্যা করেন। না করলে তাঁর নাকি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ঘটে না।

এই যেখানে অবস্থা, সেখানে চিত্রের মাধ্যমে সাহিত্য দাঁড়াবে কিসের জোরে? অথচ উভয়তঃ এই জাতীয় একটা বৈমাত্রেয় সম্পর্ক দীর্ঘকাল ধ'রে এদেশে চ'লে আসচে।

কিন্তু কি রাষ্ট্রক্ষেত্রে, কি শিল্পক্ষেত্রে কোনো দেশেই কোনো স্বেচ্ছাচার বা যুক্তিহীনতা দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব পায়নি। এদেশেও আজ তার কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটতে শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই চলচ্চিত্রক্ষেত্রে কিছুসংখ্যক সাহিত্যসচেতন ব্যক্তির শুভাগমনের ফলে আবহাওয়ার কিছু কিছু পরিবর্তন

ঘটতে শুরু হয়েছে। তাঁরা বুঝেছেন—শিল্পের প্রথম আশ্রয় সাহিত্যে, তারপর নাটকীয় ঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে তার চরম সার্থকতা ঘটে অভিনয়ে। গত কয়েক বছরের মধ্যে আমরা এমন কয়েকখানি ছবির পরিচয় পেয়েছি—যা সাহিত্যের পূর্ণ মূল্য দিয়েও শিল্পোৎকর্ষে উন্নীত হ'য়ে উঠতে কোথাও বাধা পায়নি। এর জন্য এই নবতম সাহিত্য-সচেতন চিত্রগোষ্ঠীর উদ্যম প্রশংসনীয়। আশা করা যায়, তাঁদের প্রযোজিত এই পথ ধ'রে আগামী দিনে আরও বহু উদ্যোগী পুরুষ একাজে এগিয়ে আসবেন। সেদিন এদেশে শুধু চলচ্চিত্রেরই জয়জয়কার নয়, সাহিত্যেরও জয়জয়কার।

॥ একটি যুগ-সমস্যা : অবাধ্য ছেলে-মেয়ে ॥

অপরিণতবয়স্ক ছেলেমেয়েদের অপরাধপ্রবণতা সম্পর্কে আজ সারা পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বিশেষ সচেতন হ'য়ে উঠেছেন। 'Teen aged' অর্থাৎ তের থেকে উনিশ বছর অবধি ছেলেমেয়েদের যে বয়স, এই বয়সের উপর পারিবারিক প্রভাবের মতো সমাজের পারপার্শ্বিক প্রভাবটাও অসাধারণ। এই প্রভাব যেখানে স্বরুচিপূর্ণ, সেখানে ছেলেমেয়েরা স্বাভাবতঃই সুন্দরভাবে গ'ড়ে ওঠে। কিন্তু যেখানে এই প্রভাব বিপরীতধর্মী, সেখানে তারা ক্রমেই অবাধ্য হ'য়ে মানসিক চপলতায় এমন সব অপরাধের আশ্রয় নেয়—যা শুধু সমাজবিগর্হিত নয়, অনেক ক্ষেত্রে আইনবিরুদ্ধও।

এই জাতীয় ছেলেমেয়েদের কিভাবে সংশোধন ক'রে তোলা যায়, সে সম্পর্কে নয়াদিল্লীর Central Bureau of Investigation কিছুকাল পূর্বে এক সেমিনারের ব্যবস্থা করেন। নানা আলোচনার মাধ্যমে তাঁরা শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির দ্বারা এই জাতীয় অপরাধপ্রবণ ছেলেমেয়েদের মানসিকতাকে শ্রেয়তার দিকে এগিয়ে নেওয়া যায়। এটা থিয়োরেটিকেল বিশ্বাস হ'লেও এর মূল্য অনেকখানি। কারণ থিয়োরীই পরে প্রাকটিশে পরিণত হয়। তাতে যদি মূল উদ্দেশ্যের সুফল দেখা দেয়, তবে বিশেষ কোনো সমস্যার আমরা সমাধান খুঁজে পাই।

অনেকেই জানেন—একটা বয়স পর্যন্ত বেশীর ভাগ শিশুই কিছু না কিছু অবাধ্যতার পরিচয় দেয়। ধীরে ধীরে তারা বড় হ'য়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে যখন বাইরের পরিবেশের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটে, তখন যদি তাদের অপরাধপ্রবণ মনের অনুকূল কোনো ঘটনা শিশুর চেতনাকে কোনোভাবে আচ্ছন্ন করে, তবে তারই আশ্রয় নিয়ে সে অধিকতর অবাধ্য ও অপরাধপ্রবণ হ'য়ে ওঠে। এ সময়টা তাদের মন স্বাভাবতঃই নরম থাকে। এই মনকে অনেকখানি ক্যামেরার লেন্সের সঙ্গে তুলনা করা যায়। যে ছবি এসে সেই লেন্সে প্রতিফলিত হয়, তারই ছাপ থেকে যায়। দুঃখের বিষয় যে, বর্তমান পৃথিবীর দ্রুত পটপরিবর্তন ও সমাজ-ব্যবস্থার ক্রমিক অবনতির ফলে পৃথিবীর সব দেশেই অধিকাংশ ছেলেমেয়েরা এমন সব ঘটনার সম্মুখীন হ'চ্ছে—যা

তাদের নৈতিক উন্নতির পরিবর্তে অপরাধপ্রবণতাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই অপরাধ প্রধানতঃ ছেলেদের মধ্যেই অধিকমাত্রায় সংক্রামিত। এদের অনেকেই কৈশোর অতিক্রম করেনি। বিভিন্ন দেশে এসব ছেলেমেয়েদের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তা হ'চ্ছে—ইংলণ্ডে 'টেডি বয়েজ', 'মড্‌স' ও 'রকার্স', ফ্রান্সে 'ব্লাউসন্স-নয়ার্স' বা 'ব্ল্যাক-সার্ট্‌স', অস্ট্রেলিয়ায় 'বজি্', তাইওয়ানে 'তাই-পাউ', জাপানে 'মামবো বয়েজ', ইতালীতে 'বাট্রিল্‌স' বা 'বীটেলোনি', সাউথ আফ্রিকায় 'টট্‌সি', নেদারল্যাণ্ডে 'নজমা', অস্ট্রিয়া ও জার্মানীতে 'হাব্‌স্টার্কেন', সুইডেনে 'র‍্যাগারী', যুগোস্লাভিয়ায় 'ট্যাপ্‌কারোচি', পোল্যাণ্ডে 'দি হুলিগান্‌স' এবং রাশিয়ায় 'স্টীলাগিয়াই'।

এদের উপর যে নামই আরোপ করা হোক্ না কেন, আসলে এদের চরিত্র পৃথিবীর সব সমাজেই প্রায় এক। সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে তারা শুধু ভিন্নতর রূপ নিয়ে দেখা দেয় মাত্র। কোথা থেকে শুরু করলে এ সমস্যার কার্যকরী সমাধান হ'তে পারে, তা আলোচনা করতে গিয়ে Central Bureau of Investigation-এর সেমিনার মনে করেন যে, শিশুর মনে অবাধ্যতা ও অপরাধপ্রবণতা গ'ড়ে উঠবার আগে থেকেই তাদের মনকে শোভন ক'রে গ'ড়ে তুলবার দরকার। নইলে এসব ছেলেকে ভালোর দিকে ফেরানো প্রায়শঃই কঠিন হ'য়ে পড়ে।

বিগত কয়েক বছরে দ্রুত অর্থনৈতিক চাপে সমাজের রূপান্তর ঘটায় অভিভাবক শ্রেণীর মধ্যে এমন বিভ্রান্তির সৃষ্টি হ'য়েছে—যার ফলে সন্তানদের দিকে উপযুক্ত দৃষ্টি দেওয়া প্রায়শঃই তাঁদের পক্ষে সম্ভব হ'য়ে উঠচে না। সন্তানরাও তাদের অভিভাবকদের প্রভাব কাটাতে চেষ্টা ক'রে প্রতিবেশীর প্রভাবকে নিজেদের রুচির অনুকূল ব'লে মনে করছে। ফলে জাতীয় চরিত্রের ট্রাডিশন ভেঙে পড়ছে। শিল্পপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গেও এই ট্রাডিশন বহুলাংশে ভেঙে যাচ্ছে। যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে যাবার মূলেও এই শিল্পপ্রসারতা। অধিক ক্ষেত্রেই দারিদ্র্য প্রবল হ'য়ে উঠচে। এও ছেলেমেয়েদের অপরাধের একটি অন্যতম মূল কারণ। যুবকেরা অধিক ক্ষেত্রেই আজ বিভ্রান্ত ; তাদের সামনে এমন কোনো ভরসার চিত্র নেই—যা তাদের সংযত ও আশ্বস্ত হ'তে প্রেরণা দিতে পারে। সমাজের পুরনো বনিয়াদ ভেঙে যাওয়ায় এবং বর্তমান যুগের অব্যবস্থিতচিত্ততায় ছেলেদের মধ্যে যেরকম অপরিণামদর্শিতা দেখা দিয়েছে,

তাকে আরও জোরালো ক'রে তুলেছে এযুগের নানা শ্রেণীর পর্ণগ্রাফীর বই, যৌন আবেদনপূর্ণ নানা জাতীয় পোষ্টার এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ।

আমোদপ্রমোদ ছেলেমেয়েদের অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু তারও শ্রেণী আছে। সেখানে বিভিন্ন প্রোজেক্টের মতো সামাজিক আইনানুগ বাঁধ দেবার প্রয়োজন।

একথা বলতে আজ সংকোচ নেই যে, ভারতের মতো দেশে স্বাধীনতার প্রথম দিন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে সুদীর্ঘ বিশ বছরকাল, তা এদেশের উচ্চপর্যায়ের নেতৃবর্গের আত্মসচেতনতা ও সমাজমানসের রূপ পরিবর্তন সম্পর্কে ঔদাসীন্যই বৃহত্তর একশ্রেণীর লোককে নৈতিক অবনতির পথে টেনে এনেছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই পাশ্চাত্যদেশের আইনসম্মত রীতিনীতি ও আদব-কায়দা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কিন্তু তৎ তৎ দেশীয় ভাবধারায় নিজেদের দেশকে সভ্য ক'রে গ'ড়ে তুলবার মতো মানসিকতা তাঁদের মধ্যে বড় একটা দেখা গেল না। বরং ইংরেজ যে Divide and Rule নীতিদ্বারা ভারত শাসন ক'রে গেছে, তদনুরূপ নীতির পোষকতা করতে গিয়ে নেতৃবর্গ পদে পদে নিজেদের অযোগ্যতায় নিজেরাই হোঁচট খেয়ে জনসাধারণের কাছে ধিকৃত হ'য়েছেন। ফলে জনসাধারণ অধিক ক্ষেত্রে নিজেদের খেয়ালের বশবর্তী হ'য়ে গভর্ণমেণ্ট ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অঙ্গুলিহেলনকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে অবহেলা করেছে। গভর্ণমেণ্টও অধিক মাত্রায় বিবৃতিদ্বারা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা ভ'রিয়ে কার্যতঃ এই গণ-খেয়ালের উপযুক্ত প্রতিবিধান করতে সক্ষম হয়নি। ফলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত উচ্চ-নীচ সকল স্তরের মানুষের মধ্যেই লাবণ্য অন্তর্হিত হ'য়ে বন্যভাব প্রবল হ'য়ে ওঠে। জাতির জীবনে Rationality র চাইতে যখন এরকম Animality বড় হ'য়ে দেখা দেয়, তখন যা অবস্থা হয়, সাম্প্রতিককালের ভারতবর্ষে তাই হ'য়েছে। বিকৃতি এসেছে সমাজের উঁচুতলা থেকে নীচুতলা অবধি সর্বত্র। যুবকেরা বিভ্রান্ত এবং জীবিকার্জনের সুযোগাভাবে বিপর্যস্ত ও জীবন-বিমুখ, বয়স্করা অবসাদগ্রস্ত জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে পণ্যমূল্যের অত্যধিক চাপে মুহ্যমান, আর চারদিকে ঘুষ ও ঘুষোঘুষি; বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু ক'রে আইনসভা আর কোর্ট-কাছারী ও কর্পোরেশন থেকে শুরু ক'রে নিম্নতম মুদিখানা পর্যন্ত সর্বত্র ঘুষ আর ঘুষোঘুষি। পারস্পরিক আচার-ব্যবহার অবধি নিম্নমানের আকার নিয়ে সমাজদেহকে পশুচর্মের

আবরণে আচ্ছাদিত ক'রে ফেলেছে। যারা সুকুমারমতি বালক, তারা অবধি আজ নীতিবিগর্হিত কার্যাবলীর মধ্যে এসে নিজেদের ভবিষ্যৎ ও জাতির ঐতিহ্যকে মসীলিপ্ত ক'রে তুলছে। যে ঘুণ সমাজের গাঁটে গাঁটে গত বিশ বছর ধ'রে ধরেছে, তা বিদূরিত হবার আশু কোনো সম্ভাবনা নেই। সামাজিক ন্যায়াচরণ ও সৎ জীবনযাত্রার জন্য হোমগার্ড, সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ভলাণ্টিয়ার, পুলিশ বা বিভিন্ন সমাজ-কল্যাণ সমিতি যে জনসাধারণের উপর চাপ দেবে, এরকম বিধিব্যবস্থারও এ-পর্যন্ত পুরোমাত্রাতেই অভাব। সুতরাং কিসের উন্মাদনায় এবং চোখের সামনে কোন্ ভরসার চিত্র দেখে দেশের ছেলেমেয়েরা সুন্দর স্বভাব ও সৎ চরিত্র নিয়ে গ'ড়ে উঠবে, সেইটেই আজকের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। ছেলেমেয়েদের মধ্যে সংখ্যায় ছেলেরাই যে অধিক মাত্রায় ক্রমে অপরাধপ্রবণ হ'য়ে উঠচে, এ চিত্র যেমন ভয়াবহ, তেমনি বেদনাদায়ক। সাম্প্রতিক প্রকাশিত একটি রিপোর্টে যা দেখা যায়, তা এইরূপ—

—'In India delinquency rates are going up with the pace of industrialisation and urbanisation. There are more cases of delinquency naturally in the major cities than in the smaller towns, with the rapid growth of population more problems are being created. The problem is not as alarming as in the west, but nevertheless it is grave. In 1958 there were 26,774 Juvenile crimes. In 1959 this figure rose to 27925. In 1960 it was 29276. It steadily rose to 53776 in the next year and in 1962 it reached 53803. This shows that the number of crimes in 1962 are almost double the number in 1958. One of the major difficulties we face to day is inadequate and incomplete statistics with regard to juvenile delinquency.'

যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজেশন, আর্বানাইজেশন ও গ্রোথ অব পপুলেশনের কথা এখানে উল্লেখ করা হ'য়েছে, সেগুলোকে ধ'রে নিয়েও একথা মনে করা যেতে পারে যে, কোনো দেশের কোনো যোগ্য সদাচারী গভর্ণমেণ্টেরই কোনো

অসাধ্য কাজ নেই। ভারতবর্ষেও তাই। এখানে Adult delinquency বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই Juvenile delinquency বন্ধ হ'য়ে যেতে পারে। তার জন্যে এখনই যদি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা না যায়, তবে গোটা দেশটাই রকার্সদের আড্ডায় পরিণত হ'য়ে ডেলিংকোয়েণ্ট্ হ'য়ে যাবে, তাকে সভ্যতার উচ্চাসনে তুলে বসানো আর বুঝি সম্ভব হবে না। আমরা জানি, দিল্লীর 'Central Bureau of Investigation', কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত 'The Calcutta Bureau', বোম্বের 'Children's Act' প্রভৃতি সংস্থা একাজের দায়িত্ব নিয়ে ইতিমধ্যে কিছু কিছু কাজ করেছেন। কিন্তু এ কাজকে আজ জাতীয় প্রতিরক্ষা ও খাদ্যোৎপাদনের মতই প্রাধান্য দিয়ে দ্রুত ফলবান ক'রে তুলবার প্রয়োজন। কারণ একটা দেশের পরিচয় তার মানুষ। সেই মানুষ যতক্ষণ না রুচিবান, আদর্শবান ও চরিত্রবান হ'য়ে পুরোপুরি সভ্য হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে, ততক্ষণ তার প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থাই খুব বেশী কাজে আসচে না।

॥ স্বাগত নব দ্বৈপায়ন ॥

যদিও এ দেশ রামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ-'এর দেশ, তবু এদেশ ভারতবর্ষ, ভারত-আত্মায় গঠিত এর জল মাটি। 'যত মত তত পথ' হচ্ছে জ্ঞানমার্গের কথা, সাধনমার্গের কথা। অর্থাৎ যার যত মানসিকতার দ্বারা যে পথেই তুমি যাও, শেষ পথ বৈকুণ্ঠ, সেখানে সব মানুষের সব মানসিকতার একত্র অবগাহন। এ যেন নদীর মতো। নানা নদী নানা দিকে প্রবাহিত, কিন্তু সব নদীর গতিই এক সমুদ্রের দিকে। সেখানে এসে সব নদী নদীত্ব হারিয়ে সমুদ্র হয়ে যায়। এ চিন্তা সর্বাঙ্গীন ভারতচিন্তা, এ বোধ একান্তই ভারতবোধ। কারণ ভারতীয় দর্শনের অন্তরঙ্গ সুরটিই হচ্ছে এর মূলগত সুর।

যদি বলি, এই শতাব্দীর উত্তরত্রিশে এসে এই সুর থেকে আমরা মূলতঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি, তবে বোধ করি খুব বেশী বলা হবে না। ইংরেজি শিক্ষার বহিরাঙ্গিক দিকটি এজন্য যতখানি দায়ী, ততোধিক দায়ী একালের উদ্ধত উগ্র রাজনীতি। শুধু ইংরেজের অধীনেই এদেশ দুশো বছর পদানত ছিল না, তারও আগে কয়েক শতাব্দী ধ'রে ভারত-আত্মা রুদ্ধকণ্ঠে অশ্রু বিসর্জন করেছে। এই দীর্ঘ শতাব্দী সমূহের পুঞ্জীভূত গ্লানি ইংরেজ রাজত্বের শেষ অঙ্কে এসে আমাদের স্বাধিকার অর্জনের প্রয়াসকে যখন উদগ্র ক'রে তুললো, তখন এদেশের সাধন পূজন জ্ঞান ও আরাধনা একটি স্থির নীতিতে এসে সংহত হতে চাইল ; সে নীতি হলো রাজনীতি। কিন্তু এ নীতি যদি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে অবসিত হবার মতো মানসিকতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারতো, তবে এ দেশের স্বর্ণ-শিরে এসে সারা পৃথিবী সোনার মুকুট পরিয়ে দিতো, কিন্তু তা হয়নি। গোড়ার দিকের জাতীয় সংগঠন পর্যন্ত এ দেশ এবং এদেশের ভাগ্য সকলের মূলগত চিন্তার বিষয় ছিল। পর-শাসন থেকে দেশকে উদ্ধার করবো, দেশের ও জাতির মঙ্গল করবো, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ যাতে সুস্থ জীবনযাত্রা নির্বাহের মধ্য দিয়ে উন্নত হতে পারে, এ চিন্তা তখনকার রাজনীতিক কর্মীদের শুধু মাথায় নয়, অন্তরে ছিল। দেশটাই ছিল তখন প্রধান।

কিন্তু যেহেতু তুমি পার্টি করেছ, অতএব আমিও করবো, অথবা যেহেতু তোমার মুক্তিসংস্থা দীর্ঘকালের নায়কত্বের ফলেও যখন অকৃতকার্যতা ও সুবিধাবাদের দোষে দুষ্ট, সেই হেতু তোমার সংস্থাকে নস্যাৎ করবার জন্যে আমার সংস্থা গঠনের প্রয়োজন, প্রয়োজন আমার আত্মস্বাতন্ত্র্য-শক্তির। এই বোধের দ্বারা চালিত হ'তে হ'তে এদেশে নিত্য নব পার্টির জন্ম হ'তে শুরু হলো। এখানেও যত মত তত পথ, কিন্তু এই সব পথেরই গতি হওয়া উচিত ছিল এক বৈকুণ্ঠে, অর্থাৎ এক ভারত-চিন্তনে। ভারতবর্ষ শুধু আমাদের দেশ নয়, দেশ-জননী; জ্ঞানের দ্বারা সাধনার দ্বারা সংগ্রামের দ্বারা ত্যাগের দ্বারা শক্তির দ্বারা সেই দেশ জননীর পূজার মধ্য দিয়ে জাতির কল্যাণবিধানই তো একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। সব পার্টির সব মেনিফেষ্টোই এই উদ্দেশ্যজাত ব'লে ধর্তব্য। যদি প্রশ্ন করা যায়, তবে অবশ্য এই উত্তরই মিলবে সকল সংস্থার কাছ থেকে। সুন্দর যুক্তির দ্বারা সুললিতভাবে তারা বুঝিয়ে দেবে—দেশের কল্যাণ একমাত্র তাদের স্বকীয় শক্তি ও সংগ্রামের মধ্যেই নিহিত। এই ভাবে আজ অবধি দেখা যাচ্ছে—সারা ভারতবর্ষে যত পার্টির সৃষ্টি হয়েছে, সারা পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র মিলেও বোধ করি এত সংখ্যক পার্টি নেই।

তবু আশ্বস্ত হওয়া যেতো—যদি সব পার্টি পুরোমাত্রায় ভারতীয় মানসিকতায় গড়ে উঠতো। কিন্তু যখন দেখা যায়—ছেলে তার মায়ের বুকের দুধের বোঁটা মুখে দিয়ে পাতানো মাসীর বুকের সোহাগকে ইহকাল-পরকাল সর্বস্ব ক'রে বসে আছে, অথবা মায়ের দুধ খেতে খেতে মায়ের বুকেই লাথি মারছে, তখন সেই ছেলের সুস্থ ও স্বাভাবিক জন্ম সম্পর্কে স্বাভাবতঃই প্রশ্ন জাগে। তেমনি প্রশ্ন জাগে আজকের ভারত-ভূখণ্ডে গঠিত বিভিন্ন পার্টি সম্পর্কে। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে দেশ এসব পার্টির কাছে কিছু নয়। দেশের কাজটা এদের কাছে উপলক্ষ, মূল লক্ষ্য হচ্ছে নিজেদের গোষ্ঠী ও গোষ্ঠীস্বার্থ—যাকে চিনির মোড়কে আদর দিয়ে লালিত করছে পাতানো মাসীর দল। এরা নানাভাবে দেশের কল্যাণ করতে গিয়ে দেশের বিপর্যয় সাধনই করছে। তরুণ কিশোর জীবন থেকে শুরু করে বার্ধক্যের শেষ ধাপ পর্যন্ত অবাধ গতিতে এই রাজনীতিক দল সমূহের প্রভাব সম্প্রসারিত। সেখানে ভারতীয় দর্শন মিথ্যা, কারণ সে-দর্শনে নাকি কিছু নেই; সেখানে ভারতীয় ভাবধারা

মূল্যহীন, কারণ তা নাকি প্রগতিধর্মী নয়; ফলে ভারতীয় শিক্ষা ভারতীয় আদর্শে এদেশে আজ পর্যন্ত গড়ে উঠলো না। তার পরিবর্তে যা গড়ে উঠলো, তা শিক্ষার নিম্নশ্রেণী থেকে শুরু ক'রে বাজারের পণ্য পর্যন্ত সর্বব্যাপী অরাজকতা ও হাহাকার। এদেশে যত পার্টি আছে, তারা একটি ক্ষেত্রে মূলতঃ এক আদর্শের পথিক সন্দেহ নেই, তা হচ্ছে দেশের অশান্তি, অসন্তোষ, হাহাকার ও এই অরাজকতাকে জিইয়ে রাখা। এই ভাবেই নিত্য নতুন পার্টির জন্ম হচ্ছে। কেউ তারা সম্মিলিত শক্তির দ্বারা জাতীয় সমস্যাবলীর সমাধান করতে পারছে না। অদূর ভবিষ্যতে দেখা যাবে—পঞ্চাশ কোটি মানুষের প্রায় দুই তৃতীয়াংশই পার্টি। অতএব তাদের জন্য প্রতি প্রদেশে পার্টিস্থান চাই, অর্থাৎ পার্টিশান। বিশ বছরের স্বাধীন ভারত তবে নব নব স্বাধীন রাজ্যে জন্ম নিয়ে স্বর্ণময়ী হয়ে উঠবে। তার পূর্বে মা যা হয়েছেন, তা মহাশ্মশানে ছিন্নমস্তা, আমরা প্রেত-সন্তানেরা নৃত্য করছি সেই শ্মশান-যজ্ঞে।

জানি, সমাজদেহে যখন ঘুণ ধরে, যখন কোনো পরাক্রমশালী শক্তির ইস্পাত-ফলকে মরচে পড়ে, তখন সমাজ রক্ষার দায়িত্ব বহন করতে আসে নতুন শক্তি; আসাই তার প্রয়োজন। কিন্তু সেই নতুন শক্তির ধাবকদের সমাজগত প্রাণ চাই, চাই দেশগত মানসিকতা। বংশ মর্যাদা যেমন বড় মর্যাদা, তেমনি জাতি-মর্যাদা বড় মর্যাদা। জাতিত্বহীনের স্থান পৃথিবীতে নেই। সাময়িক বা উদ্দেশ্যসাধিত মনোবৃত্তিতে বহিঃশক্তি তোমাকে হয়তো একবেলা হোটেলে এণ্টারটেন করবে, কিন্তু তার রান্নাঘরে নিয়ে আসন পেতে তোমাকে আহারে আপ্যায়িত করবে না। নিজের জাতিই তা করে। সেই জাতি যেখানে অনাত্মীয়বোধে অবহেলিত হয়, তার অভিশাপ থেকে তোমারও মুক্তি নেই। তাই চাই এই মহাযজ্ঞে নতুন হোমাগ্নি-শিখা। সেই শিখা আমাদের মধ্যে আসুক নতুন ক'রে অধিকমাত্রায় স্বদেশপ্রেম, আসুক এদেশের গরীবের ভিটায় স্বাচ্ছন্দ্যের পূর্ণতা, আসুক ধনীর স্বাতন্ত্র্যগত অহংকারকে চূর্ণ ক'রে সমতার শঙ্খনিনাদ, আসুক শিক্ষায় দীক্ষায় মননে প্রাণনে বিষয়ে আসয়ে অশনে বসনে জীবনে যৌবনে পরিপূর্ণ জাতীয়তা, ভারতীয়তা। সব অরাজকতার মাঝ থেকে বেরিয়ে আসুক সেই যৌবন যার একহাতে সোনার ঝাঁপি, অন্য হাতে বেদান্ত; সে এসে জন্ম দিক নতুন সমাজের, নতুন জাতির।

এই 'যত মত তত পথ'-এর দেশে তারাই পারবে এই অর্ধকোটি মানব-আত্মাকে এক বৈকুণ্ঠে নিয়ে যেতে—যেখানে নতুন প্রভাতসূর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে স্বর্ণময়ী ভারতভূমি। দীন চণ্ডাল থেকে উচ্চতম ব্রাহ্মণের হাসিতে তবে নতুন অক্ষরে রচিত হবে এদেশের জীবন-বেদ। স্বাগত জানাই সেই নব যৌবনকে, নব ব্যাস, নব রামকৃষ্ণ--কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে।

॥ নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ॥

বঙ্গরঙ্গমঞ্চে যিনি যুগান্তর সৃষ্টি করলেন, তিনিই নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র। কোনো কোনো সৌখীন নাট্যসংস্থায় প্রথম প্রথম তিনি দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের দু'একটি ভূমিকায় অভিনয় ক'রে নিজের জীবনে মঞ্চাভিনয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ক্রমে নিজেই নাট্যরচনায় অগ্রসর হন। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, নাট্যকার হিসেবে তিনি নিছক রচয়িতার ভূমিকার মধ্যেই নিজেকে নিঃশেষ করেননি। সেই সঙ্গে নাট্যবিদ্যার কলাকৌশল সংযোজনায়ও অধিকমাত্রায় নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। তিনি সুদক্ষ অভিনেতা হবার গুণে নাটকের ঘটনা-পারম্পর্য, দৃশ্যের অবতারণা এবং পাত্রপাত্রীর মুখে কথার সংযোজন—কোনটা কীভাবে সাজালে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী ও লোকরঞ্জনের সহায়ক হবে, তা অন্যের অপেক্ষা তাঁর পক্ষে আয়ত্ত করা সহজ ছিল।

থিয়েটারের নানা কাজে এভাবে ব্যাপৃত না থাকলে হয়তো বাংলা ভাষায় তাঁর কাছ থেকে আমরা অন্ততঃ একখানা অভিনয় দর্পণ পেতাম এবং তা আমাদের অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকতো। তা না পেলেও তাঁর বিক্ষিপ্ত রচনার মধ্যে অভিনয়-আঙ্গিক সম্পর্কে যেটুকু আলোকপাত তিনি ক'রে গেছেন, তার মূল্যও আমাদের কাছে কম নয়। অভিনেতার দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি বলেছেন: 'নাট্যকার যে চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তা কিরূপভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, নট তাহা অনন্যমন হইয়া চিন্তা করেন। সে চরিত্র যদি স্বয়ং নাটককার তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন, তথাপিও নটের চিন্তা ফুরায় না। নাট্যকার যে ভাবাপন্ন হইয়া নাটক লিখিয়াছিলেন, নাটকীয় চরিত্র বুঝাইবার কালে তিনি সে ভাবাপন্ন নহেন, কিন্তু নটকে চিন্তাযোগে সেই ভাবাপন্ন হইতে হইবে।'

নাট্য-চরিত্রকে রূপ দেবার সময় সেই চরিত্রের পেশাগত বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখা নটের অবশ্য কর্তব্য। ভারত নাট্যশাস্ত্রেও এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, কোনো বিশেষ অঞ্চলের জীবনকে মঞ্চে রূপ দিতে হলে কেবল সেই অঞ্চলবাসীদের ভাষাসম্পর্কে জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট নয়; আঞ্চলিকজীবনের হাবভাব, বৈচিত্র্য, প্রবণতা,

রীতিনীতি এবং পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কেও নটনটির বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। তারই পরিপূরক হিসেবে বলা যায়, কোনো চরিত্রকে রূপায়িত করার সময় সেই চরিত্রের বৃত্তিগত লক্ষণের প্রতি অভিনেতার সজাগ দৃষ্টি থাকা দরকার। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র বলেছেন: 'কেবল হস্ত ও মস্তক সঞ্চালনই হাবভাব নহে। সৈনিকপুরুষ কথা কহিতেছেন, কিন্তু কথা কহিতে কহিতে অন্যমনে তরবারি-মুখে ব্যূহ রচনা করিতেছেন; মালিনী কথা কহিতে কহিতে অঙ্গুলিভঙ্গীতে মালা গাঁথে—এই সকলের প্রতি অভিনেতার বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য, যেন অভিনয়কালে এই সকল ভাবভঙ্গী স্বভাব-প্রসূত বলিয়া দর্শক মনে করেন।'

কোনো চরিত্রমানসকে মঞ্চে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে হ'লে মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে অভিনেতার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ না করলে কোনো চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব হয় কখনও সূক্ষ্মভাবে, কখনও বা স্থূলভাবে। কিরূপ ঘটনায়, কিরূপ পরিবেশে কোন চরিত্রের কি ধরণের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়, তৎপ্রতিও নট-নটির প্রখর দৃষ্টি রাখা দরকার। প্রসঙ্গতঃ অভিনয়ে মনোবিকলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।—'নটের সাধনায় সিদ্ধ হওয়া বড় অল্লায়াসসাধ্য নহে।...অভিনয়ের পন্থা কঠোর—কুসুমাবৃত নহে। নটের কণ্ঠস্বর লইয়া কাজ। অন্তর্দৃষ্টি করিতে হইলে অন্তর্বৃত্তি সকল তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ না করিলে দৃষ্টিতে অনেক ভ্রমপ্রমাদ ঘটে; এই বিশ্লেষণ কার্যে মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা তৎসম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা বুঝিয়া আপনার মনোবৃত্তির সহিত মিলাইয়া দেখিতে পারিলে কার্যের বিশেষ সহায়তা হয়। ভূমিকা কোথাও ক্ষুণ্ণ থাকিলে তাহা অভিনয়কালে অক্ষুণ্ণ করিয়া প্রদর্শন করা যায় কিনা, সে বিষয়ে নিয়ত চেষ্টা না করিলে নট নাটককারের যোগ্য ভাবপ্রকাশক হয় না।'

মঞ্চে অভিনেতার দ্বৈত সত্তা একটি বহু বিতর্কিত বিষয়। কেউ কেউ বলেন, অভিনয়ের সময় অভিনেতাকে স্বীয় ব্যক্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে নাটকীয় চরিত্রে তদ্‌গত হবে। এর বিরুদ্ধবাদীরা বলেন যে, অতি তন্ময়তা অভিনয়-কলাকে ক্ষুণ্ণ করে; অর্থাৎ নাটকীয় চরিত্রের আবেগ-অনুভূতির দ্বারা অভিনেতা এতটা সংক্রামিত হয়ে পড়েন যে, মঞ্চ-আঙ্গিকের প্রতি তখন তার

আর দৃষ্টি থাকে না। গিরিশচন্দ্র এই শেষোক্ত মতেরই পরিপোষক ছিলেন। তিনি বলেছেন: 'নট মনকে যেন দুই খণ্ড করিয়া অভিনয় করেন—এক খণ্ডে মন নিজ ভূমিকায় তন্ময়, অপর খণ্ড সাক্ষীস্বরূপ দেখে যে তন্ময়ত্ব ঠিক হইয়াছে কিনা,—নাটকের কথা ভুল হইতেছে কিনা,—প্রতিযোগী অভিনেতা ঠিক চলিতেছে কিনা,—যদি সে তাহার ভূমিকা ভুলিয়া থাকে, তবে তাহার প্রত্যুত্তর উপযোগী হইবে কিনা—রঙ্গালয়ের শেষ সীমা পর্যন্ত দর্শক শুনিতে পাইতেছে কিনা? এই সকল বিষয়ের প্রতি কলাবিদ্যাবলে নটের এককালীন দৃষ্টি থাকে ও তৎসঙ্গে অভিনয়ও চলে। মনের যে অংশ সাক্ষীস্বরূপ থাকে, তাহা গৌণ। তন্ময় অংশই মুখ্য। কিন্তু হাস্য রসের অভিনয়ে কখনো কখনো সাক্ষী-অংশ মুখ্য হইয়া উঠে।'

অন্যদিকে রূপসজ্জা ও বেশভূষা অভিনয়ের একটি অঙ্গ হিসেবে গ্রাহ্য। কোন্ চরিত্রের কিরূপ রূপসজ্জা ও বসন ভূষণ হওয়া উচিত, এসম্বন্ধে নটের সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। এসম্পর্কে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন: 'অভিনেতা ধ্যানে নিজ ভূমিকানুসারে প্রত্যেক ভূমিকার বেশ পরিবর্তন করিতে না শিখিলে তিনি ভ্রম উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবেন না। প্রত্যেক অভিনেতাকে প্রত্যেক ভূমিকায় বুঝিতে হইবে, কিরূপ সজ্জা তাঁহার ভূমিকায় উপযোগী হইবে।...অভিনয়কে বলা হয় বহুরূপী বিদ্যা। নাট্যকারের ধারণার উপর রং ফলাইতে হইবে অভিনেতাকে, ছবিকে প্রাণ দিতে হইবে অভিনেতাকে। ইহা অভিনেতার ধ্যানের প্রাণ, অন্যে তাহা জানে না। কল্পনারাজ্যে ভ্রমণ করিয়া কল্পনারাজ্যে দর্শককে আনা অভিনেতার কার্য।'

গিরিশচন্দ্রের রচনাবলীতে দৃষ্টিপাত করলে এরকম চিন্তার রসদ অজস্র মেলে।

অভিনয়ের এই টেক্‌নিকাল দিকগুলি ছাড়াও নাটক পর্যায়ে সাহিত্য রচনার পরিবর্তে নাটকাভিনয়ের মাধ্যমে জনগণকে শিক্ষা ও আনন্দ দেবার প্রবণতাই ছিল তাঁর প্রধান। এই কারণে সাধারণ পাঠ হিসেবে তাঁর নাটক যত না রসোত্তীর্ণ মনে হতো, তার চাইতে অধিক রসগ্রাহী হতো নাটকাভিনয়। এদিক থেকে যদি তিনি কোনো আদর্শ নাট্যকারকে অনুসরণ ক'রে থাকেন, তবে তিনি নিঃসন্দেহে উইলিয়াম সেক্সপীয়র।

লোকশিক্ষার দিক থেকে গিরিশচন্দ্রের অবদান অবিস্মরণীয়। রঙ্গমঞ্চের

মধ্য দিয়ে তিনি প্রধানতঃ যে দুটি আদর্শ প্রচার করতে চেয়েছিলেন, তা হচ্ছে একদিকে সমাজসংস্কার, অপরদিকে ধর্মনীতি। সমাজের যেখানে অনাচার অবিচার ও ব্যাভিচার মানুষের মনুষ্যত্বকে পঙ্গু ক'রে রেখেছে, সেখানে 'প্রফুল্ল', 'মায়াবসান' প্রভৃতি নাটকের মাধ্যমে জনসাধারণকে তিনি যেমন সেই দিকে অঙ্গুলি নিদেশ ক'রে দেখাতে চেয়েছেন, তেমনি জনচিত্তে ধর্ম ও মনুষ্যত্ব-বোধ জাগিয়ে তুলতে 'বুদ্ধদেব', 'শঙ্করাচার্য', 'শ্রীচৈতন্য', 'বিল্বমঙ্গল' প্রভৃতি ধর্মবেত্তাদের জীবনী পরিবেশন করারও প্রয়াস পেয়েছেন। এ সম্পর্কে তিনি যদি কারুর কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে থাকেন, তবে তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

কিন্তু তাই ব'লে ইতিহাসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকেননি গিরিশচন্দ্র। ভারতীয় ইতিহাসের যুগন্ধর পুরুষ অশোক, চণ্ড সৎনাম, সিরাজ, মিরকাশেম, ছত্রপতি প্রভৃতির জীবনী সম্বলিত নাটক রচনা ক'রে তিনি একদিকে যেমন দেশাত্মবোধ জাগ্রত ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাকে মঞ্চে সংস্থাপিত ক'রে জনগণকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তেমনি পৌরাণিক নাটক রচনাতেও বিশেষ সিদ্ধহস্ত ছিলেন গিরিশচন্দ্র: অথচ পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে তিনি যথাযথ গ্রহণ না ক'রে নিজের আদর্শগত ছাঁচে তাদের তৈরী ক'রে নিয়েছেন। তার মধ্য দিয়ে তাঁর যা প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল, তা হচ্ছে প্রধানতঃ সত্যনিষ্ঠা, আত্মোৎসর্গ, পাতিব্রত্য, নৈতিক সাহস প্রভৃতি। এসব নাটক রচনার প্রধান উৎস ছিল জাতীয় যাত্রাসঙ্গীত। এসব নাটক রচনায় এদেশীয় যাত্রার প্রভাবকে তিনি এড়িয়ে যেতে চাননি অথবা এড়িয়ে যেতে পারেননি।

লোককল্যাণের দিক ছাড়াও অবিমিশ্র আনন্দ পরিবেশনের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র প্রহসন জাতীয় নাট্যরচনাও অজস্র করেছেন। প্রচলিত সামাজিক, সাংসারিক ও পারিবারিক জীবন থেকে শুরু ক'রে বাংলার জাতীয় জীবন ও ঐতিহ্য—কোনো বিষয়ই তাঁর নাটক থেকে বাদ পড়েনি। স্বদেশের যে অতীতকে না জানলে বর্তমান কালটাই নিরর্থক হয়ে যায়, সেই অতীতটাকে আমরা নাটকে প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম গিরিশচন্দ্রে। এ যেন এক মহৎ ব্রতসাধনা। তাঁর সমসাময়িক কালের যেসব বিষয় তাঁর লেখনীতে বেদনার স্পর্শে মহৎ হয়ে উঠেছে, তা হচ্ছে প্রধানতঃ চাকরীজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর

সুখ দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্খলন পতন প্রভৃতি। অত্যন্ত দরদের সঙ্গে এদের জীবনচিত্র এঁকেছেন গিরিশচন্দ্র।

নাট্যরচনায় তাঁর ভাষাকে আমরা মূলতঃ দু'ভাগ করতে পারি: যেখানে সামাজিক নাটক গ'ড়ে উঠেছে, তাতে যেমন তিনি চলতি গদ্যের আশ্রয় নিয়েছেন, তেমনি ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে তিনি ভাষাকে পদ্যাত্মক করেছেন। তাতে অসমমাত্রিক মিলহীন পয়ার ছন্দের সঙ্গে মাইকেলি অমিত্রাক্ষর ছন্দেরও কিছু অনুরণন আমাদের কানে বাজে। কবিশেখর কালিদাস রায়ের বক্তব্য উদ্ধার ক'রে বলা যায়—গিরিশচন্দ্র যে ছন্দে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকগুলির অনেকাংশ লিখেছেন, তা গদ্য ও পদ্যের মাঝামাঝি। মাইকেল প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে কেবল মিলই নেই, কিন্তু ছন্দ-হিল্লোল আছে, মাত্রা যতির সুনির্দিষ্ট রীতি আছে। প্রত্যেক পংক্তির অক্ষর-সংখ্যার নির্দিষ্ট হিসেব আছে। গিরিশচন্দ্রের এ ছন্দে মাত্রা-যতির বালাই নেই, অক্ষরসংখ্যার কোনো নিয়ম নেই, ছন্দ হিল্লোলেরও পুরোপুরিই অভাব। গদ্যবাক্যের শব্দগুলির স্থান পরিবর্তন ক'রে এমনভাবে সাজানো হয়েছে—যাতে কবিতা ব'লে ভ্রম হয়। অবশ্য স্থানে স্থানে প্রকৃত কবিতার পংক্তিও এসে গেছে। কোন্ ভাষায় কোন ভঙ্গীতে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে রচনা করলে নট নটিদের রসনায় বেশ সুশ্রাব্য হবে এবং শ্রোতার চিত্তবিনোদন হবে, তা তিনি বিশেষ ভাবেই জানতেন। কাজেই এই ছন্দের উক্তিগুলি শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতো। গিরিশচন্দ্র এই ছন্দ মাত্র পরীক্ষিতভাবে ব্যবহার করেননি, এই ছন্দকেই তিনি প্রায় অর্ধশতাব্দী ধ'রে চালিয়ে গেছেন। অন্যান্য অনেক নাট্যকার এই ছন্দেরই অনুবর্তন করেছেন। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের বিষয়বস্তু ভারতের যে অতীত যুগের ইতিহাস থেকে গৃহীত, সেই অতীত যুগের স্মৃতি আমাদের স্বপ্নময়। গিরিশচন্দ্র লক্ষ্য করেছিলেন— সাধারণ গদ্যে এই স্বপ্নযুগের কথা তেমন জমে না। তাঁর এই ছন্দে অন্ততঃ সেযুগের একটা আবেষ্টনী রচনা হ'য়ে গিয়েছিল সন্দেহ নেই। এই ছন্দই গৈরিশি ছন্দ। তাঁর এই সহজাত ছন্দের আশ্রয়ে তিনি শুধু মৌলিক নাটকই রচনা করেননি, সেই সঙ্গে বঙ্কিম প্রভৃতির উপন্যাসেরও নাট্যরূপ দান করেছেন এবং সেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ প্রভৃতির স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছেন। নাট্যরচনায় তাঁর প্রথম হাতেখড়ি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ দান

থেকেই, ক্রমে গীতিনাট্য ও রূপকনাট্যে লেখনী সঞ্চালন করেন। এইভাবেই ধীরে ধীরে তাঁর প্রতিভা ভাস্বর হয়ে ওঠে।

কিন্তু নট-নটি পরিকীর্ণ যে নাট্যপরিবেশের মধ্যে তাঁকে দিবারাত্র যাপন করতে হয়, তা পারিপার্শ্বিক বহু বিদগ্ধ সমাজ ব্যক্তির মতো তিনি নিজেও সহ্য করতে পারতেন না, কিন্তু জীবিকার সঙ্গে জীবন আঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়ায় তা থেকে মুক্তি পাবার পথ ছিল না তাঁর। অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংস্পর্শে এসে তিনি ক্রমে দিব্য-জীবনের আস্বাদ পান এবং ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে নাটকের ক্ষেত্রেও তারই পরিচয় স্পষ্ট ক'রে তোলেন। এই অংশের সব চাইতে বড় উদাহরণ তাঁর শঙ্করাচার্য, বুদ্ধদেব, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, নিমাই সন্ন্যাস, তপোবন প্রভৃতি।

তাঁর নাটকাবলীর সাহিত্যমূল্য অদ্যাবধি স্বীকৃত হয় নি। যদি সে মূল্য অধিকও না হয়, তবু রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে তিনি যে মহাসামগ্রী বিচিত্রভাবে ও তথ্যে মিলিয়ে দেশবাসীকে দান ক'রে গেছেন, তার কাছে বাঙলা চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে। সেই সঙ্গে বঙ্গমঞ্চকে তিনি যে দেবমঞ্চে উন্নীত ক'রে গেছেন, সে কথাও চিরকাল স্মর্তব্য।

বাগবাজারের সম্ভ্রান্ত কায়স্থ নীলকমল ঘোষের মধ্যম পুত্র গিরিশচন্দ্র। এইবংশের আদি নিবাস গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর। তাঁর ভূমিষ্ঠকালে জননীর কঠিন পীড়া হেতু গিরিশের লালন-পালনের ভার পড়ে মণি নাম্নী এক বাগদিনীর উপর; এই পরিবারে সে বাসন মাজার কাজ করতো, তার স্তন্য পান করেই গিরিশচন্দ্র বড় হন। বাল্যকালে অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন তিনি। উত্তরকালে গিরিশচন্দ্র বলেন, 'আমি আজীবন এই প্রকৃতি-চালিত হইয়া আসিয়াছি। অন্যায় বা কঠিন বলিয়া যে কার্যে আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহাই সাধন করিতে আমি আগে ছুটিয়াছি।'—হেয়া'র স্কুলে তাঁর সহপাঠির মধ্যে অন্যতম ছিলেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বেণীমাধব দে প্রভৃতি। গিরিশের খুল্লপিতামহী রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পুরাণের কথা অতি চমৎকার ক'রে বলতে পারতেন। শুনতে শুনতে গিরিশচন্দ্র অভিভূত হয়ে পড়তেন। উত্তরকালে তিনি যে পুরাণোক্ত বিষয় নিয়ে নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হন, তার প্রথম অনুপ্রেরণা পান এই ছোটবেলা থেকেই। তিনি যতটা পিতৃ-আদর পেতেন, তার কিয়দংশও মাতৃস্নেহ পেতেন না। চিরজীবন তিনি পিতৃস্মৃতির

পূজো করেছেন। যখন ঘোর নাস্তিকতায় তাঁর বুদ্ধি আচ্ছন্ন, তখনও তিনি গঙ্গাস্নানে গিয়ে পিতৃ উদ্দেশ্যে অঞ্জলিপূর্ণ গঙ্গাজল প্রদান করতেন।

এ্যাট্‌কিনসন টিলটন কোম্পানীর বুককিপার শ্যামপুকুর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ নবীনচন্দ্র দেব সরকারের কন্যা প্রমোদিনীর সঙ্গে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের শুভপরিণয় হয়। যদিও বিদ্যালয়জীবনেই তাঁর অধ্যয়ন শেষ হয়, তবু সারা-জীবন তিনি অধ্যয়নপ্রিয় ছিলেন। বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ও তৎকালীন প্রকাশিত অন্যান্য প্রসিদ্ধ বাঙলা বই পাঠ ক'রে এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে'র নিয়মিত গ্রাহক হয়ে বাঙলা ভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মে। মনে মনে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে গুরুরূপে গ্রহণ ক'রে প্রথম প্রথম গিরিশচন্দ্র কবিতা রচনা করতেন এবং ক্রমে ভাষার আধিপত্য লাভের জন্য ইংরেজি কবিতা রচনা শুরু করেন। ইংরেজি সাহিত্যে অভিজ্ঞতালাভের জন্য এ সময়ে তাঁর ঐকান্তিক যত্ন ও দৃঢ় অধ্যবসায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সকল রচনার মধ্যে গীত রচনা তাঁর সাহিত্যকর্মের একটি বিশেষ দিক ছিল। তাঁর প্রথম রচিত গীতটি এই—

সুখ কি সতত হয় প্রণয় হলে।
সুখ অনুগামী দুখ, গোলাপে কণ্টক মিলে॥
শশী প্রেমে কুমুদিনী, প্রমোদিনী উন্মাদিনী।
তথাপি সে একাকিনী, কত নিশি ভাসে জলে॥

যৌবনে গিরিশচন্দ্র মদ্যপায়ী, স্বেচ্ছাচারী ও যথেষ্ট পরিমাণে উচ্ছৃঙ্খল হলেও পরোপকার তাঁর চরিত্রের একটি বড় গুণ ছিল। শ্বশুরের পীড়াপীড়িতে কিছুকাল তিনি অফিসে কাজ ক'রে পরে রঙ্গালয়ের সঙ্গেই নিজেকে পুরোপুরি যুক্ত করেন। উচ্ছৃঙ্খল জীবনে গিরিশচন্দ্র ক্রমে নাস্তিক্য পর্যায়ে এসে জড়বাদে অত্যধিক বিশ্বাসী হয়ে হিন্দুধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই একই সময়ে তাঁর অজান্তে তাঁর হৃদয়ে ঈশ্বর বিশ্বাস ধীরে ধীরে জাগ্রত হতে থাকে।

১৮৭২ সালের ৬ই ডিসেম্বর বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালার চিরস্মরণীয় দিন। এই দিনেই সাধারণ বঙ্গনাট্যশালা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ায় গিরিশচন্দ্র ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগদান করে 'কৃষ্ণকুমারী'

নাটকের মহড়ায় প্রথম শিক্ষাদান করেন এবং নাটকান্তর্গত ভীমসিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

১৮৭৪ সালটি ছিল তাঁর জীবনের বিশেষ শোকাবহ। এই বৎসরেই ২৮শে ডিসেম্বর তার পত্নীবিয়োগ ঘটে। এ্যাটকিনসন কোম্পানীর অফিস উঠে যাওয়ায় বাধা মাইনের চাকরীটিও তাঁকে হারাতে হয়। পরবর্তীকালে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র শিশিরকুমার ঘোষের অনুরোধে গিরিশচন্দ্র ইণ্ডিয়ান লীগে ও পরে পার্কার কোম্পানীর চাকরীতে যোগদান করেন এবং দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে উদ্যোগী হয়ে সিমলার বিহারীলাল মিত্রের প্রথমা কন্যা সুরত-কুমারীকে বিয়ে করেন। কিন্তু নাট্যশালাই ছিল গিরিশচন্দ্রের প্রাণ। 'রূপ ও রঙ্গ' পত্রিকায় (৬ই শ্রাবণ ১৩৩২) তাঁর সম্পর্কে লিখতে গিয়ে সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন: '...নাট্যবাণীর বরপুত্র গিরিশচন্দ্র ইহার দেহ (বঙ্গরঙ্গমঞ্চের) মৃতকল্প দেহে জীবন সঞ্চার করিলেন। তাহার সময় হইতেই লোকে বুঝিল, কেবল অভিনয় প্রতিভা লইয়া জন্মাইলে নাট্যশালার সর্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারা যায় না। নাট্যবাণীর পূজার প্রধান উপকরণ ইহার প্রাণ তাহার অন্ন—নাটক। গিরিশচন্দ্র এদেশের নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মাত্র নহে, তিনি অন্ন দিয়া ইহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, বরাবর স্বাস্থ্যকর আহার দিয়া ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন, ইহার মজ্জায় মজ্জায় রসসঞ্চার করিয়া ইহাকে আনন্দপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন, আর এইজন্যই গিরিশচন্দ্র Father of the Indian stage... বাংলা নাট্যে তাঁর পিতৃত্বের গৌরবের অধিকারী একা গিরিশচন্দ্র।'

তাঁর জীবনে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রভাব ছিল অসামান্য। রামকৃষ্ণ-দেবকে তিনি নিজেই শুধু গুরুরূপে পেয়েছিলেন, তা নয়, বাংলা রঙ্গমঞ্চও রামকৃষ্ণের আশীর্বাদে নবজীবন লাভ ক'রে ধন্য হয়েছে। কবি নবীনচন্দ্রের সঙ্গেও সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে তাঁর নাট্যরচনায় অসাধারণ অনুপ্রেরণা পেয়েছেন গিরিশচন্দ্র। এই সূত্রে তাঁকে লিখিত নবীনচন্দ্রের একখানি চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যায়। ১৯০৬ সালের ২৭শে আগষ্ট রেঙ্গুন থেকে নবীনচন্দ্র গিরিশচন্দ্রকে লিখছেন—

...'আমার অনুরোধ, তুমি ৭ দিনে প্রসব না করিয়া কিছু বেশীদিন সময় লইয়া আমাদের বর্তমান রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্পনীতি, দরিদ্রতা,

অন্নহীনতা, জলহীনতা, শিক্ষাবিভ্রাট, চাকরীবিভ্রাট, উকিল ডাক্তারবিভ্রাট, বিচারবিভ্রাট, উপাধি ব্যাধি—সকল বিষয়ের আদর্শ ধরিয়া এবং দেশোদ্ধারের উপায় দেখাইয়া একখানি comico Tragic নাটক লিখিয়া দেশকে রক্ষা কর। …নীলদর্পণের মতো একখানি নাটক তোমাকে অমর করিবে। তুমি বঙ্গমঞ্চের দ্বারা ধর্মে ও প্রেমে দেশ বহুবার মাতাইয়াছ। এবার স্বদেশপ্রেমে মাতাইয়া তোমার প্রতিভার উদযাপন করো। তুমি বই লিখে নিয়মিত অমিত্রাক্ষর ও মিত্রাক্ষর গদ্যের সঙ্গে চালাইবে। আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদূর পারি, তোমাকে উক্ত রচনায় সাহায্য করব। আমার অনুরোধটা রক্ষা করবে কি? আমার এরূপ পীড়াপীড়ির দরুণ বঙ্কিমবাবু আনন্দমঠ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার হাতের চিঠি আমার কাছে আছে এবং এতদিন পরে ইহার কি অমৃত ফল ফলিয়াছে দেখিতেছ। তবে তিনি আনন্দমঠে দেশোদ্ধারের উপায় দেখাইতে পারেন নাই। তুমি সেই উপায়ের সঙ্গে পূজার পদ্ধতিও দেখাইবে।'

নবীনচন্দ্রের এই অনুরোধ স্মরণে ছিল গিরিশচন্দ্রের। তিনি যে শুধু নাট্যরচনা ও রঙ্গালয় পরিচালনায়ই নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন, তা নয়, গল্প, উপন্যাস, নানা বিষয়ক প্রবন্ধ, কাব্য, সমালোচনা প্রভৃতি সাহিত্যের প্রায় সামগ্রিক ক্ষেত্রেই তাঁর লেখনী সমভাবে চলতো। সে যুগে এমন সব্যসাচী লেখক খুব বেশী ছিলেন না। গিরিশচন্দ্র নিজেই একটি যুগ রচনা ক'রে গেছেন। উত্তরকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'গিরিশ-লেকচারশিপ' প্রবর্তন ক'রে তাঁর স্মৃতির প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে, বঙ্গদেশ প্রগতির পথে অনেকদূর এগিয়ে এলেও গিরিশচন্দ্রের প্রভাব আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বঙ্গজনমনে গিরিশচন্দ্র আজও অমর।

জ্বালাময়ী, অগ্নিতুল্যা, বাঙ্গালাতেও নবীনবাবুর কবিতা সেইরূপ তেজস্বিনী, জ্বালাময়ী, অগ্নিতুল্যা।...নবীনবাবুরও যখন স্বদেশবাৎসল্যস্রোত উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না। সেও গৈরিক নিস্রবের ন্যায়। যদি উচ্চৈঃস্বরে রোদন, যদি আন্তরিক মর্মভেদী কাতরোক্তি, যদি ভয়শূন্য তেজোময় সত্যপ্রিয়তা ও যদি দুর্বাসাপ্রার্থিত ক্রোধ দেশবাৎসল্যের লক্ষণ হয়—তবে সেই দেশবাৎসল্য নবীনবাবুর।...বাইরণের ন্যায় তাঁহারও শক্তি আছে যে, দুই চারিটি কথায় তিনি উৎকৃষ্ট বর্ণনার অবতরণ করিতে পারেন।...কবিদিগের মধ্যে নবীনবাবুকে আমরা অধিকতর উচ্চ আসন দিতে পারি-না পারি, তাঁহাকে বাঙ্গালার বাইরণ বলিয়া পরিচিত করিতে পারি। এ প্রশংসা বড় অল্প প্রশংসা নহে।'

মূলতঃ নবীনচন্দ্র ছিলেন স্বভাবকবি। বুদ্ধির চাইতে হৃদয়াবেগের দ্বারাই পরিচালিত হ'তেন তিনি অধিক। ফলে তিনি যে 'আমার জীবন' নামে আত্মজীবনী রচনা করেন, তাতে তার ব্যক্তিকেন্দ্রিক অন্তরঙ্গ বিষয়গুলি যত সুন্দরভাবে বিস্তৃতাকারে প্রকাশ পেয়েছে, বহির্বিষয়ক বিষয়বস্তু ততখানি প্রকাশ পায় নি। অতি শৈশবকাল থেকেই তাঁর মধ্যে কাব্যানুরাগ প্রকাশ পায়। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই ব'লেছেন: 'পাখীর যেমন গীত, সলিলের যেমন তরলতা, পুষ্পের যেমন সৌরভ, কবিতানুরাগ আমার তেমনি প্রকৃতিগত ছিল। কবিতানুরাগ আমার রক্তে মাংসে, অস্থি-মজ্জায়, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে আজন্ম সঞ্চালিত হইয়া অতি শৈশবেই আমার জীবন চঞ্চল, অস্থির, ক্রীড়াময় ও কল্পনাময় ক'রিয়া তুলিয়াছিল।'...

এই কবিত্বশক্তির উত্তরাধিকার ঘ'টেছিল তাঁর পিতা গোপীমোহনের কাছ থেকে। ১৮৪৭ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামে নয়াপাড়া গ্রামে নবীনচন্দ্রের জন্ম হয়। জন্মাবধি তিনি যে পরিবেশে বড় হ'য়ে ওঠেন, সেখানে পিতা গোপীমোহন ও মাতা রাজরাজেশ্বরী ভিন্ন পিতৃব্যরাও বর্তমান ছিলেন। গোপীমোহন যেমন সুকবি ছিলেন, তেমনি নবীনচন্দ্রের পিতৃব্যরাও কাব্য এবং যাত্রার পালা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এই পরিবেশে নবীনচন্দ্রের মধ্যে কাব্যশক্তি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয়। শিশুকালে তিনি এত দুরন্ত ছিলেন যে, স্কুলে তাঁকে সকলেই ব'লতো wicked the great. ১৮৬৩ সালে এন্ট্রান্স পাশ ক'রে নবীনচন্দ্র যে মানসিকতা বোধ ক'রেছিলেন, সে

সম্পর্কে তিনি বলেন : 'প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত হইল। তাহাতে আমি বিস্মিত; দেশসুদ্ধ লোক তটস্থ হইল। যে ছেলের জেঠামিতে এবং দুর্বৃত্ততে একখানি নূতন কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড রচিত হইতে পারিত, সে প্রথম শ্রেণীতে পাশ হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পাইল, কথাটি কেহ বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিল না।'

তৎপর তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৮৬৫ সালে এফ এ এবং জেনারেল এ্যাসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউশন থেকে ১৮৬৮ সালে বি. এ পাশ করেন। অতঃপর পিতৃবিয়োগহেতু পারিবারিক দুরবস্থা ও সময়ে নিজের সরকারী চাকরীলাভ সম্পর্কে নবীনচন্দ্র প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনাটি এখানে উল্লেখযোগ্য : 'বি. এ পরীক্ষার যখন প্রায় তিনমাস বাকি, সেইসময় নবীনচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হয় (ইং ১৮৬৭, ভাদ্র)। পিতা একটি পয়সাও রাখিয়া যান নাই—রাখিয়া গিয়াছিলেন ঋণের বোঝা ও একটি নিরাশ্রয় বৃহৎ পরিবার। নবীনচন্দ্র শোকাশ্রু মুছিয়া বি. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। — পরীক্ষা দিয়া বেকার অবস্থায় চাকরির জন্য নানাস্থানে ঘোরাঘুরি করিতে লাগিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ সাটক্লিফ্ সাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে একমাসের জন্য হেয়ার স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন। সেখানে তাঁহাকে সাহিত্য পড়াইতে হইত।—দেখিতে দেখিতে একমাস কাটিয়া গেল। নবীনচন্দ্র আবার বেকার হইলেন।' কিন্তু কোনো প্রতিকূল অবস্থাই তাঁহাকে দমাইতে পারল না, জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন— লেঃ গভর্ণর গ্রে'র সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার কাছে নিজের দুঃখ নিবেদন করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি লেঃ গভর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট এক পত্র লিখিলেন। সেক্রেটারী তাঁহাকে দেখা করিবার অনুমতি দিলেন। কম্পিত বক্ষে নবীনচন্দ্র একদিন লাটপ্রাসাদে সেক্রেটারী স্টান্সফিল্ডের কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া সেক্রেটারীর হৃদয় বিগলিত হইল। শেষপর্যন্ত স্টান্সফিল্ডের চেষ্টায় নবীনচন্দ্র ডেপুটি মেজিস্ট্রেটি পরীক্ষার নমিনেশন পাইলেন। তিনি টাউনহলে প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। এমনিভাবে স্বাবলম্বী যুবক নবীনচন্দ্র অদৃষ্টের প্রতিকূলতাকে পরাহত করিয়া আত্মচেষ্টায় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া

সুখসৌভাগ্যের মুখ দেখিলেন।—তাঁহার কর্মজীবন যেমন কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল, তেমনি নানা চিত্তাকর্ষক ঘটনায় পরিপূর্ণ। সরকারী কর্মোপলক্ষে যশোহরে অবস্থানকালে শিশিরকুমার ঘোষের সংস্পর্শে আসিয়াই প্রকৃতপক্ষে তিনি দেশের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠেন।'

ছাত্রজীবনের অবকাশে ক'লকাতায় আসার পর শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে ক্রমে তাঁর পরিচয় ঘটে। শিবনাথ শাস্ত্রী তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। তাঁর আগ্রহ ও যোগাযোগ সাধনের ফলে প্যারীচরণ সরকার-সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেটে' নবীনচন্দ্র কবিতা লিখিতে শুরু করেন। প্যারীচরণ উৎসাহ দিয়ে বলতেন: 'তোমার বেশ শক্তি আছে। তুমি ইহার অনুশীলন কর।' সম্পাদকের এই উৎসাহ নবীনচন্দ্রের কাব্যজীবনে অনেক কাজে এসেছিল। তিনিই বাংলাসাহিত্যে নানা বিষয়ের উপর প্রথম খণ্ডকাব্য রচনা করেন। অন্যূন আঠারোখানি গ্রন্থ রচনা ক'রে যান নবীনচন্দ্র, যথা—অবকাশরঞ্জিনী, পলাশীর যুদ্ধ, ভারত-উচ্ছ্বাস, ক্লিওপেট্রা, রঙ্গমতী, রৈবতক, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, শ্রীমদ্ভাগবদগীতার পদ্যানুবাদ, খ্রীষ্ট, প্রবাসের পত্র, কুরুক্ষেত্র, অমিতাভ, প্রভাস, শুভনির্মাল্য, ভানুমতী, আমার জীবন, অমৃতাভ এবং নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। এতদ্ব্যতীত তাঁর নানাবিষয়ক রচনা ও চিঠিপত্র নানা পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একদা তিনি অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। পরিষদের প্রাথমিক আকার দানে তিনি যে দক্ষতা ও পারদর্শিতার পরিচয় দেন, তার তুলনা নেই। তাঁর কাব্যের ভাষা যেমন সহজ, তেমনি সরল অর্থবাহী প্রকাশভঙ্গী। নমুনাস্বরূপ এখানে তার সামান্য উদ্ধৃতি উদ্ধার করা যেতে পারে। যেমন:—

'নিবেছে অনল! নিবেনি এখন,
কে নিবা'বে বল, নিবিবে কেমনে?
সপ্তশত বর্ষ জ্বলিছে এমন,
কতশত বর্ষ জ্বলিবে কে জানে?
যেই দিকে দেখি,—এই মহানল!
কোথায় ভারত?—অনন্ত শ্মশান!
শ্মশান-শ্মশান-শ্মশান কেবল!
রাবণের চিতা, লঙ্কার প্রমাণ!' —(শব-সাধন)

... .. .

'কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্র কিরণ!
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি!
তুমি অস্তাচলে, দেব, করিলে গমন,
আসিবে ভারতে চির বিষাদ রজনী।
এ বিষাদ-অন্ধকারে নির্দয় অন্তরে,
ডুবায়ে ভারতভূমি যেও না তপন,
উঠিলে কি ভাব মনে নিরীক্ষণ ক'রে,
কি দশা দেখিবে আহা! ডুবিছ এখন,
পূর্ণ না হইতে তব অর্ধ আবর্তন,
অর্ধ পৃথিবীর ভাগ্য ফিরিল কেমন।

— পলাশীর যুদ্ধ)

কাব্যের মতো নবীনচন্দ্রের গদ্যের ভাষাও সহজ ও সাবলীল, কোথাও কোথাও তা পরিহাসপ্রিয় ও নৃত্যমুখর। তাঁর এই গদ্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ 'আমার জীবন'। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে—

—"তখন অপরাহ্ণ পাঁচটা। সান্ধ্যরবির মৃদুল কিরণে চুঁচুড়া কলেজের, হুগলির ইমামবাড়ীর এবং গঙ্গাতীরস্থ অন্যান্য প্রাসাদাবলীর শীর্ষদেশ স্বর্ণে মণ্ডিত হইয়াছে। নদীগর্ভ হইতে সে শোভা যেন একখানি চিত্রের মত দেখা যাইতেছিল। অর্দ্ধগঙ্গার বক্ষে নগরের ছায়া পড়িয়াছিল, এবং অপরার্দ্ধের বক্ষে ক্ষুদ্র হিল্লোলরাশি রবির মৃদুল কিরণে জ্বলিতেছিল, হাসিতেছিল, নাচিতেছিল। মনে পড়িল—

'হাসিছে একটি রবি পশ্চিম গগনে
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী জীবনে।'

কল্পনার চোখে ভাগীরথীর যে শোভা দেখিয়াছিলাম আজ তাহা চর্মচক্ষে দেখিলাম। নদীগর্ভে নগরের ছায়া, এবং ভাগীরথীর এই শোভা দেখিয়া আমরা দু'জনেই উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে গাইতেছিলাম—

'পড়ি জল নীলে ধবল সৌধ ছবি,
অন্ধকারিছে নভ অঙ্গন ও।'

গাইতে গাইতে নৌকা নৈহাটির ঘাটে পঁহুছিল; এবং আমরা বঙ্কিমবাবুর

বাড়ীর দিকে চলিলাম।...আমি চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, একটি একহারা গৌরবর্ণ পুরুষ। মাথায় কুঞ্চিত ও সজ্জিত কেশ, চক্ষু দু'টি নাতিক্ষুদ্র নাতিবৃহৎ, কিন্তু সমুজ্জ্বল; নাসিকা উন্নত, অধরোষ্ঠ ক্ষুদ্র ও রহস্যব্যঞ্জক ঈষৎ হাসিযুক্ত; তাহার উপর দুই প্রকাণ্ড গোঁফের তাড়া.—অগ্রভাগ কুঞ্চিত; দীর্ঘ বঙ্কিম গ্রীবা, মুখও ঈষৎ দীর্ঘ এবং সুগঠিত। অঙ্গে বাহু পর্যন্ত একটি সামান্য পিরান, এবং পরিধানে নয়নসুকের ধুতি। দেখিবামাত্রই মূর্তিখানি সুন্দর, সতেজ এবং প্রতিভান্বিত বোধ হয়। সঞ্জীববাবু হাসিয়া বলিলেন—বলুন দেখি লোকটি কে? আমি ঈষৎ হাসিয়া উঠিয়া প্রণাম করিতে যাইতেছিলাম। তিনি আমাকে নমস্কার করিতে অবসর না দিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং হাসিয়া বলিলেন—'সত্যসত্যই বলুন দেখি আমি কে?' আমি হাসিয়া বলিলাম, 'বঙ্কিম বাবু'। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি আমাকে কিরূপে চিনিলেন?' আমি উত্তর করিলাম—'শিকারী বিড়ালের গোঁপ দেখিলেই চেনা যায়।"

তেমনি রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে—

"কি উপলক্ষে, স্মরণ হয় না, এসময়ে পত্রের দ্বারা কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে পরস্পর পরিচিত হই। স্মরণ হয়, ১৮৭৬ (১৮৭৭?) খ্রীষ্টাব্দে আমি কলিকাতায় ছুটিতে থাকিবার সময়ে কলিকাতার উপনগরস্থ কোনও উদ্যানে 'নেশনাল মেলা' দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহার বৎসরেক পূর্বে আমার 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রকাশিত হইয়া কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। একজন সল্পপরিচিত বন্ধু মেলার ভিড়ে আমাকে 'পাকড়াও' করিয়া বলিলেন যে, একটি লোক আমার সঙ্গে পরিচিত হইতে চাহিতেছেন। তিনি আমার হাত ধরিয়া উদ্যানের এক কোণায় এক প্রকাণ্ড বৃক্ষতলায় লইয়া গেলেন। দেখিলাম, সেখানে সাদা ঢিলা ইজার-চাপকান-পরিহিত একটি সুন্দর নবযুবক দাঁড়াইয়া আছেন। বয়স ১৮।১৯, শান্ত স্থির। বৃক্ষতলায় যেন একটি স্বর্ণমূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। বন্ধু বলিলেন, 'ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ।' তাহার জ্যেষ্ঠ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার সহপাঠি ছিলেন। দেখিলাম—সেই রূপ সেই পোষাক। সহাস্যে করমর্দন কার্যটা শেষ হইলে তিনি পকেট হইতে একটি 'নোটবুক' বাহির করিয়া কয়েকটি গীত গাহিলেন ও কয়েকটি কবিতা গীতকণ্ঠে পাঠ করিলেন।

মধুর কামিনী-লাঞ্ছন কণ্ঠে এবং কবিতার মাধুর্যে ও স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভায় আমি মুগ্ধ হইলাম। তাহার দুই-একদিন পরে বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার চুঁচুড়ার বাড়ীতে লইয়া গেলে আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, আমি 'নেশনাল মেলায়' গিয়া একটি অপূর্ব নবযুবকের গীত ও কবিতা শুনিয়াছি, এবং আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, তিনি একদিন একজন প্রতিভাসম্পন্ন কবি ও গায়ক হইবেন। অক্ষয়বাবু বলিলেন, 'কে ? রবিঠাকুর বুঝি ? ও ঠাকুরবাড়ীর কাঁচামিঠা আঁব।' তাহার পর ষোল বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আজ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ। আমার ভবিষ্যৎবাণী সত্য হইয়াছে, আজ কাঁচা-মিঠা আঁব পরিপক্ক 'ফজলী'। তাহার গৌরবে সৌরভে বঙ্গবাসী ও বঙ্গসাহিত্য গৌরবান্বিত। রবিবাবু আজ বাংলার 'শেলি', 'কিটস', 'এড্‌গার পো' —কতকিছু বলিয়া পরিচিত। নব্যবঙ্গ তাঁহার সাহিত্যের ও তাঁহার সখের অনুকরণে উন্মত্ত।"

এরকম গদ্যের তুলনা নেই। ভাবলে আশ্চর্য হ'তে হয় যে, সে যুগে এরকম অপূর্ব গদ্য কিভাবে আয়ত্ত করেছিলেন নবীনচন্দ্র।

কিন্তু এদিকে বাঙালী পাঠকের দৃষ্টি খুব একটা গভীরে প্রবেশ করে নি। তাদের কাছে নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' ই বিশেষভাবে আদৃত। এ কাব্যের অন্তর্নিহিত বীরব্যঞ্জক পংক্তিসমূহ বাঙালীপাঠককে এতকাল ধরে নানাভাবে অনুপ্রাণিত ক'রেছে। স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত কবি নিজেও বুঝি এ কাব্যের পংক্তিতে পংক্তিতে বেদনার রসে ও অশ্রুর স্বাক্ষরে নিজের মানসিক স্বদেশ-বোধ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ ক'রে গেছেন। 'পলাশীর যুদ্ধ'-র জগৎশেঠ, রাণী ভবাণী, মোহনলাল প্রভৃতির অগ্নিমন্ত্রের বাণী সেকালে প্রায় ঘরে ঘরে আবৃত্তি ক'রে পড়া হ'তো। যদিও এ কাব্যে সিরাজচরিত্র মসীলিপ্ত, তবুও সেই যুবক নবাবের জন্য তিনিই প্রথম অশ্রুবিসর্জন করেন। 'পলাশীর যুদ্ধ' রচনাপ্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লেখেন : 'সেই সময়ে তিনি তাঁহার পলাশীর যুদ্ধ রচনার ইতিহাস আমায় বলেন। তিনি বলিলেন যে, পলাশীর যুদ্ধের প্রথম সর্গটুকু লিখিয়া তাহাই একটি খণ্ড কবিতার হিসাবে বঙ্গদর্শনে প্রকাশের জন্য পাঠান। বঙ্কিমবাবু নবীনবাবুকে তাহা ফেরৎ পাঠান, আর তাঁহাকে এই বিষয়ে একখানি মহাকাব্য রচনা করিতে উপদেশ দেন। তাহার পরে বীজস্বরূপ এই প্রথম সর্গ হইতেই তাঁহার এই অপূর্ব বৃক্ষ পলাশীর যুদ্ধ বর্ধিত, পল্লবিত ও

পুষ্পিত হইয়া উঠে। বঙ্কিমবাবুর নিকট তাঁহার এ বিষয়ে যেটুকু ঋণ ছিল, তিনি তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।'

এই কাব্যের মতো নবীনচন্দ্রের 'রঙ্গমতী' কাব্যেও মাতৃভূমির জন্য গভীর বেদনা স্বতঃ-উৎসারিত হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস— এই তিনখানি কাব্যকে বোধ করি বৈষ্ণব মনোভাবের একটি ট্রিলজি বলা যেতে পারে। কবি কুরুক্ষেত্রের নিবেদনে ব'লেছেন: 'কুরুক্ষেত্র স্বতন্ত্র কাব্য হইলেও ইহার উপাখ্যানভাগ রৈবতকের সঙ্গে গাঁথা। ইহার অনেক চরিত্রের উন্মেষ রৈবতকে। অতএব রৈবতক না পড়িলে কুরুক্ষেত্রের সম্যক্ কাব্যরস উপলব্ধি হইবে না। রৈবতকের ভিত্তিভূমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা, কুরুক্ষেত্রের ভিত্তিভূমি তাঁহার অনন্তকালস্পর্শী মধ্যলীলা।'

এক দিকে প্রকৃতির বর্ণনামাধুর্য, অন্যদিকে কোমলকান্ত পদাবলীর সমাবেশ, এবং সবার উপরে করুণ, বীর, রৌদ্র ও বীভৎস রসের নানা উপাদানে গ'ড়ে উঠেছে নবীনচন্দ্রের সমগ্র কাব্যসাহিত্য। তাঁর স্বভাব-বর্ণনার তুলনা নেই। মহাভারতের রাজরাজেশ্বরী মূর্তি আঁকতে গিয়ে তিনি যেখানে বলেছেন—

"মহাভারতের মূর্তি, মাতা রাজরাজেশ্বরী;
নবধর্মবেদীমূলে বসিয়া দেবতাগণ
আর্য্য-অনার্য্যের ধ্যানে; বেদীবক্ষে নিরুপম
নিষ্কামের মহামূর্তি; তদুপরি বিরাজিত
জননী আনন্দময়ী, অতুলা প্রতিভান্বিতা।
বিদগ্ধ অধর্ম মন, রক্তবর্ণ কলেবর,
অর্দ্ধেন্দু-কিরীট শিরে, পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর,
সমরাস্ত্র; শাসনাস্ত্র—হইতেছে শোভমান,
চারিভুজে চারিদিকে, ত্রিনেত্রে ত্রিকালজ্ঞান।"

তা অপূর্ব। তেমনি অপূর্ব তাঁর ধর্মরাজ্যস্থাপনের কল্পনা—

'এক ধর্ম, এক জাতি,
একমাত্র রাজনীতি
একই সাম্রাজ্য নাহি হইলে স্থাপিত,
জননীর খণ্ড দেহ হবে না মিলিত।
ততদিন হিংসানল

হায়! এই হলাহল
নিবিবে না, আত্মঘাতী হইতে ভারত।'

এ সত্য বিগত প্রায় ষাট বছরেরও উপরে প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তীকালে এ সত্যকে নানাভাবে বহু কবি ও চিন্তাবিদ রূপ দিতে চেয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নবীনচন্দ্রের স্বপ্ন অদ্যাবধি প্রায় স্বপ্নই থেকে গেছে। আমাদের সমকালীন ভারতবর্ষের সমস্যা যখন ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর আকার নিচ্ছে এবং যে যুগে জাতীয়তাবোধ-বিবর্জিত জাতিকে জাতীয়তামন্ত্রের প্রথম পাঠ শেখাবার একটা নতুন প্রয়াস কিছুসংখ্যক বুদ্ধিবাদী মানুষের মধ্যে দেখা দিচ্ছে, সেই যুগে আমরা আজ স্বভাবতঃই উপলব্ধি ক'রতে পারি— নবীনচন্দ্র আমাদের জাতীয় জীবনের মনন ও প্রাণনের কতখানি অংশ জুড়ে ছিলেন।

॥ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও ভারতীয় পুরাতত্ত্ব ॥

কি সাহিত্যে, কি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রাচীন ঐতিহ্য ও ইতিবৃত্তকে সম্পূর্ণ বর্জন করা ইদানীন্তনকালের একটি বড ফ্যাসানে দাঁড়িয়েছে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতীতের ইতিহাস অপরিজ্ঞাত থাকায় বর্তমান ও ভবিষ্যতের চিত্রও অনুজ্জ্বলতায় পরিণত হয়ে পড়েছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ভাষায়—'ধ্বনি দ্বিগুণিত করার একরকম যন্ত্র আজকাল বেরিয়েছে, তাতে স্বাভাবিক গলার জোর না থাকলেও আওয়াজে আসর ভরিয়ে দেওয়া যায়। সেইরকম উপায়েই অল্পজ্ঞানাকে তুমুল ক'রে ঘোষণা করা এখন সহজ হয়েছে। তাই বিদ্যার সাধনা হাল্‌কা হয়ে উঠল, বুদ্ধির তপস্যাও ক্ষীণবল। যাকে বলে মনীষা, মনের যেটা চরিত্রবল, সেইটের অভাব ঘ'টেছে।'—কথাটা প্রণিধান-যোগ্য। এযুগে কর্মযোগী পণ্ডিতের বিরলতা স্বভাবতই লক্ষ্যণীয়। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ন্যায় সাধক পণ্ডিত ব্যক্তির কথা স্বতস্ফূর্তভাবেই স্মরণে আসে। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য উল্লেখ ক'রে বলা যায়—'অনেক পণ্ডিত আছেন, তাঁরা কেবল সংগ্রহ করতেই জানেন, কিন্তু আয়ত্ত করতে পারেন না; তাঁরা খনি থেকে তোলা ধাতুপিণ্ডটার সোনা এবং খাদ অংশটাকে পৃথক্ করতে শেখেন নি ব'লেই উভয়কেই সমান মূল্য দিয়ে কেবল বোঝা ভারী করেন। হরপ্রসাদ যে যুগে জ্ঞানের তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সে যুগে বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির প্রভাবে সংস্কারমুক্ত জ্ঞানের উপাদানগুলি শোধন ক'রে নিতে শিখেছিল। তাই স্থূল পাণ্ডিত্য নিয়ে বাঁধা মত আবৃত্তি করা তাঁর পক্ষে কোনদিন সম্ভবপর ছিল না। বুদ্ধি আছে, কিন্তু সাধনা নেই, এইটেই আমাদের দেশে সাধারণতঃ দেখতে পাই, অধিকাংশ স্থলেই আমরা কম শিক্ষায় বেশী মার্কা পাবার অভিলাষী। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন সাধকের দলে, এবং তাঁর ছিল দর্শনশক্তি।'

১৮৫৩ সালের ৬ই ডিসেম্বর হরপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ মাণিক্য তর্কভূষণ পলাশী যুদ্ধের সমসাময়িককালে যশোহর হ'তে এসে নৈহাটিতে বসতি স্থাপন করেন। তিনি অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁর আগমনবার্তা শুনে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ১১৬৭ সালে মাণিক্যকে

'পরগণে হাবেলী সহর' নৈহাটিতে প্রচুর ব্রহ্মোত্তর জমি দান করেছিলেন। মানিক্যের পুত্র শ্রীনাথ অর্কালঙ্কারও নব্যন্যায়ে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পুত্র রামকমল ন্যায়রত্নও কমবড় পণ্ডিত ছিলেন না। হরপ্রসাদ এই রামকমলেরই পুত্র। নৈহাটিতে ন্যায়শাস্ত্রের টোল খুলে এই নৈয়ায়িক বংশ বাংলায় ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে সুযোগ ক'রে দেন।

হরপ্রসাদ তাঁর পিতার পঞ্চম পুত্র। তাঁর জ্যেষ্ঠ নন্দকুমার কান্দী স্কুলে হেডপণ্ডিতের পদলাভ ক'রে ভ্রাতাদের সেইখানেই নিয়ে যান। এই স্কুলেই হরপ্রসাদের প্রথম এ-বি-সি পাঠ শুরু হয়। কিন্তু ১৮৬১ সালের ৭ঠা অক্টোবর পিতার মৃত্যু হ'লে ভ্রাতাদের নিয়ে নন্দকুমারকে পুনরায় নৈহাটিতে আসতে হয়। স্কুলে হরপ্রসাদের নাম ছিল শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য। একবার কঠিন অসুখ থেকে হরের অর্থাৎ শিবের প্রসাদে বেঁচে ওঠায় তার নামকরণ হয় হরপ্রসাদ। বাল্যে ও কৈশোরে কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে তাঁকে বিদ্যালাভ ক'রতে হয়। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠকালেই সমগ্র 'রঘুবংশ' তাঁর মুখস্থ হয়ে যায়। শিক্ষক রামনারায়ণ তর্করত্নের নিকট থেকে তিনি কাব্যের সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করবার জ্ঞান লাভ করেন। শৈশব থেকেই তিনি অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ছিলেন। ১৮৭৭ সালে এম.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সংস্কৃত কলেজ থেকে তিনি শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেন।

বিদ্যালাভের পর সরকারী চাকরিতে প্রবেশ ক'রে ১৮৭৮ সালে তিনি কাটোয়ার দেয়াসিন গ্রামের রায়বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা হেমন্তকুমারীকে বিয়ে করেন। হরপ্রসাদের পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা। কিছুকাল হরপ্রসাদ সংস্কৃত কলেজে ট্রানশ্লেষণ মাষ্টারের কাজ ক'রে সরকারী অনুবাদকের সহকারীর পদ গ্রহণ করেন এবং ১৮৮৬ সালের জানুয়ারী মাসে বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ানপদে নিযুক্ত হন। এ সময়ে জনশিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর স্যার আলফ্রেড ক্রফট ছিলেন তাঁর উপরওয়ালা। বেঙ্গল লাইব্রেরিয়ান হিসেবে হরপ্রসাদ যে যোগ্যতার পরিচয় দেন, তাতে স্যার ক্রফট অত্যন্ত মুগ্ধ হন। পরে ১৮৯৫ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পূর্বে এখানে সংস্কৃতে এম্.এ ক্লাস ছিল না। হরপ্রসাদের চেষ্টাতেই ১৮৯৬ সাল থেকে প্রেসিডেন্সীতে এই ক্লাসের প্রবর্তন হয়। ১৯০০ সালে তৎকালীন জনশিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর আলেকজেণ্ডার

পেডলারের সুপারিশে হরপ্রসাদ ৮ই ডিসেম্বর থেকে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। ১৯০৮ সালের অক্টোবর মাসে তিনি এ কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করলেও তাঁকে ছাড়া সরকারের চললো না। তাঁরা হরপ্রসাদকে Bureau of Information for the benefit of civil officers in Bengal in History, Religion, Customs and Folklore of Bengal প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার নিযুক্ত করলেন। এজন্য জীবনের প্রায় শেষদিন পর্যন্ত তিনি এসিয়াটিক সোসাইটি থেকে মাসিক একশো টাকা বৃত্তি পেয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা থেকে তিন বছর (১৯২১-২৪) হরপ্রসাদ সেখানকার সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.লিট উপাধি প্রদান করেন।

সংস্কৃত কলেজের ছাত্রাবস্থা থেকেই হরপ্রসাদের বাংলা রচনার সূত্রপাত ঘটে। বি. এ ক্লাসে উঠে 'ভারত মহিলা' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা ক'রে তিনি হোলকার পুরস্কার লাভ করেন। রচনাটি পরে ১২৮২ সালের মাঘ চৈত্র সংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। এই পুরস্কার সম্পর্কে হরপ্রসাদ 'নারায়ণ' পত্রিকায় বঙ্কিমপ্রসঙ্গ লিখতে গিয়ে বলেন—'আটাবে-শ' চুয়াত্তর সালে আমি সংস্কৃত কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ি। মহারাজ হোলকার সংস্কৃত কলেজ দেখিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন। মহারাজ হোলকার একটি পুরস্কার দিয়া গেলেন। কেশববাবু বলিয়া দিলেন, সংস্কৃত কলেজের যে ছাত্র 'On the highest ideal of woman's character as set forth in ancient Sanskrit writers' একটি 'এসে' লিখিতে পারিবে, তাহাকে ঐ পুরস্কার দেওয়া হইবে। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় আমায় ডাকিয়া বলিলেন : 'তুমিও চেষ্টা কর।' কলেজের অনেক ছাত্রই চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৮৭৫ সালের প্রথমেই 'এসে' দাখিল করা হইল। পরীক্ষক হইলেন মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ও বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল। লিখিতে এক বৎসর লাগিয়াছিল, পরীক্ষা করিতেও এক বৎসরের বেশীই লাগিয়াছিল। ছিয়াত্তর সালের প্রথমে আমি বি. এ পাশ করিলাম, উমেশবাবুও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ পাইলেন। প্রিন্সিপাল প্রসন্নবাবু মনে করিলেন, সংস্কৃত কলেজের বেশ ভালো

ফল হইয়াছে। সুতরাং তখনকার বাঙ্গলার লেফটেনাণ্ট-গবর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পলকে আনিয়া প্রাইজ দিলেন। সেই দিন শুনিলাম রচনার পুরস্কার আমিই পাইব। স্যার রিচার্ড আমাকে একখানি চেক দিলেন ও কতকগুলি বেশ মিষ্ট কথা বলিলেন।'

১২৮২ থেকে ১২৯০ সালের মধ্যে হরপ্রসাদের বহু রচনা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন—'তিনি আমাকে লিখিতে সর্বদা উৎসাহ দিতেন। বঙ্কিমবাবুর উপর তখন আমাদের এরূপ টান যে, প্রতিমাসেই তাঁহাকে এক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দিতাম। প্রবন্ধ লিখিয়া নাম করিব, এ মতলব আমার একেবারেই ছিল না। সেজন্য কখনও প্রবন্ধে নাম সহি করিতাম না। একটা ইচ্ছা ছিল হাত পাকাইব আর এক ইচ্ছা—বঙ্কিমবাবুকে খুশী করিব। তিনি যদি কখন কোন প্রবন্ধের প্রশংসা করিতেন, তাহাতে হাতে স্বর্গ পাইতাম।'

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, হরপ্রসাদের কোনো রচনাই গতানুগতিক ছিল না। স্বদেশ, সমাজ ও মাতৃভাষার উন্নতির জন্য তাঁর যেমন সেই বয়সেই চিন্তার অবধি ছিল না, তেমনি ভাষা দিয়ে সেই চিন্তাসূত্রকে গেঁথে তিনি এক অভিনব সাহিত্য রচনা করেছেন এবং সে রচনাও তৎকালীন অন্যান্য বহু ব্যক্তির ন্যায় সংস্কৃতবহুল শব্দকণ্টকিত ছিল না, ছিল বহুলাংশেই সংস্কৃত শব্দমুক্ত বাংলা। সেই কালেই ১২৮৭-৮৮ সালে তিনি 'কলেজী শিক্ষা' ও 'বাংলা সাহিত্য—বর্তমান শতাব্দীর' ও 'বাংলা সাহিত্য' বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা ক'রে একদিকে সাহিত্যের বিভিন্ন দিক ও অপরদিকে শিক্ষার গলদ সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করবার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ছিল অন্যতম। তিনি বলেন: 'যদি নিজ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে অনেকটা সহজে হয়। তাহা না হইয়া এক অতি কঠিন অতিদূরবর্তী জাতির ভাষায় আমরা শিক্ষা পাই। শুদ্ধ সেই ভাষাটি মোটামুটি শিখিতে রোজ চারিঘণ্টা করিয়া অন্ততঃ আট-দশ বৎসর লাগে। ভাষাশিক্ষাটি অথচ কিছুই নহে, ভাষাশিক্ষা কেবল অন্য ভাল জিনিষ শিখিবার উপায়—উহাতে শিখিবার পথ পরিষ্কার হয় মাত্র, সেই পথ পরিষ্কার হইতে এত সময় যায় ও এত পরিশ্রম। তবুও কি সে-ভাষা বুঝা যায়? তাহার যো কি! বাঙ্গলা হইলে এই কেতাবী জিনিষই আমরা কত অধিক পরিমাণে শিখিতাম।'

প্রসঙ্গতঃ একথা উল্লেখ করা অযৌক্তিক হবে না যে, তাঁর নিজের অলক্ষ্যেই তাঁর ভাষার উপর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়েছিল। তিনি নিজেকে বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্য হিসেবে প্রকাশ করতে কোনোরকম কুণ্ঠাবোধ করতেন না। উত্তরকালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বঙ্কিমচন্দ্রের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠাকালে সভাপতির ভাষণ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ বলেন ঃ 'তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) জীবনে আমার friend, philosopher and guide ছিলেন। তিনি এখন উপর হইতে দেখুন যে, তাঁহার এই শিষ্যটি এখনও তাঁহার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্তির পরে-পরেই হরপ্রসাদ যে মনীষীর সংস্পর্শে এসে পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণাকার্যে ব্রতী হবার সুযোগ পান, তিনি প্রবীণ পুরাতত্ত্ববিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র। নেপাল থেকে আনীত সংস্কৃতে লিখিত বহু বৌদ্ধপুঁথির বিবরণমূলক তালিকা প্রস্তুতকালে রাজেন্দ্রলাল হরপ্রসাদকে গোপাল তাপনী উপনিষদের ইংরেজি অনুবাদ করতে বলেন। একাজ হরপ্রসাদ যে কতখানি যত্ন ও দক্ষতার সঙ্গে সমাধা করেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় রাজেন্দ্রলাল লিখিত ১৮৮২ সালে প্রকাশিত 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' গ্রন্থের ভূমিকায়। রাজেন্দ্রলাল লেখেন—

'It was originally intended that I should translate all the abstracts into English, but during a protracted attack of illness, I felt the want of help, and a friend of mine, Babu Haraprasad Sastri, M.A., offered me his co-operation, and translated the abstracts of 16 of the larger works. His initials have been attached to the names of those works in the table of contents. I feel deeply obliged to him for the timely aid he rendered me, and tender him my cordial acknowledgments for it. His thorough mastery of the Sanskrit language and knowledge of European literature fully qualified him for the task, and he did his work to my entire satisfaction.'

১৮৮৫ সালে সায়নের ভাষ্য অবলম্বনে রমেশচন্দ্র দত্ত ঋগ্বেদের যে

অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাতেও হরপ্রসাদের অবদান কম ছিল না। গ্রন্থের ভূমিকায় রমেশচন্দ্র দত্ত লেখেন—'এই প্রণালীতে অনুবাদ-কার্য সম্পাদন করিবার সময় আমি আমার সুহৃদ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট যথেষ্ট সহায়তাপ্রাপ্ত হইয়াছি। হরপ্রসাদবাবু সংস্কৃতভাষা ও প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রসমূহে কৃতবিদ্য,—তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ও শাস্ত্রী উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া পণ্ডিতবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সহিত অনেক প্রাচীন শাস্ত্রালোচনা করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি এই বৃহৎকার্যে প্রথম হইতে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহার সহায়তা ভিন্ন আমি এ গুরুকার্য সমাধা করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ।'

পুঁথির তালিকা প্রণয়ন-কার্যে হরপ্রসাদের প্রথম দীক্ষা রাজেন্দ্রলালের কাছেই। এশিয়াটিক সোসাইটির স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন তখন রাজেন্দ্রলাল। তাঁর সহায়তায় হরপ্রসাদ পরিষদের সাধারণ সদস্য ও ভাষাতত্ত্ব কমিটিরও সভ্য হন এবং বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা গ্রন্থমালার তত্ত্বাবধানকার্যে ডাঃ হর্ণলিকে তিনি সাহায্য করেন। ক্রমে হরপ্রসাদ সোসাইটির জয়েণ্ট ফিলোলজিকাল সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়ে বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা গ্রন্থমালার সংস্কৃত বিভাগের তত্ত্বাবধানভার গ্রহন করেন। পরে তিনি এখানকার ফেলো, সভাপতি ও আজীবন সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৮৯১ সালের ২৬শে জুলাই রাজেন্দ্রলাল মারা যান। এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি সংগ্রহের ভার ছিল তাঁর উপর। তিনি যে Notices of Sanskrit Mss. প্রচার করেন, একাজেও হরপ্রসাদ তাঁর সহায়ক ছিলেন। রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন হরপ্রসাদ। পুঁথি সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁকে সর্বদাই ভারতের বিভিন্ন স্থান ও নেপাল পরিক্রমা করতে হয়। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সংগ্রহের জন্য প্রাচ্যবিদ্ ম্যাকডোনেল সাহেব যখন অক্সফোর্ড থেকে এদেশে আসেন, তখন তাঁর সাহায্যকল্পে সহযাত্রী হন হরপ্রসাদই। অক্সফোর্ডের বড্‌লিয়ান লাইব্রেরীকে পুঁথি সংগ্রহ ক'রে পাঠাবার ব্যাপারে তাঁকে প্রশংসা ক'রে ১৯১০ সালের ৩ই জানুয়ারী লর্ড কার্জন যে পত্র দেন, এখানে তা উল্লেখযোগ্য। লর্ড কার্জন লেখেন—

'I have heard from oxford of the invaluable Part that you have played in arranging for the purchase, the

cataloguing and the despatch to England, of the wonderful collection of Sanskrit manuscripts, which Maharaja Sir Chandra Shumshere Jung of Nepal has so generously presented to the Bodleian Library; and I should like both as a former Viceroy and Chancellor of the University to send you a most sincere line of thanks for the great service which your erudition, good will and indefatigable exertion have enabled you to render to us.'

এতদ্ব্যতীত রাজপুতানা ও গুজরাটের বিভিন্ন সহর জয়পুর, যোধপুর, বরোদা, বিকানীর, ভরতপুর, বুন্দি, উজ্জয়িনী, আজমীর প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরেও ভাট ও চারণ কবিদের পুঁথি সংগ্রহে তাঁর ধৈর্য ছিল অসীম। কিন্তু শুধু পুঁথি সংগ্রহ করেই যে তিনি আশ্বস্ত হয়েছিলেন, এমন নয়; তাঁর পরীক্ষিত নানা অঞ্চলের ও নেপাল দরবারের পুঁথিসমূহের বিবরণীসহ তালিকা প্রস্তুত-কার্যেও হরপ্রসাদ বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

তিনি আহত হতেন—যখন একাজ থেকে তাঁকে বিরত থাকতে হতো। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হয়ে এরকম ঘটনা সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন: My appointment to the Principalship of the Sanskrit College was rather unfortunate for my literary and scientific work.'

তার ফলে কলেজের ছুটির দিনগুলিতে তাঁকে তাঁর অধীত কার্যে অধিকতর পরিশ্রম করতে হতো। ১৯০৮ সালে কলেজ থেকে অবসর গ্রহন ক'রে এশিয়াটিক সোসাইটির গৃহে রক্ষিত পুঁথিসমূহের descriptive catalogue সংকলন-কার্যে বৃত হয়ে সোসাইটির কাউন্সিলের নিকট থেকে মাসিক দুইশত টাকা বৃত্তি লাভ করেন। এসময়ে সোসাইটির সংগৃহীত পুঁথির সংখ্যা ছিল ১১,২৬৭ খানি। তার মধ্যে ৩১৫৬ খানি রাজেন্দ্রলাল কর্তৃক ও বাকী ৮১০৮ খানি হরপ্রসাদ কর্তৃক ক্রীত। তিনি যে descriptive catalogue প্রণয়ন করেন, তা তাঁর জীবিতকালে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নি; যে কয়েক খণ্ড প্রকাশিত হয়, তা হচ্ছে বৌদ্ধ ও বৈদিক সাহিত্য, স্মৃতি, ইতিবৃত্ত ও ভূগোল, পুরাণ এবং ব্যাকরণ ও অলঙ্কার। বাকীর মধ্যে কাব্য, তন্ত্র, দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য,

জ্যোতিষ, দর্শন, জৈনসাহিত্য, বৈদ্যক ও বিবিধ। তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে ডাঃ সুশীল কুমার দে বলেছেন: 'কেবল সংখ্যায় ও বিষয়-বৈচিত্র্যে নহে, বহু অজ্ঞাত ও দুর্লভ পুঁথির আবিষ্কারেও হরপ্রসাদের এই সংগ্রহ আজ পৃথিবীর অন্যান্য বৃহৎ সংগ্রহের সমকক্ষ; এবং ইহাই হরপ্রসাদের পণ্ডিতোচিত জীবনের একটি বিরাট ও অবিনশ্বর কীর্তি। একটি জীবনের পক্ষে এই একটি বৃহৎ প্রচেষ্টাই যথেষ্ট।' মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা বলেন, 'He of all People, has been the real father of oriental Research in North India.'

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেও হরপ্রসাদ পুঁথি সংগ্রহ ও পুস্তক উপহার প্রদানের দিক থেকে স্মরণীয়। সংস্কৃত পুঁথির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ সম্পর্কেও তিনি বিশেষভাবে সচেতন হন। এ সম্পর্কে তিনি আক্ষেপের সঙ্গে বলেন:

—"যখন প্রথম চারিদিকে বাঙ্গালা স্কুল বসান হইতেছিল এবং লোকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, চরিতাবলী, কথামালা পড়িয়া বাঙ্গালা শিখিতেছিল, তখন তাহারা মনে করিয়াছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বাঙ্গালা ভাষার জন্মদাতা। কারণ, তাহারা ইংরাজীর অনুবাদ মাত্র পড়িত, বাঙ্গালা ভাষায় যে আবার একটা সাহিত্য আছে এবং তাহার যে একটা ইতিহাস আছে, ইহা কাহারও ধারণায় ছিল না। তারপর শুনা গেল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবির্ভাবের পূর্বে রামমোহন রায় ও গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য বাঙ্গালার অনেক বিচার করিয়া গিয়াছেন এবং সেই বিচারের বহিও আছে। ক্রমে রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস ছাপা হইল। তাহাতে কাশীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কয়েকজন বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন কবির বিবরণ লিখিত হইল। বোধ হইল, বাঙ্গালা ভাষায় তিন শত বৎসর পূর্বে খানকতক কাব্য লেখা হইয়াছিল; তাহাও এমন কিছু নয়, প্রায়ই সংস্কৃতের অনুবাদ। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দেখাদেখি আরও দুইচারিখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস বাহির হইল, কিন্তু সেগুলি সব ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ছাঁচেই ঢালা। এই সকল ইতিহাস সত্ত্বেও খ্রীষ্টাব্দের ৮০ কোঠায় লোকের ধারণা ছিল যে, বাঙ্গালাটা একটা নূতন ভাষা, উহাতে সকল ভাব প্রকাশ করা যায় না, অনুবাদ ভিন্ন উহাতে আর কিছু চলে না,

চিন্তা করিয়া উহাতে নূতন বিষয় লেখা যায় না, লিখিতে গেলে কথা গড়িতে হয়, নূতন কথা গড়িতে গেলে হয় ইংরাজী, না হয় সংস্কৃত ছাঁচে ঢালিতে হয়, বড় কটমট হয়।—১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী এইরূপ মনের ভাব লইয়া আমি বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হইলাম, কিন্তু সেখানে গিয়া আমার মনের ভাব কি রয়া গেল। কারণ, সেখানে গিয়া অনেকগুলি প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তক দেখিতে পাই। সেকালের ব্রাহ্মণেরা বৈষ্ণবদের একেবারে দেখিতে পারিত না। বিশেষ চৈতন্যের দলের উপর তাহাদের বিশেষ দ্বেষ ছিল। স্মার্ত ব্রাহ্মণের বাড়ী বৈষ্ণবের বহি একেবারে দেখা যাইত না। নৈয়ায়িকেরা ত আরও চটা ছিল। সুতরাং আমার অদৃষ্টে বৈষ্ণবদের বহি একেবারে পড়া হয় নাই। বেঙ্গল লাইব্রেরীতে আসিয়া দেখিলাম, বৈষ্ণবদের অনেক বহি ছাপা হইতেছে; শুধু গানের বহি আর সঙ্কীর্ত্তনের বহি নয়, অনেক জীবনচরিত ও ইতিহাসের বহিও ছাপা হইতেছে। বাঙ্গালা দেশে যে এত কবি, এত পদ ও এত বহি ছিল, কেহ বিশ্বাস করিত না। তাই ১৮৯১ সালে কম্বুলেটোলার লাইব্রেরীর বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে একটি প্রবন্ধ পড়ি। ঐ প্রবন্ধে প্রায় ১৫০ জন কবির নাম এবং তাঁহাদের অনেকের জীবনচরিত ও তাঁহাদের গ্রন্থের কিছু কিছু সমালোচনা করি। সভায় গিয়া দেখি, আমিও যেমন বাঙ্গালা সাহিত্য ও তাহার ইতিহাস সম্বন্ধে বড় কিছু জানিতাম না, অধিকাংশ লোকই সেইরূপ, বাঙ্গালায় এত বহি আছে শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য হইয়া গেলেন, অথচ আমি যে-সকল বহির নাম করিয়াছিলাম, তাহা প্রায় সকলি ছাপা বহি, কলিকাতায়ই কিনিতে পাওয়া যাইত। একজন সমালোচক বলিলেন, 'আমি প্রবন্ধ সমালোচনা করিব বলিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সব কয়খানি ইতিহাস পড়িয়া আসিয়াছি, কিন্তু আমি এ প্রবন্ধ সমালোচনা করিতে পরিলাম না।' আর একজন প্রসিদ্ধ লেখক ঢাকা হইতে লিখিয়াছিলেন, —'আমি যেন একটা নূতন জগতে প্রবেশ করিলাম।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্ম ১৮৯৪ সালে; এর আট বছর বাদে হরপ্রসাদ এই পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হন। পরিষদের ইতিহাসে তাঁর অসামান্য কর্মনৈপুণ্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বলেন: 'আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সাহিত্য পরিষদে হরপ্রসাদ অনেকদিন ধ'রে আপন বহুদর্শী শক্তির প্রভাব প্রয়োগ ক'রবার উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়েছিলেন। রাজেন্দ্র-

লালের সহযোগিতায় এশিয়াটিক সোসাইটির বিদ্যাভাণ্ডারে নিজের বংশগত পাণ্ডিত্যের অধিকার নিয়ে তরুণ বয়সে তিনি যে অক্লান্ত তপস্যা করেছিলেন, সাহিত্য পরিষদকে তারই পরিণত ফল দিয়ে সমৃদ্ধ ক'রে রেখেছিলেন।'

পরিষদের সভ্য হওয়া থেকে শুরু ক'রে ক্রমে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর পুঁথি সংগ্রহের ফলে এদেশে তখন মোটামুটি যে চতুর্বিধ উপকার সাধিত হয়, তা হচ্ছে—(ক) বাংলা দেশে যে বৌদ্ধধর্ম জীবিত আছে, তার প্রমাণ স্পষ্ট হলো, (খ) মুসলমান আক্রমণের বহু পূর্বে যে বাংলা ভাষায় একটা প্রকাণ্ড সাহিত্য ছিল, তা জানা গেল, (গ) সেই বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু—দুই ধর্মেরই যে উন্নতি হয়েছিল, তার প্রমাণ মিললো, এবং (ঘ) অন্ধকারাচ্ছন্ন বাংলার ইতিহাসে এই সমুদয় সাহিত্য যে অসাধারণ আলোকসম্পাত করে, তার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ঘটলো। তবু দুঃখের সঙ্গেই হরপ্রসাদ উল্লেখ করেন: 'পুঁথি কিন্তু ভাল করিয়া খোঁজা হয় নাই। কতদিকে কত দেশে কত রকম পুঁথি যে পড়িয়া আছে, তাহার ঠিকানা নাই। নিউটন বলিয়াছেন—আমরা সমুদ্রের ধারে ঝিনুক কুড়াইতেছি মাত্র। আমরা এই পুঁথি-সমুদ্রে ততটুকুও করিতে পারি নাই…যদি শিক্ষিত লোক সকলে নিত্য একঘণ্টাকাল ইতিহাস আলোচনা করেন, অনেক নূতন নূতন পথ বাহির হইবে। নানা উপায়ে আমরা আমাদিগকে, আমাদের সমাজকে, আমাদের ধর্মকে, আমাদের দেশকে, আমাদের সাহিত্যকে এবং পূর্ববৃত্তান্ত কি, তাহা বুঝিতে পারিব। যতদিন তাহা না বুঝিতে পারি, ততদিন আমাদের উন্নতির পথ দেখিতে পাইব না। আপনাকে জানিতে হইলে পুঁথি খোঁজার দরকার। তাহাতে পরিশ্রমকে পরিশ্রম মনে করিলে চলিবে না, অর্থকে অর্থ মনে করিলে চলিবে না। কায়মনচিত্ত লাগাইয়া পুঁথি খুঁজিতে হইবে ও পুঁথি পড়িতে হইবে।'

তাঁর 'বৌদ্ধগান ও দোহা', 'মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম মঙ্গল', 'রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ,' 'হাজার বছরের পুরাণো বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' প্রভৃতি মৌলিক ও সম্পাদিত রচনায় বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্যগণের যে চর্যাপদগুলি স্থান পেয়েছে, তা কেবলমাত্র বাংলা ভাষায় নয়, আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষার আদিম রূপ। ভাষাসাহিত্যের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে হরপ্রসাদের সুচিন্তিত অভিমতটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—

—'অনেকের সংস্কার, বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতের কন্যা। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় সংস্কৃতকে বাঙ্গালা ভাষার ঠানদিদি বলিয়াছেন। আমি কিন্তু সংস্কৃতকে বাঙ্গালার অতি-অতি-অতি-অতি-অতি অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহী বলি। পাণিনির সময় সংস্কৃতকে ভাষা বলিত অর্থাৎ পাণিনি যে সময় ব্যাকরণ লেখেন, তখন তাঁহার দেশে লোকে সংস্কৃতে কথাবার্তা কহিত। তাঁহার সময় আর এক ভাষা ছিল, তাহার নাম 'ছন্দস্'—অর্থাৎ বেদের ভাষা। বেদের ভাষাটা তখন পুরাণো; প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা চলিতেছে। পাণিনি কতদিনের লোক তাহা জানি না, তবে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের বোধ হয়। তাহার অল্পদিন পর হইতেই ভাষা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরেই তাঁহার চিতার ছাই কুড়াইয়া এক পাথরের পাত্রে রাখা হয়। তাহার গায়ে যে ভাষায় লেখা আছে, সে ভাষা সংস্কৃত নয়; তাহার সকল শব্দই সংস্কৃত হইতে আসা, কিন্তু সে ভাষা সংস্কৃত হইতে অনেক তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পরই অশোকের শিলালেখের ভাষা। তাহার পর মিশ্র ভাষা, ইহার কতক সংস্কৃত ও কতক আর এক রকম। একটি বাক্যে দু'রকমই পাওয়া যায়। এ ভাষায় বইও আছে, শিলালেখও আছে। তাহার পর শুঙ্গ ও খারবেলদিগের শিলালেখের ভাষা। তাহার পর পালি ভাষা। তাহার পর নাটকের প্রাকৃত। সকল প্রাকৃতের সহিত আমাদের সম্পর্ক নাই। মাগধীর ও ওড্র মাগধীর সহিত আমাদের কিছু সম্পর্ক আছে। তাহার পর অনেকদিন কোন খবর পাওয়া যায় না। তাহার পর অষ্টম শতকের বাঙ্গালা। তাহার পর চণ্ডীদাসের বাঙ্গালা। তাহার পর বৈষ্ণব কবিদের বাঙ্গালা। সব শেষে আমাদের বাঙ্গালা। ...ভাষাকে সোজাপথে চালানো উচিত, এই ত গেল এক কথা। তাহার পরে আর একটা কথা আছে—এই আমার শেষ কথা, সেটা নূতন কথা গড়া। বাঙ্গালার সমাজ এখন আর নিশ্চল নয়। যেভাবে বহুশত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, সেভাবে এখন আর কাটিতেছে না। নানাদেশ হইতে নানাভাবে আসিয়া বাঙ্গালায় জুটিতেছে। যেসকল ভাব প্রকাশ করিবার কথা বাঙ্গালায় নাই, তাহার জন্য কথা গড়িতে হইতেছে। যাহাদের চলিত ভাষার কথা লইয়াই গোলযোগ, নূতন-ভাবে নূতন কথা গড়িতে তাহাদের আরও কষ্ট পাইতে হইবে, আরও বেগ পাইতে হইবে—সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি! ...ফরাসীরা যেমন একটা

একাডেমী করিয়া কোন্ কোন্ শব্দ ভাষায় চলিবে, কোন্ কোন্ শব্দ চলিবে না, ঠিক করিয়াছিলেন, আমাদেরও সেইরূপ একটা করিয়া লওয়া উচিত, নহিলে কথার সংখ্যায় আমাদের অভিধান অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে এবং কথার ভাবের ভাষা অতল জলে ডুবিয়া যাইবে।'

১৯২১ সালে বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি 'অনারা'র মেম্বর' পদে বরণ ক'রে হরপ্রসাদকে সম্মানিত করেন। ইতিপূর্বে তিনি 'Age of Consent Bill' সম্পর্কে যে Note দিয়েছিলেন, তাতে সন্তুষ্ট হয়ে গভর্ণমেণ্ট তাকে ১৮৯৮ সালে মহামহোপাধ্যায় উপাধি এবং ১৯১১ সালে সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৩১ সালের ১৭ই নভেম্বর তাঁর এই মহাজীবনের অবসান ঘটে। প্রসঙ্গতঃ তাঁর গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা এখানে উল্লেখযোগ্য, যথা—ভারত মহিলা, বাল্মীকির জয়, সচিত্র রামায়ণ, মেঘদূত ব্যাখ্যা, কাঞ্চনমালা, বেনের মেয়ে, প্রাচীন বাঙ্গালার গৌরব, বৌদ্ধধর্ম, বাঙ্গালা প্রথম ব্যাকরণ, ভারতবর্ষের ইতিহাস, Vernacular Literature of Bengal before the Introduction of English Education, Discovery of Living Buddhism in Bengal, Malavikagnimitra, The Educative influence of Sanskrit, Bird'seye View of Sanskrit Literature, Magadhan Literature, Sanskrit Culture in Modern India প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন গ্রন্থ ও বুলেটিন সম্পাদনা, বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকা প্রণয়ন, সভাপতির অভিভাষণ রচনা—প্রভৃতি কাজেও হরপ্রসাদকে নানাভাবে ব্যাপৃত থাকতে হয়েছে। শিক্ষা, সাহিত্য, দর্শন, অক্ষর পরিচয়, নাট্যকলা, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি এমন দিক নেই—যেদিকে তিনি লেখনী সঞ্চালন ক'রে অসামান্য রচনা সৃষ্টি ক'রে না গেছেন।

বাঙালী জাতির প্রতি একটি আশীর্বাদপত্রে তাঁর যে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায়, তা আজকের প্রতিটি বাঙালীকেই নূতন ক'রে স্মরণ ক'রে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হ'য়ে দাঁড়াবার প্রয়োজন বিশেষ ভাবে দেখা দিয়েছে। এই আশীর্বাদপত্রে হরপ্রসাদ বলেন—'যাহারা নিজের উন্নতি করিতে চায়, তাহাদের আশীর্বাদ করি। যাহারা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি করিতে চেষ্টা করে, তাহাদের আশীর্বাদ করি। যাহারা দেশের জন্য কাঁদে, তাহাদের আশীর্বাদ করি। যাহারা দেশের জন্য ভাবে, তাহাদের আশীর্বাদ করি। যাহারা

আপনার দেশকে সকলের চেয়ে বড় বলিয়া মনে করে, তাহাদের আশীর্বাদ করি। যাহারা আপনার দেশের পুরাণো কথা লইয়া আলোচনা করে, তাহাদের আশীর্বাদ করি। যাহারা হিন্দুধর্মে শ্রদ্ধাবান, তাহাদের আশীর্বাদ করি। আর যাহারা ছেলেবেলা হইতে দল বাঁধিয়া দেশের কার্য্য করিবার জন্য উদ্যোগ করে, মনের সহিত তাহাদের আশীর্বাদ করি।'

একথা স্মরণে রাখলে বাঙালী আবার নতুন ক'রে বাঁচবার অবকাশ পাবে।

॥ বাংলা গানে মহাকালীর প্রভাব ॥

হিন্দু পুরাণশাস্ত্র ও তন্ত্রসমূহে শক্তিস্বরূপিণী মহাকালীর নানা বর্ণনা আছে। কখনও তিনি দশপ্রহরণধারিণী চণ্ডিকা দুর্গা, কখনও তিনি বীণাপাণি সারদা, কখনও তিনি কমলদলবিহারিণী লক্ষ্মী কখনও বা করালবদনা প্রলয়ঙ্করী কালী। 'দেবী ভাগবতে' এবং 'মহানির্বাণতন্ত্রে' পরমা-প্রকৃতি এই দেবীর নানা উল্লেখ পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্যও মহীময়ী জগজ্জননীর স্তব রচনা করলেন তাঁর 'আনন্দলহরী'তে। যে মহাশক্তির অনুশাসনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত, যাঁর মহিমায় সূর্য-চন্দ্র দীপ্তিমান, যাঁর প্রভাবে ধরিত্রী অনন্তপ্রসাবনী-শক্তিসমন্বিতা, যাঁর কটাক্ষে সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়, ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্বদা যাঁর আরাধনা করেন, যিনি অসুরবিনাশিনী সংসার পাপ তাপনাশিনী মোক্ষদায়িনী, তিনি যে—

'ত্বযা হৃত্বা বামং বপুরপরিতৃপ্তেন মনসা।
শরীরার্দ্ধং শম্ভোরপরমপি শঙ্কে হৃতমভূৎ।
তথা হি তদ্রূপং সকলং অরুণাভং ত্রিনয়নং।
কুচাভ্যামানম্রং কুটিলশশিচূড়ালমুকুটম্।'

'আগমকল্পদ্রুমপঞ্চশাখা'তে এই দেবীকেই বর্ণনা করে বলা হয়েছে—'অখিলজনজীবকমলিনা বামেক্ষণা ত্রিবিন্দোর্মুখাত্তেন তত্ত্বেন কুচদ্বন্দ্বং শেষাঙ্গেনেশানী সাধকমন্ত্রভেদাৎ সা কালী গৌরী তদ্রূপেণ।'

তিনি ঘোরা কৃষ্ণবর্ণা, মুক্তকেশী, মুণ্ডমালিনী, তিনি খড়্গিনী খড়্গধারিণী, তিনি ভয়ানাং ভীষণানাং। কিন্তু তাঁর আর একটি রূপও বড় মধুর। তিনি বেদমতী মহালক্ষ্মী, ত্রিনয়নী ত্রিকালদর্শিনী, এক হাতে তাঁর বরাভয়, আর এক হাতে আশীর্বাদ, এক হাতে তাঁর কল্যাণ, আর এক হাতে ক্ষমা। চতুর্ভুজা তিনি, চার হাতে চারদিক তিনি রক্ষা করছেন। গভীর নিশিযামে তাঁর অর্চনা। ঘরে ঘরে তখন দেয়ালী উৎসব। অন্ধকারের গর্ভ থেকে একটি একটি ক'রে দীপশিখা জেগে উঠে ঘোষণা করে তমোনাশিনী মহাদেবীর মাহাত্ম্য। মর্ত্যলোকে মানুষের স্তব তখন জাগ্রত হয়ে ওঠে: 'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়।'

আর্যসমাজ একদা যে যে মানসিক বৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে শক্তি-স্বরূপিণী এই দেবীর রূপ প্রকরণ করেছে, হিন্দু পুরাণ ও তন্ত্রসমূহ সেই সেই রূপেরই নানা ব্যাখ্যা ক'রে গণমানসের সামনে উপস্থিত হয়েছে। কি ভক্তকবি রামপ্রসাদ, কি পরমহংসদেব, এই দেবীরই ধ্যান ক'রে দেবীমাহাত্ম্যের মধ্য দিয়ে জীব-মুক্তির সন্ধান করেছেন।

ভারতীয় সাহিত্যে, বিশেষ ক'রে বাংলা সাহিত্যে তন্ত্রসাধনার গোড়া থেকে শুরু ক'রে এই দেবী নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছেন। বাংলায় কালী-কীর্তন থেকে শুরু ক'রে শ্যামাসঙ্গীতের ছড়াছড়ি। বাংলা গানে মহাকালীর প্রভাব অসামান্য। রামপ্রসাদের গানে বাংলাদেশ আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। তাঁর সঙ্গীতে বাংলা গীতিকবিতার অপূর্ব সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে—যেমন উঠেছে কমলাকান্ত প্রভৃতি গীতিকারদের মাতৃসঙ্গীতে। রামপ্রসাদের—

'আমায় দাও মা তবিলদারী,
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।'

অথবা—

'এমন দিন কি হবে তারা
যবে তারা তারা তারা ব'লে দু'নয়নে পড়বে ধারা!'

কিম্বা—

'হৃৎ-কমলমঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা।
মন-পবনে দোলাইছে দিবস-রজনী ও মা।...'

প্রভৃতি গান অজস্র এবং অসামান্য।

রামপ্রসাদের এ জাতীয় গানকে ব্যঙ্গ ক'রে আজু গোঁসাঞি একসময় কিছু হাস্যরসের সৃষ্টি করেন; যেমন—

রামপ্রসাদ—

'আর কাজ কি আমার কাশী।
ওরে কালীর পদ কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি॥'

আজু গোঁসাঞি—

'পেসাদে তোরে যেতেই হবে কাশী।
ওরে তথা গিয়ে দেখবি যে তোর মেসো আর মাসী।'

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও আজু গোঁসাঞির কালীভক্তি কিছু কম ছিল না। দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের—

'পড়িয়ে ভব সাগরে ডুবে মা তনুর তরী।
মায়া-ঝড়, মোহ-তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী॥'

দেওয়ান রামদুলাল নন্দীর—

'ওগো জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জানো ভোজের বাজি।
যে তোমায় যেমনি ভাবে, তাতেই তুমি হও মা রাজি॥'

কুমার নরচন্দ্রের—

'সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি॥'

অথবা—

'যে ভালো করেছ কালী, আর ভালোতে কাজ নাই।
ভালোয় ভালোয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই॥'…

প্রভৃতি গান যেমন উচ্চাঙ্গের ভাব-বিশিষ্ট, তেমনি মধুর। কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের গানেও এ মাধুর্য কম নয়, যেমন—

'আর কিছু নাই শ্যামা মা তোর, কেবল দু'টি চরণ রাঙা।
শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি, দেখে হ'লাম সাহসভাঙা॥'

অথবা—

'তাই কালোরূপ ভালোবাসি।
কালী জগন্মনমোহিনী এলোকেশী॥'

শাক্ত রাজাবাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্রও কম গান রচনা ক'রে যাননি। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র এবং রসিকচন্দ্র রায় প্রমুখ বহু পাঁচালীকার তখন নানা শক্তিবিষয়ক সঙ্গীত রচনা ক'রে খ্যাতি অর্জন করেছেন। বাংলা 'তরজা' গানেও বিশেষ ক'রে শ্যামাবিষয়ক বহু পদের গান পাওয়া যায়। কবিয়ালদের মধ্যেও বহু কবি যেমন কৃষ্ণবিষয়ক, তেমনি শ্যামাবিষয়ক গান রচনা ক'রে গেছেন। এঁদের মধ্যে নীলমণি পাটুনীর দলের একটি গান—

'এবার বেঁধেছি মন আঁটি আঁটি
করেছি মন খুব খাঁটি,

তারা গো মা, এবার ধরেছি পাষাণের বেটি
আর পালাতে পারবিনে।
তারা গো, আজ তারাধরা ফাঁদ পেতেছি মা
হৃদয়-কাননে।'…

রামমোহনের সমসাময়িক নীলমণি ঘোষের একটি গানের দু'টি লাইন—

'কে জানে তোমায় তারা?
তুমি সাকারা কি নিরাকারা?'

মনীষী অশ্বিনীকুমার দত্ত দেশের শিক্ষা, সংস্কার ও স্বাধীনতাব্রতে জীবন উৎসর্গ ক'রে বঙ্গজননীর যে মহাশক্তি উপলব্ধি করেছিলেন, তারই অভিব্যক্তি ঘটে একটি গানে, যেমন—

'শ্মশান তো ভালোবাসিস মাগো, তবে কেন ছেড়ে গেলি?
এত বড় বিকট শ্মশান এ জগতে কোথা পেলি?
আয় মা হেথা নাচ্‌বি শ্যামা,
শব হবো শিব পা ছুঁয়ে মা,
জগৎ জুড়ে বাজবে দামা, দেখ্‌বে জগৎ নয়ন মেলি।'…

তেমনি চারণ কবি মুকুন্দ দাসের একটি গান—

'মা আমার বিশ্বরাণী, আমি মায়ের আদরের ছেলে।
যত রতন মাণিক হীরে সোনা সব দিয়েছি মায়ের পদতলে।
আমি গুরুর কৃপা পেয়েছি,
খাঁটি সোনা হয়ে গেছি,
তাই মুকুন্দ আনন্দে নাচে, জয় তারা জয় তারা ব'লে॥'

শ্যামা সঙ্গীতে মুসলমান কবিদের দানও কম নয়। অষ্টাদশ শতকে মুজা হুসেন আলী ও দরাব আলী খাঁ বিশেষ খ্যাতিমান শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন। এঁদের একটি গান—

'যারে শমন এবার ফিরি'।
এস না মোর আঙ্গিনাতে
দোহাই লাগে ত্রিপুরারি।'…

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষির কবি ত্রৈলক্যনাথ সান্যাল এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর নাটকে বহু শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছেন। আধুনিককালে কাজি

নজরুল ইসলামের মতো বোধ করি এমন ব্যাপক কালীবিষয়ক সঙ্গীত আর কোনো কবি বা গীতিকার রচনা করতে পারেননি। তাঁর—

'বল্ রে জবা বল্,
কোন সাধনায় পেলি রে তুই
শ্যামা মায়ের চরণ তল ?'

অথবা—'আমার শ্যামা মায়ের কোলে চ'ড়ে জপি আমি শ্যামের নাম', 'মহাকালের কোলে এসে গৌরী হ'লো মহাকালী' প্রভৃতি সঙ্গীত বাংলার ভক্তিমূলক সঙ্গীতের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। রেকর্ডে শ্যামাসঙ্গীতের যে প্রাচুর্য, তার কাছে বহু সঙ্গীতই হার মানে।

এ থেকে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে, বাঙালী-জীবনে এবং বাংলা গানে মহাকালীর প্রভাব অসামান্য। কখনও তিনি শ্যামা, কখনও তিনি তারা, কখনও তিনি ত্রিপুরারি নিরাকারা, কখনও বা ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা। বাঙালী-গীতিকারদের লেখনীতে দেবীর এই সমুদয় রূপই মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। মহাদেবীর উদ্দেশে স্পষ্টই তাই বলা যায়—

তুমি কালী মহাকালী মহেশ্বরী সুচিস্মিতা।
তুমি আছো, তাই জাগে মা ঘরে ঘরে দীপান্বিতা।

॥ দোলযাত্রা, লোকাচার ও লোকগীতি ॥

'হরিভক্তি-বিলাস' গ্রন্থে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর বর্ণনায় আছে :

'ফাল্গুন্যাং পৌর্ণমাস্যাং তু বিদধ্যাৎ বৈষ্ণবৈঃ সহ।
শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় ভক্তস্য বসন্তস্যার্চনোৎসবম্ ॥'

অর্থাৎ—ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বৈষ্ণবদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত বসন্তের পূজারূপ উৎসব করবেন। শ্রীরাধার ন্যায় এমন প্রিয় ভক্ত আর কে আছেন? মহাভাবস্বরূপিনী রাধারাণী তিনি। মানসলোক থেকে তিনি এসে দাঁড়ালেন বস্তুলোকে। প্রকৃতি আর পুরুষে মিলন হ'লো। প্রকৃতিস্বরূপা রাধা, প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে তাঁর হোলী উৎসব শুরু হ'লো। বৃন্দাবনের পথে পথে সেদিন কী উদ্দাম প্রাণোচ্ছ্বাস! গোপবালারা এসে সমবেত হয়েছে সখী সঙ্গে মিলে অনুপম রূপময় শ্রীকৃষ্ণকে আবীররাগে রাঙিয়ে দেবে ব'লে ; এসে দেখলো—প্রাণবল্লভের সঙ্গে প্রণয়বিলাসে দোলায় দুলছেন রাইকিশোরী, নূপুরসিঞ্জনে মাঝে মাঝে মুরলীধ্বনিতে চিত্তবিনোদন করছেন বিনোদবিহারী শ্রীকৃষ্ণ। পদাবলী গীতিকার গাইলেন—

'কো কহ আজুকো আনন্দ ওর।
ফুলবনে দোলত গৌর-কিশোর ॥'

এযুগের শতধাবিচ্ছিন্ন সমাজ-সংস্থার মধ্যেও শুনতে পাই সেই লীলা-রস-সঙ্গীত—

দোলে নন্দলাল প্রেমরাধা সনে,
কদম্ব মুঞ্জরে বৃন্দাবনে।
গোপীগণ গায়ত
নাচত নাচত,
নূপুর রুনুঝুনু বাজত চরণে ॥

নন্দলাল প্রেম-রাধিকার সঙ্গে দোলায় দুলছেন, বৃন্দাবনের কদম্বশাখায় তখন ফুল মঞ্জরিত হয়ে উঠেছে। গোপীগণ এসে নেচে নেচে গান করছে, রুনুঝুনু শব্দে নূপুর বেজে উঠছে তাদের পায়ে। হাতে তাদের আবীরগোলা পিচকারী। 'পিচকারীতে রং ঝারিতে কি গুণ আছে ননদ জানে।' কিন্তু

ননদিনীও তখন আর আড়ালে ব'সে নেই; তারও মনে তখন হিল্লোল জেগেছে। দেখতে দেখতে সারা বৃন্দাবন আবীররাগে রঞ্জিত হয়ে উঠলো। শ্রীরাধাকে নিয়ে গোপসখীদের সঙ্গে হোলী খেললেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি শুধু তাদের ক্রীড়াসঙ্গীই নন, তাদের প্রার্থিত পুরুষও বটেন। তাঁকেই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলেছেন—

তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ
বিদাম দেবং ভুবনেশ মীড্যম্।'

—তিনিই রসস্বরূপ। 'রসো বৈ সঃ, রস্যতে ইতি রসঃ, রসয়তি ইতি রসঃ:' তিনি রসস্বরূপ হ'য়ে রস আস্বাদনও করছেন। শ্রীরাধাকে কেন্দ্র ক'রে গোপসখিবৃন্দ তাঁর সেই রসের ক্ষেত্র। দোলের হোলী উৎসবেও সেই রসেরই প্রাধান্য। 'রাধা' শব্দের উৎপত্তি 'রাধ' ধাতু থেকে। রাধা অর্থে আরাধনা ক'রে সিদ্ধ হওয়া। প্রাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা ক'রেই শ্রীরাধা জীবনব্রতে সিদ্ধ হ'লেন, শুদ্ধাচারিনী হলেন। কৃষ্ণেন্দ্রিয় ইচ্ছা দিয়ে তিনি প্রেমের দোলনা রচনা করলেন। সেই দোলনার দোলায় দোলায় সারা বৃন্দাবন মুখরিত হ'লো, আমোদিত হ'লো, আহ্লাদিত হ'লো। হ্লাদিনী শ্রীরাধা। তাঁর হাসির ঝলকে যে-রূপ উপ্‌চে পড়ে, রূপোন্মাদ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সেই রূপজ্যোৎস্নায় ডুবে আনন্দিত। বৃন্দাবনের মতো সারা বিশ্বও তাই আনন্দিত। সেই হ্লাদিনী শ্রীরাধার রূপ-জ্যোৎস্নাই বুঝি বাসন্তী পূর্ণিমা হয়ে আবীরের রং ধরিয়ে দিল বনে, প্রকৃতিতে!

আজকের দ্বিধাবিভক্ত যুগেও তার প্রভাব কম কি! এযুগের গীতিকারের কণ্ঠেও তাই গান জেগে ওঠে—

'আজো পড়ে মনে মোর কেবলই পড়ে যে মনে
সেই বৃন্দাবনে লীলা অভিরাম সবই।'…

গান জেগে ওঠে—'সাজে নওল কিশোর চাঁদের তিলকে
তাঁর বনফুল-মালা গলে,
সে যে বংশীওয়ালা মোহিল ভুবন,
তাঁর মোহন মুরলী বোলে।'…

আর সেই নওল কিশোর বংশীওয়ালাকে কেন্দ্র ক'রে—

'লাল যমুন'-জল লাল তমাল-তল
লালে লাল মাধবীবিতান।'

অনন্তকাল ধ'রে ভারতবর্ষীয় হিন্দু সমাজে চলেছে এই দোললীলা আর দোল-সঙ্গীত। বিশ্বপ্রকৃতি যেন চিরকাল আন্দোলিত হ'য়ে চ'লেছে সেই একই দোদুল দোলায়। বৈষ্ণব কাব্যে দোলপূর্ণিমাকে বলা হ'য়েছে 'গৌর পূর্ণিমা।' গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জীবনলীলা থেকেই মূলতঃ এই নামকরণ। প্রাচীনকালে এই লীলা-উৎসবকেই বলা হ'তো বসন্তোৎসব বা মদনোৎসব।

শীতের কুহেলিকা কেটে গিয়ে বিশ্বপ্রকৃতি এক নব প্রাণের স্পন্দনে জেগে উঠেছে। শূন্য ডালে নব পত্রপুষ্পের অপূর্ব সমারোহ। বনে বনে জেগে উঠেছে কোকিলের কুহুতান। শৃঙ্খলাবদ্ধ গৃহাগত মনেও অলক্ষ্যেই না জানি কখন এসে সাড়া জাগে। জড়তা ভেঙ্গে প্রাণ-চাঞ্চল্যে মুখর হয়ে ওঠে ধরিত্রী। মানুষের জীবনেও সেই চাঞ্চল্যেরই ইসারা:

'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরো না বিড়ম্বিত তারে।'...

ঋতুলক্ষ্মী বসন্ত যখন দ্বারে এসে ঘা দিচ্ছে, মিথ্যে হেলায় তাকে ফিরিয়ে দিও না। জীবনের যত কিছু কুণ্ঠাকে আজ বিসর্জন দিয়ে সাদরে আলিঙ্গন জানাও তুমি বসন্তকে। তোমার মরুস্থানে সে রচনা করবে পুষ্পবিতান, তোমার জীবনে সে এসেছে অমৃতের পাত্র নিয়ে। দ্বার খুলে সাদরে তুমি তাকে অঙ্গনে এনে প্রতিষ্ঠা করো।

'ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল,
স্থলে জলে বনতলে লাগলো যে দোল
খোল দ্বার খোল।
রাঙা হাসি রাশি রাশি
অশোকে পলাশে,
রাঙা নেশা মেঘেমেশা
প্রভাত-আকাশে;
নবীন পাতায় লাগে রাঙা হিল্লোল।
খোল দ্বার খোল।'

বিশ্বপ্রকৃতি আজ যখন জীবন-দোলায় দুলছে, তখন হে গৃহবাসি, দ্বার খুলে তুমিও সেই দোলায় এসে যোগ দাও, চেয়ে দেখ অশোকে পলাশে আজ কি অনুপম রাঙা হাসি ঠিকরে পড়ছে, প্রভাতের আকাশে মেঘে মেঘে রাঙা নেশার ঘোর, নবীন পত্রপুঞ্জে রাঙা হিল্লোলের ঢেউ এসে লেগেছে। বন্ধন মুক্তির নৃত্যলীলায় যোগদানের আনন্দসমারোহ চলেছে চতুর্দিকে। এই মহা-মাহেন্দ্রক্ষণে তোমাকে কি সাজে নির্জন গৃহে আবদ্ধ হয়ে বসে থাকা? দ্বার খুলে বেরিয়ে এস গৃহবাসী, এসে এই নৃত্যছন্দে যোগ দিয়ে একবার গাও--

'আকাশ আমায় ভরলো আলোয়,
আকাশ আমি ভরবো গানে।
সুরের আবীর হানবো হাওয়ায়,
নাচের আবীর হাওয়ার পানে।'

বাঙালী-প্রাণের এ একেবারে নিজস্ব সঙ্গীত। এই সঙ্গীতের দ্বারাই সে সার্থক ক'রে তোলে তার দোল উৎসবকে। ভারত-আত্মার সঙ্গে এই দোলের এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রয়েছে। প্রদেশে প্রদেশে এমন সাড়া আর কোনো উৎসবে জাগে না। এই উৎসবের পিছনে একটি বস্তুগত তাৎপর্যও আছে। সেটা হচ্ছে আপামর জন-সমাজের মধ্যে একটা অপূর্ব ভ্রাতৃত্ববোধ। আবীরের রঙে রাঙিয়ে দিয়ে মানুষ এই দিনে কামনা করে আত্মার আত্মীয়তা। আত্মজধর্ম থেকেই এই আবীরের রক্তরাগ। একজনের অতিবড় রাগের মুহূর্তেও আর একজন আবীর হাতে এসে গান গেয়ে বলে—

'রাগ রেখে আয় ফাগ খেলে যাই এই বেলা;
বৃন্দাবনে বনে বনে আবীরে আজ বসলো মেলা।'

এ যে কতবড় আত্মীয়তার চিহ্ন, তা ব'লে শেষ করা যায় না। পদাবলী-সঙ্গীতে বৈষ্ণব গীতিকার উদ্ধব দাসের একটি গান—

'আবীরে অরুণ নব বৃন্দাবন উড়িতা
গগনে ছায়।
বঁধুয়া আমার হিয়ার মাঝারে
কেহ না দেখিতে পায়।
চপল নয়ন পিচকারী যেন,
নিরখে নয়ন মোর।

নব অনুরাগ ফাগুয়া ভরল
তনুমন করি জোড।
শুধুই শ্যামল অঙ্গ পরিমল
চন্দন চুয়াক ভাতি।
মোর নাশা জনু ভ্রমরি ভ্রমরি
তাতহি পড়ল মাতি'।...

এ এক অপূর্ব আবেশ। এখনও বাসন্তী সন্ধ্যায় নানা আসরে এ গান গীত হয়ে দোল উৎসবকে রোমাঞ্চকর ও মধুময় ক'রে তোলে। বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে এমন সঙ্গীতের অভাব নেই। বাঙালী জীবনের সঙ্গে এ সঙ্গীত ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

বিশেষ ক'রে হিন্দুস্থানীদের মধ্যে বাসন্তী পুর্ণিমার প্রায় একমাস আগে থেকেই চলে এই সঙ্গীতমুখর বিশেষ উৎসবদিনটির প্রস্তুতি। বস্তীপ্রধান অঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়—মাদল ও করতাল বাজিয়ে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-গুণগানে এক অপূর্ব আবেশ সৃষ্টি ক'রে তোলা হয়েছে, আর তার সাথে মাঝে মাঝে স্বতোৎসারিত কণ্ঠে ধুয়ো জেগে উঠছে। এই ধুয়োর ধ্বনিময় শব্দ গিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে মন থেকে মনে। এই শব্দের মধ্যেই তাদের প্রাণের হিল্লোল স্ফূর্ত হয়ে ওঠে।

পূর্ববঙ্গের একাধিক অঞ্চলে মদনগোপালকে মেলায় নিয়ে গিয়ে আবীর খেলে ফেরার পথে গাইতে গাইতে সবাই এবাড়ি ওবাড়ি হয়ে আসে—

'জয় দে লো রামের মা
তোর গোপাল এলো ঘরে ;
তোমার গোপাল গিয়েছিল
হোলি খেলার তরে।'...

বাড়ি বাড়ি থেকে পয়সা কুড়িয়ে এনে আবীর রঞ্জিত দোলের বেদীর সামনে ভোগ সাজিয়ে অবশেষে শুরু হয় হরি-সংকীর্তন। হরির লুটে তখন পয়সা বাতাসা গড়াগড়ি যায়। উর্ধ্বাকাশে তখন বাসন্তী পূর্ণিমার চাঁদেও কীর্তনাঙ্গ সুরের মদির আভাস। তখন হৃদয় কি আপনিই গেয়ে ওঠে না।—

'দোলে প্রেমের দোলন চাঁপা
হৃদয় আকাশে,

দোল-ফাগুনের চাঁদের আলোয়
স্থধায় মাখা সে।'...

অথবা

'কে দেবে চাঁদ তোমায় দোলা?
আপন আলোর স্বপন মাঝে
বিভোল ভোলা।'

... ...

তোমার হাসির আভাস লেগে
বিশ্ব দোলন দোলার বেগে
উঠলো জেগে আমার গানের
কল্লোলিনী কলরোলা।'...

দোল-উৎসবের এই গীতিমুখর কল্লোলোচ্ছ্বাস অনন্তকাল ধ'রে ভারতীয় জীবনসত্তাকে রমনীয়, মোহনীয় ও উদ্বোধিত ক'রে এসেছে।

॥ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ॥

বিজ্ঞান ভিন্ন জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয় না। খুব সম্ভব এই কারণেই বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনন্যসাধারণ নিষ্ঠা এবং মমতা থাকা সত্বেও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর মূল অধীত বিষয় হিসেবে গ্রহণ করলেন পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রকে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, বিজ্ঞানকে গ্রহণ করেও সর্বাংশে তিনি বাংলা সাহিত্যেরই উৎকর্ষ বিধান ক'রে গেছেন। কি ভাবে বাংলা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানকে সহজতম পদ্ধতিতে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা যায়, এবং কিভাবে বাংলা সাহিত্যকে বৈজ্ঞানিক অলঙ্কারে ভূষিত ক'রে নব নব উন্মেষশালিনী চিন্তার পথ প্রশস্ত ক'রে তোলা যায়, নিরন্তর এই চিন্তায় বিভোর থাকতেন তিনি। এজন্য যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক পরিভাষার প্রয়োজন, রামেন্দ্রসুন্দর বহুলাংশেই তা উদ্ভাবন ক'রে গেছেন।

যে পরিবারে তাঁর জন্ম, পিতৃপিতামহের কাল থেকেই সেই পরিবারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লক্ষ্য করবার মতো। রামেন্দ্রসুন্দরের পিতা, পিতামহ, পিতৃব্য প্রত্যেকেই সাহিত্যকীর্তির অধিকারী ছিলেন। কাব্য এবং নাটকের ললিতরসে পারিবারিক পরিবেশটি বিশেষ মধুর হয়ে উঠেছিল। এই মধুর পরিবেশের মধ্যেই ১৮৬৪ সালের ২০শে আগষ্ট চন্দ্রকামিনী দেবীর গর্ভে রামেন্দ্রসুন্দরের জন্ম হয়। পিতা গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী সেদিন পুত্রকে কেন্দ্র ক'রে বিরাট কিছু একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন কি না জানি না, উত্তরকালে রামেন্দ্রসুন্দর কিন্তু মহীরুহের মতই বাংলার সংস্কৃতি-ক্ষেত্রকে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আচ্ছন্ন ক'রে দাঁড়ালেন। ডাঃ শিশিরকুমার মৈত্র বলেন : 'কোনও কোনও বিষয়ে বঙ্গসাহিত্য বলিতে ত্রিবেদী মহাশয়কেই বুঝায়; ত্রিবেদী মহাশয় সে সকল বিষয়ের প্রাণ। মেটারলিঙ্‌ককে বাদ দিয়া আধুনিক রোমান্টিক সাহিত্য যেরূপ হয়, গেরার্ড হাউপ্ট্‌ম্যানকে ছাড়িয়া রিয়ালিষ্টিক ড্রামা যেরূপ দাঁড়ায়, বাঙ্গলা সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিভাগে এবং কতক পরিমাণে ইতিহাস বিভাগে রামেন্দ্রবাবুকে বাদ দিলেও ঠিক সেইরূপ হয়। বাঙ্গলায় যে কতদূর উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লেখা যাইতে পারে, ইহা রামেন্দ্রবাবু স্পষ্ট দেখাইয়া দেন।'

রামেন্দ্রসুন্দরের এই মনীষা শুধু তাঁর বিদ্যাবত্তাকে আশ্রয় ক'রেই গ'ড়ে ওঠে নি, শিশুকাল থেকেই সুকুমার অনুভূতিশীলতার দ্বারা ধীরে ধীরে তিনি এই মনীষার উচ্চশিখরে আরোহণ করেছেন। তৎকালীন ছাত্রবৃত্তি পাঠশালায় যেমন অধ্যয়নের উপর জোর দেওয়া হতো, তেমনি ধর্ম, জাতীয়তা ও চরিত্র-শিক্ষাও চলতো সেই সঙ্গে। মাত্র ছ'বছর বয়সে এই ছাত্রবৃত্তি পাঠশালাতেই প্রথম তাঁকে ভর্তি ক'রে দেওয়া হয়। পিতা গোবিন্দসুন্দর নিয়মিত জ্যোতিষ-শাস্ত্র, অঙ্ক ও বিজ্ঞান চর্চা করতেন। গৃহশিক্ষক বলতে তিনিই ছিলেন পুত্রের শিক্ষাগুরু। গোবিন্দসুন্দরের আদর্শেই ধীরে ধীরে আদর্শবান হয়ে উঠতে লাগলেন রামেন্দ্রসুন্দর। পাঠশালায় এমন বার্ষিক পরীক্ষা ছিল না— যাতে তিনি প্রথম স্থান অধিকার না করতেন; ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাতেও সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে তিনি প্রথম স্থান অধিকার ক'রে বৃত্তিলাভ করেন, অতঃপর কান্দি হাইস্কুলে এসে ভর্তি হন। এসময় থেকেই তাঁর মধ্যে কাব্য-সাধনায় একটা দুরন্ত আবেগ লক্ষ্য করা যায়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষায় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে ২৫৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। এটা যত বড় আনন্দের কারণ হলো, সেই সঙ্গে তত বড়ই শোকাবহ ঘটনা ঘটলো আকস্মিক পিতৃবিয়োগে। গোবিন্দসুন্দর ছিলেন একাধারে তাঁর পিতা, গুরু ও বন্ধু। এত বড় সুহৃদ পৃথিবীতে বিরল। সেই পিতৃদেবকে হারিয়ে এনট্রান্স পাশের কৃতিত্বের আনন্দকে ভুলে গেলেন রামেন্দ্রসুন্দর। এদিকে কলেজে এসে ভর্তি হবার সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, গভীর শোক বুকে চেপে তাই পিতৃব্যের সঙ্গে কলকাতায় এসে একদিন প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। এ সময়ে অধীত বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে যখনই একবিন্দু অবসর জুটতো, ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্য এবং ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর সেই অবসর বিনোদন করতেন। কিন্তু এর প্রভাব এসে অলক্ষ্যে কখনও তাঁর অধীত বিষয়কে গ্রাস করতো না। যথানিয়মেই তিনি এফ এ এবং বি-এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রে অনার্সসহ প্রথম স্থান অধিকার ক'রে ৪০৲ টাকা বৃত্তি পান। বাংলার বিদগ্ধ-সমাজে তখন 'নবজীবন' পত্রিকার বিশেষ খ্যাতি ছিল। বি-এ পাশ করবার পর এই পত্রিকাতে তাঁর প্রথম বাংলা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং সুধীজন দ্বারা প্রবন্ধটি বিশেষ সমাদৃত হয়। অতঃপর পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র নিয়ে তিনি এম-এ পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হন।

রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন তখন পেডলার সাহেব। রামেন্দ্রসুন্দরকে বিশেষ স্নেহ করতেন তিনি। বললেন : 'Simultaneously try to get P. R. S. Scholarship also।' সহৃদয় অধ্যাপকের উপদেশটি সঙ্গে সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর সানন্দে গ্রহণ করলেন এবং যথাক্রমে এম-এ পরীক্ষায় স্বর্ণপদকসহ ১০০৲ টাকা বৃত্তি ও প্রেমচাঁদ ছাত্রবৃত্তি লাভ ক'রে সকলের বিস্ময় সৃষ্টি করলেন। অতঃপর আইন অধ্যয়নের জন্য কিছুকাল তিনি আইন কলেজেও যোগদান করেন, কিন্তু মনের দিক দিয়ে সাড়া না পাওয়ায় অল্পদিনের মধ্যেই সে-পাঠ তিনি বন্ধ করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁকে জেমোর রাজ-পরিবারের কন্যা ইন্দুপ্রভার সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। তাঁদের পরিবার বা সমসমাজে তখন প্রায় এরকম বিবাহরীতিরই প্রচলন ছিল। ইন্দুপ্রভাও বিশেষ সর্বগুণ-সম্পন্না মহিলা ছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের মহৎ চরিত্রের সঙ্গে স্ত্রীর সেই গুণের সমন্বয় ঘ'টে তাঁদের সাংসারিক পরিবেশটি বিশেষ শান্তিময় হ'য়ে উঠেছিল।

সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র কলকাতা। কলকাতাকেই রামেন্দ্রসুন্দর একসময় তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিলেন। শিক্ষাবিভাগ থেকে বহু চাকরির আহ্বান পাওয়া সত্ত্বেও কলকাতার আকর্ষণ ত্যাগ ক'রে অন্যত্র যেতে তিনি কোনোদিন রাজী হন নি। এর আর একটি কারণ হলো স্বর্ণময়ী বঙ্গভূমি তথা বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর অনন্যসাধারণ মমতা। এর পর ১৮৯২ সালে তিনি রিপন কলেজের পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন এবং স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস আরম্ভ করেন। অধ্যাপক পদ থেকে ক্রমে তিনি রিপন কলেজের স্থায়ী অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন। ছাত্র ও অধ্যাপকদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশবার ফলে তাঁর অধ্যক্ষতাকালে রিপন কলেজে এক অভূত-পূর্ব প্রাণঃশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। রামেন্দ্রসুন্দরের স্বভাবগত সহৃদয়তাই ছিল এর মূল কারণ। তৎকালীন অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের মতে—"তাঁহার নিকট প্রাণের কারবার ছিল; সেখানে তিনি যন্ত্রনীতির অধিকার স্বীকার করিতেন না। তাঁহার বিজ্ঞানশ্রেণীর বাহিরে যে অগণিত ছাত্র ছিল, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন অসম্ভব ব্যাপার হইলেও তিনি অনেক স্থলে পরিচয়ের সুযোগ খুঁজিতেন। এই ব্যাপার তাঁহার প্রকৃতিগত

বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক ছিল। ছাত্রেরা কলেজের অধ্যক্ষের নিকট যে সকল আবেদন করে, অধিকাংশ কলেজেই সেই আবেদনপত্রগুলি আপিসের হাত দিয়া অধ্যক্ষের হাতে পৌঁছায়। রামেন্দ্রবাবু নিয়ম করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক ছাত্র নিজ নিজ আবেদনপত্র হাতে লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবে এবং প্রত্যেকের সঙ্গে কথা কহিয়া তিনি বিচার মীমাংসা করিবেন।"

এইভাবে ছাত্রসমাজের সান্নিধ্যে এসে অল্পদিনের মধ্যেই রামেন্দ্রসুন্দর তাঁদের আপনজন হয়ে উঠলেন। অন্যদিকে দেশবিদেশের দর্শন প্রভৃতি আলোচনা ক'রে অধ্যাপকবৃন্দকে তিনি নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করতেন। উপদেশচ্ছলে একটিমাত্র কথাই তাঁর মুখে নিয়ত উচ্চারিত হ'তো: 'চর্চা কর, অনুসন্ধান কর, লেখ।' এ ছাড়া কোনো শিল্প-বিজ্ঞান-সাহিত্যই দাঁড়াতে পারে না। অধ্যাপকবৃন্দকে তিনি যে-সকল প্রবন্ধ লিখে শোনাতেন, পরবর্তীকালে সেই প্রবন্ধগুলিই একত্রে সংগ্রথিত হয়ে 'জগৎ কথা' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বিশ্ব-ইতিহাসে দর্শন ও বিজ্ঞানের এমন মধুর সমন্বয় বড় একটা দেখা যায় না। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন: 'রামেন্দ্রসুন্দরের মুখে আধুনিক দার্শনিক বের্গসঁর দার্শনিক মত বা আধুনিক বৈজ্ঞানিক মেণ্ডেলের বংশক্রমতত্ত্ব বা নবাবিষ্কৃত সংস্কৃত কবি ভাসের নাট্যগ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার চিত্তবৃত্তির সজীবতার ও চিরনবীনতার পরিচয় পাইয়াছেন।

দীর্ঘ ষোল বছর তিনি রিপন কলেজের অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই ষোল বছরের জীবনে তিনি শুধু নিজের কলেজের গণ্ডির মধ্যেই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তৃত পরিবেশের মধ্যেও বিশেষ একটা প্রাণচাঞ্চল্যকর আলোড়নের সৃষ্টি করে গেছেন। ১৯১৭ সালে স্যাডলার কমিশন নিযুক্ত হয়, উদ্দেশ্য—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার-সাধন। এই সংস্কার সম্পর্কে কমিশন রামেন্দ্রসুন্দরের নিকট কতকগুলো প্রশ্নের অভিমত চেয়ে পাঠালে তিনি যে সুচিন্তিত মন্তব্য লিখে পাঠান, সে সম্পর্কে কমিশন তাঁদের রিপোর্টের একাধিক স্থানে উল্লেখ ক'রে প্রসঙ্গক্রমে মন্তব্য করেন: রামেন্দ্রসুন্দরের কথিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এইরূপ কৃতিত্বে আমরা মুগ্ধ এবং ইহার ভবিষ্যৎ পরিণাম সম্বন্ধে আমরা তাঁহার সহিত একমত। আমরা শিক্ষাসংস্কারের জন্য যে-সকল পরিবর্তন প্রস্তাব করিয়াছি, সেগুলি কার্যে পরিণত হইলে আশা

করি সঙ্কলিত আদর্শ লাভ হইবে ও বিশ্ববিদ্যালয় নবজীবনের সৃষ্টি সাধন ও স্বাধীনতা দান করিতে পারিবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সুন্দর ভাবসমূহের মধুর সাম্মিলন ঘটিবে।

তাঁর জীবনে বাংলা সাহিত্যের ব্রত উদ্‌যাপন সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন: 'যথাশক্তি বাংলা সাহিত্যের সেবা করিব, এই আকাঙ্ক্ষা বাল্যকাল হইতেই পোষণ করিয়াছিলাম। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তদর্থেই আমার প্রায় সকল শক্তি নিযুক্ত করিয়াছি।'—জীবনের অগ্রগামিতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই সাধনার নিষ্ঠা উত্তরোত্তর বেড়েছে। সাহিত্যজীবনে প্রবেশ ক'রে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'মহাশক্তি' প্রকাশিত হয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রিকায়। এর পর থেকে স্বনামে ও বেনামে তাঁর বহু রচনা বহু সাময়িক পত্রে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীকালে রামেন্দ্রসুন্দর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লেখেন: 'অনেকেই বলেন—কথাটাও সত্য যে—দর্শনই হউক বা বিজ্ঞানই হউক, ইতিহাসই হউক বা প্রত্নতত্ত্বই হউক—রামেন্দ্রবাবু যাহাই লিখিতেন, তাহাই যে শুধু প্রাঞ্জল হইত এমন নয়, সত্য সত্যই তাঁহার মধুরতায় প্রাণকে জল করিয়া দিত, পড়িতে কবিতার মত বোধ হইত, কল্পনায় মাখামাখি থাকিত, রসে ও ভাবে ভোর করিয়া দিত।'

রামেন্দ্রসুন্দর অন্যূন প্রায় কুড়িখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তার মধ্যে 'প্রকৃতি,' 'জিজ্ঞাসা,' 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা,' 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ,' 'বিচিত্র জগৎ,' 'জগৎ কথা,' 'Aids to Natural Philosophy' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত নানা পত্রে তাঁর বহুতর রচনা বিক্ষিপ্তাকারে ছড়িয়ে আছে। সে যে কি রচন—তা অনুভূতিশীল পাঠক ভিন্ন অন্যের পক্ষে অনুধাবন করা কঠিন। অথচ বহু কল্পিত কঠিন বিষয়কেই সুললিত ভাষায় ও সহজ প্রকাশভঙ্গিতে তিনি ব্যক্ত ক'রে গেছেন।

এই বিশ্বনিয়মের প্রাণলীলায় প্রতিনিয়ত যে ঘটনাবর্তন চলছে, তা লোকচক্ষুর অন্তরালে হ'লেও একটি সাম্যসূত্রে ঐক্যবদ্ধ। পৃথিবীর নৈসর্গিক বিষয়ই বা কি, আর নিয়তির লীলাই বা কি, তার একদিকে 'কসমিক' শক্তি, অন্যদিকে 'এথিকাল' শক্তি। এই দু'য়ের সমন্বয়ে পৃথিবী এক এবং অবিভাজ্য। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে—'যে নিয়তি সৌরজগতে গ্রহ-উপগ্রহগুলিকে আপনার

নির্দিষ্ট কক্ষে ঘুরাইতেছে, যে নিয়তির বশে দিনরাত্রি হয়, ভূমিকম্প ঘটে ও ঝঞ্ঝাবায়ু বহে, অথবা যে নিয়তির বশে ম্যামথ ও ম্যাস্টোডনের বাসভূমিতে মানুষ রেলপথ চালাইতেছে ও টেলিগ্রাফের তার খাটাইতেছে, সেই নিয়তি, এবং যে নিয়তি মানুষকে সৎকর্মে ও অসৎকর্মে প্রেরিত করে, যাহাতে সিদ্ধার্থকে গৃহত্যাগ করাইয়াছিল ও যীশুকে ক্রুশে ঝুলাইয়াছিল, এই নিয়তি, এই উভয় প্রকোষ্ঠের উভয় নিয়তির মধ্যে এক পরম ঐক্য বর্তমান আছে।'

বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সূত্রে বাংলায় সর্বপ্রথম ভাষাতত্ত্ব লিখবার প্রচেষ্টাও রামেন্দ্রসুন্দরের মধ্যে প্রথম দেখা দেয়। তারপর তাঁর সেই প্রদর্শিত পথ ধ'রে বহু অনুশীলনকারী ব্যক্তি অগ্রসর হয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। রামেন্দ্রসুন্দরের 'ধ্বনিবিচার' গ্রন্থখানি এই ভাষাতত্ত্ব রচনারই সার্থক প্রয়াস।

তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পরিচালনা ও সংস্কার-সাধন। সর্বপ্রথম এই পরিষদের বীজ উপ্ত হয় বীমস সাহেব প্রবর্তিত 'বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার' এ, পরে ওর বাংলা প্রতিশব্দরূপে উমেশচন্দ্র বটব্যালের প্রস্তাবানুসারে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' নাম গৃহীত হয়। এর প্রথম কার্যালয় ছিল শোভাবাজার রাজবাটিতে, পরে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের এক ভাড়াটিয়া বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দর প্রথম থেকেই এর সদস্য ছিলেন। পরিষদের তখন মাত্র শৈশবাবস্থা। ক্রমে এর সম্পাদকীয় দায়িত্ব রামেন্দ্রসুন্দরের ঘাড়ে এসে পড়ে। নিজের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, কর্মক্ষমতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার দ্বারা তিনি ধীরে ধীরে পরিষদকে নানাদিকে উজ্জীবিত ক'রে তোলেন। দেখতে দেখতে পরিষদ বড় হয়ে ওঠে এবং ক্রমে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের ভাড়াটিয়া বাড়ি থেকে আপার সার্কুলার রোডের নব-নির্মিত নিজস্ব মন্দিরে স্থানান্তরিত হয়। ১৯০৮ সালের ৬ই ডিসেম্বর সেই গৃহপ্রবেশ উৎসবের দিন বাঙালীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের 'বজ্রদুন্দুভি' সারা ভারতকে আবার নতুন ক'রে মাতিয়ে তোলে। তখন পর্যন্ত বাংলাই ছিল সারা ভারতের সংস্কৃতির মূল প্রাণকেন্দ্র। রামেন্দ্রসুন্দরের সারা হৃদয়ও তখন আনন্দে নেচে উঠেছে। সেই বছরই পরিষদের কার্যবিবরণীতে তিনি উল্লেখ করেন: 'সাহিত্য পরিষদের নূতন মন্দির বঙ্গের সাহিত্য-সেবকগণের সম্মিলিত কেন্দ্রস্বরূপ স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহারা এই কেন্দ্রস্থলে সমবেত হইয়া সাহিত্যের উন্নতিকল্পে আলাপ ও পরামর্শ করিবার ও পরস্পর আত্মীয় সম্পর্কে

আবদ্ধ হইবার সুযোগ পাইবেন। জ্ঞানান্বেষিগণ এই মন্দিরে উপবিষ্ট হইয়া নব নব তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত রহিবেন এবং দেশমধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচার দ্বারা স্বদেশকে উন্নতিমার্গে প্রেরণ করিবেন। অতীতকালের মহাপুরুষগণের স্মরণ নিদর্শন সগৌরবে বহন করিয়া এই মন্দির বঙ্গবাসীমাত্রের তীর্থরূপে পরিণত হইবে। অনাগত ভবিষ্যতে পরিষদের এই সকল ও অন্যান্য উচ্চাশা যে পূর্ণ হইবে, পরিষদ এখন তাহার স্বপ্ন দেখিতেছেন। বাঙ্গলা সাহিত্য বর্তমানকালে বাঙালীর একমাত্র গৌরবের বস্তু। এই পতিত জাতির যদি উদ্ধার সাধন হয়, তাহা সাহিত্যের বলেই হইবে, একথা ধ্রুব সত্য।'

কতবড় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর, ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। ঋষিকল্প দৃষ্টি ছিল ব'লেই ভাবীকালের চিত্র তাঁর মনের মধ্যে এমন সত্যের রূপ নিয়ে প্রতিভাত হয়েছিল। চরিত্রগতভাবে বাঙালী কোনোদিনই ব্যবসায়ী বা যোদ্ধাজাতি নয়। শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি বাঙালীকে একটিমাত্র প্রাণতীর্থেই উজ্জীবিত ক'রে তুলেছে, তা হচ্ছে তার কৃষ্টি। কৃষ্টিধর্মী বাঙালীর সার্থক পরিচয় তার সাহিত্যে, কাব্যে, দর্শনে ও জাতীয়তাবাদী ধর্মে। এর দ্বারাই সে বিশ্ব জয় করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। রামেন্দ্রসুন্দরের উক্তিটি তাই বিশেষভাবে স্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তখন পরিষদের সহ-সভাপতি। তিনি চেয়েছিলেন—'বাঙলা দেশ এবং বাঙালী জাতি সম্বন্ধে যাহাকিছু জ্ঞাতব্য হইতে পারে, সাহিত্য পরিষদ যদি সেই সমস্ত বার্তা কেন্দ্রীভূত করিতে পারেন, তাহা হইলে পরিষদের জীবন সার্থক হইবে।' এই জাতীয় বাক্যের মধ্য দিয়ে সমস্ত বাঙালী জাতির অন্তরে নতুন এক জাগরণের সাড়া আনতে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন—'পরিষদের বার্ষিক উৎসব যেন বাঙলার ভিন্ন ভিন্ন নগরে পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হয়। বাঙালী জাতিকে তবে সাংস্কৃতিক বন্ধনে বাঁধিতে সুবিধা হইবে।'

বিষয়টি রামেন্দ্রসুন্দরকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এর দায়িত্বভার গ্রহণ ক'রে প্রয়োজনীয় কাজে অগ্রসর হন। ১৩১৪ সালে কাশিমবাজারে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে অভিভাষণ-প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর বলেন: 'বাঙলা দেশের, বাঙালী জাতির ধারাবাহিক ইতিহাস নাই; কিন্তু বাঙলা দেশের অতি পুরাতন সাহিত্য

আছে। সেই সাহিত্য বাঙালীর পক্ষে অগৌরবের বস্তু নহে। এমন কি সেই সাহিত্যই বাঙালীর পক্ষে একমাত্র গৌরবের ধন। চণ্ডীদাস মধুর রসের সুধার ধারা ঢালিয়া যে সাহিত্যকে আর্দ্র করিয়াছেন, রামপ্রসাদ তাঁহার মায়ের চরণে আপনাকে নৈবেদ্য স্বরূপে অর্পণ করিয়া যে সাহিত্যে ভক্তিরসের স্নেহসেচন করিয়াছেন, সেই সাহিত্য শিরে ধরিয়া, ভবের বাজারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার অধিকারে আমাদিগকে বাধা দিতে কেহ সাহস করিবে না,—বসুমতীর বড়বাজারের প্রদর্শনীতে বাঙালীর পক্ষে আর কোন পণ্যদ্রব্য দেখাইবার আছে কি ?…জাতির সহিত জাতির ও রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের জীবনদ্বন্দ্বের বিকট কোলাহল, যাহা শত শতাব্দের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া আজ পর্যন্ত মানবের ইতিহাসে ধ্বনিত হইতেছে, সেই কোলাহলের মধ্যে বাঙালীর ক্ষীণকণ্ঠ শ্রুতিগোচর হয় না বলিলেই চলে। বাঙালীর ভবিষ্যতের আশা ও ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা যাহাই হউক, বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাসে বাঙালীর বৈশ্যবৃত্তির ও বীরবৃত্তির কীর্তিকথা লইয়া জগতের সম্মুখে উপস্থিত হইতে আমরা কখনই সাহসী হইব না। নাই বা হইলাম। তজ্জন্য লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হইবার হেতু দেখি না। বাঙলার পুরুষ-পরম্পরাগত সহস্র বৎসরের ধারাবাহিক সাহিত্য লইয়া আমরা ভবের হাটে উপস্থিত হইব; সেখানে কেহ আমাদিগকে ধিক্কার দিতে পারিবে না।—বাঙলার ইতিহাস নাই বটে, কিন্তু এই সাহিত্য হইতে আমরা প্রাচীন বাঙালীর নাড়ীনক্ষত্রের পরিচয় পাই! সেকালের বাঙালী কিরূপে কাঁদিত, কিরূপে হাসিত, তাহার অন্তরের মর্মস্থানে কখন কোন্ স্বরে ধ্বনি উঠিত, তাহার আশার কথা, আকাঙ্ক্ষার কথা, তাহার স্বপ্নের কথা এই প্রাচীন সাহিত্য হইতে আমরা জানিতে পারি। পৃথিবীতে কয়টা জাতি এতদিনের এমন সাহিত্য দেখাইতে পারে? তাহাদিগকে আপনার অস্তিত্বের জন্য লজ্জিত হইতে হইবে না।…'

বিজ্ঞানী হয়ে বাংলা সাহিত্যকে রামেন্দ্রসুন্দরের ন্যায় এমন ভালোবাসবার নিদর্শন বিরল। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ভিন্ন বাংলা সাহিত্য সাধনার এমন সার্থক দৃষ্টান্ত বড় একটা পাওয়া যায় না। একটি সারস্বত ভবন প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতাও রামেন্দ্রসুন্দর উপলব্ধি করেন। এই সারস্বত ভবন হবে বাংলা ও বাঙালী জাতির শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে—'যেখানে বসিয়া আমার বাঙলা দেশকে ও বাঙালী জাতিকে প্রত্যক্ষভাবে

ও স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইব, সেইখানে বসিয়া আমরা বঙ্গভূমির বর্তমান অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে পারিব ও অতীত ইতিহাসের সম্যক্‌রূপে আলোচনার সুযোগ পাইব। সেই মন্দিরের এক পার্শ্বে একটি পুস্তকালয় থাকিবে, সেইখানে বাঙলা ভাষায় রচিত মুদ্রিত-অমুদ্রিত, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থ সংগৃহীত হইবে, বঙ্গের নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হাতে-লেখা প্রাচীন পুঁথি সেইখানে স্তূপীকৃত হইবে।...মন্দিরের অন্যস্থানে আমরা বঙ্গের সাহিত্যিকগণের স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাইব।...আর একস্থানে বাঙলার পুরাতত্ত্বের উপাদান সংগৃহীত হইবে। বাঙলার যেখানে যে তাম্রশাসন বাহির হয়, সেখানে যে মুদ্রা পাওয়া যায়, তাহা সেইস্থানে সজ্জিত হইবে। বঙ্গের পরিত্যক্ত রাজধানীসমূহের ভগ্নাবশেষের ছায়াচিত্র উহাদের পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করাইবে।...আর একস্থানে কর্মবীরদের স্মৃতিচিত্রের সংগ্রহ থাকিবে। প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম হইতে রামগোপাল ঘোষ ও কৃষ্ণদাস পাল পর্যন্ত সকলেরই কোন-না কোন নিদর্শন দেখিয়া আমরা পুলকিত হইব। কর্মীদের পার্শ্বে পণ্ডিতদের স্থান থাকিবে ...এই মন্দিরকেই আমি মাতৃমন্দির নাম দিতে পারি ও এই মন্দির-মধ্যে সংগৃহীত দ্রব্যসম্ভারকে আমি মাতৃপ্রতিমা নাম দিতে পারি।'

পরিতাপের বিষয় যে, রামেন্দ্রসুন্দরের এই পরিকল্পনা অদ্যাবধি সর্বাংশে পূর্ণ হয় নি। এই মাতৃমন্দির ও মাতৃপ্রতিমা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন থেকেই রামেন্দ্রসুন্দরের প্রাণে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়। তাঁর স্বদেশপ্রেমও ছিল অনন্যসাধারণ। স্বাদেশিকতা সম্পর্কে তিনি যে সংজ্ঞা আরোপ ক'রে গেছেন, জাতির জীবনে তা চিরকাল স্মরণীয়। তিনি বলেন: 'মূলে স্বদেশানুরাগের ভিত্তি না থাকলে স্বদেশের উন্নতিচেষ্টা কেবল পণ্ডশ্রম; এবং যে জাতির আপনার পুরাতন কাহিনী জানিবার প্রবৃত্তি নাই, তাহার স্বদেশানুরাগের আস্ফালন সর্বতোভাবে উপহাস্য। স্বদেশের উন্নতির জন্য এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন, শিল্পশিক্ষার প্রচার, বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রচার, শিল্পসমিতি স্থাপন প্রভৃতি নানাবিধ উদ্যমই ব্যর্থ ও বন্ধ্য হয়। তাহার মূল কারণ এক। আপনার জাতির অতীত ইতিহাসে যাহার শ্রদ্ধা নাই, সে যেন কৃত্রিম স্বদেশপ্রিয়তার স্পর্ধা না করে। আপনার জাতিকে যে চেনে না, সে যেন কৃত্রিম স্বদেশানুরাগের আস্ফালন না করে।'

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের অবিমৃষ্যকারী শাসননীতির ফলে বঙ্গভঙ্গ সুনিশ্চিত হ'লে রামেন্দ্রসুন্দর তার বিরুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ ক'রে দাঁড়ান এবং বাংলার নারী সমাজকেও স্বাদেশিকতার ব্রতে উজ্জীবিত ক'রে তোলেন। তাঁর 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' সেই নারীজাগরণেরই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রামেন্দ্রসুন্দরের দেশাত্মবোধ ও সাহিত্যকীর্তির অন্যতম সম্পদ এই 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'। নিজের স্বদেশানুরাগ সম্পর্কে তিনি বলেছেন: 'শৈশবেই আমি জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া জানিতে উপদিষ্ট হইয়াছিলাম। সে মন্ত্রে দীক্ষা সে বয়সে সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যিনি দীক্ষা দিয়াছিলেন, তিনি কোথা হইতে আজিও আমার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার দিব্যদৃষ্টি অতিক্রম করা আমার সাধ্য নহে। আমার শক্তি ছিল না, কিন্তু সেই দিব্যনেত্রের প্রেরণা ছিল; আমার জীবনে যদি কিছু সার্থকতা থাকে, তাহা সেই প্রেরণার ফল।'

রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে এই দেশমাতা ও গর্ভধারিণী জননী এক হয়ে মিশে গিয়েছিলেন। শেষ বয়সে স্বর্গাদপি গরীয়সী সেই গর্ভধারিণীর মৃত্যুশোক তিনি সহ্য করতে পারেন নি। সেই শোকেই তিনি শয্যা গ্রহণ করলেন এবং এই শয্যাই তাঁর শেষ শয্যা হ'লো।

জেনারেল ডায়ারের নির্মম আদেশে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড তখন কেবল সমাপ্ত হয়েছে। নিরীহদের উপর এই নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ তদানীন্তন বড়লাট লর্ড চেম্সফোর্ডকে পত্র দিয়ে তাঁকে প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন। এতে সেদিন সব চাইতে যিনি বেশি খুশী হয়েছিলেন, তিনি রামেন্দ্রসুন্দর। তাঁর রোগশয্যায় এসে রবীন্দ্রনাথ যখন লর্ড চেম্সফোর্ডকে লিখিত তাঁর মূল পত্রের পাণ্ডুলিপিটি তাঁকে পড়ে শোনান, দারুণ একটা উত্তেজনায় তখন রোগশীর্ণ রামেন্দ্রসুন্দরের সমস্ত প্রাণসত্তা আবেগচঞ্চল হয়ে ওঠে; মাথা নত ক'রে তিনি রবীন্দ্রনাথের পদধূলি গ্রহণ করেন। অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে তাঁর প্রাণবায়ু নিঃশেষিত হ'য়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের এই ঐতিহাসিক মিলন ও রামেন্দ্রসুন্দরের মহাপ্রয়াণ যেমন অভিনব, তেমনি বিস্ময়কর। ১৯১৯ সালের ৬ই জুন তিনি তাঁর চিরস্বপ্নের চির-সাধনার বঙ্গভূমিকে মনে মনে শেষ প্রণাম নিবেদন ক'রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ২০শে আগষ্টের স্থায় ৬ই জুন

নৈসর্গিক নিয়মে বার বার বর্ষচক্রে ঘুরে আসবে, কিন্তু যে মহান্ অভ্যুদয়ে বাংলা সাহিত্য তথা বঙ্গসংস্কৃতি একদিন অতুল প্রাণৈশ্বর্যে ঐতিহ্যশালিনী হয়ে উঠেছিল, সেই মহাপ্রাণ মনীষীকে এদেশের উন্মুখ দৃষ্টি আর কোনো কালেই অবলোকন করবে না। রামেন্দ্রসুন্দরের এক সংবর্ধনা সভায় তাঁকে সাদর অভিনন্দন জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: 'সর্বজনপ্রিয় তুমি, মাধুর্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিসিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি।'

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতি এই বাণীই বাংলার আত্মনিবেদনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যরূপে চিরকাল তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত হয়ে রইল।

॥ দীনেশচন্দ্র সেন ॥

সম্প্রতিকালে বাংলার লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য নিয়ে অনেকের মধ্যে নানা চর্চা ও গবেষণা দেখা দিয়েছে। জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হ'তে হ'লে এই গবেষণা অপরিহার্য। বাংলার চতুর্থ ও পঞ্চম দশক কালের জীবনযাত্রা ছিল অস্থির ও অস্থায়ী। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা ও পরিশেষে দেশভাগের লাঞ্ছনা এই দু'-দশকে বাঙালীকে নানা দিকে খর্ব ক'রে দিয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও সে তার সংস্কৃতিকে ভোলে নি। ষষ্ঠ দশকে এসে জীবন যখন আবার খানিকটা স্বরে বইতে শুরু করলো, তখন নতুন ক'রে তৈরি হ'লো তালপাতার পুঁথি থেকে কাগজের পুঁথি। এই লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহে দীনেশচন্দ্র ছিলেন আধুনিক বাঙালীর পথিকৃৎ। সুতরাং আজকের নতুন গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁকে বিস্মৃত হ'লে বাঙালী নিজের সংস্কৃতির অঙ্গেই কুঠারাঘাত করবে। এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্রের জীবনী আলোচনার প্রয়োজন আছে।

ঢাকা জেলার বগজুড়ি গ্রামে ১৮৬৬ সালের ৬ই নভেম্বর দীনেশচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ঈশ্বরচন্দ্র সেন ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা জেলার সুয়াপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজী, বাংলা ও ফার্সীতে সুপণ্ডিত ছিলেন। দীনেশচন্দ্রের জন্মের পূর্বেই তিনি বাংলা ভাষায় 'সত্য ধর্মোদ্দীপক নাটক,' 'ব্রহ্মসঙ্গীত রত্নাবলী' এবং 'দিনাজপুরের ইতিহাস' রচনা করেন। তৎকালীন ইংরেজী পত্রিকা 'ইংলিশম্যানে' তিনি নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর ধর্মমত ছিল আদিসমাজের অনুকূল। যদিও তিনি সহধর্মিণী রূপলতা দেবীর প্রতিবন্ধকতায় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করতে পারেন নি, কিন্তু আজীবন তিনি একনিষ্ঠ ভাবে ব্রাহ্মমত অবলম্বন ক'রেই চলেছিলেন। রূপলতা দেবী ছিলেন গোকুলকৃষ্ণ মুন্সীর কন্যা। তিনি যেমন পরমাসুন্দরী ও হিন্দুধর্মে নিষ্ঠাবতী নারী ছিলেন, তেমনি গুণে ও স্নেহে ছিলেন দেবীসদৃশা। গোকুলকৃষ্ণের পারিবারিক মর্যাদা এত অধিক ছিল যে, সে অঞ্চলে যাত্রা, কবি, কীর্তন, টপ্পা, খেমটা প্রভৃতি সঙ্গীতচর্চার যতগুলি দল ছিল, তারা মুন্সীবাড়িতে গেয়ে নাম করলে তবে অন্যত্র খ্যাতি পেতো। দীনেশচন্দ্রের মধ্যেও এই গীতিপ্রবণতা ছিল।

তিনি ছিলেন তাঁর পিতামাতার দ্বাদশ সন্তান এবং একমাত্র পুত্র। এজন্য পরিবারে তাঁর আদরের শেষ ছিল না। তাঁর পিতামহ রঘুনাথ সেনের ছিল বাগানের সখ। নানা জায়গা থেকে নানা রকম ফলের গাছ এনে তিনি নিজের বাগানকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছিলেন। পাখিদের কলকাকলিতে সে বাগান সর্বদাই পূর্ণ থাকতো। এ দৃশ্যও কবি দীনেশচন্দ্রকে শিশুকাল থেকেই প্রভাবিত করে।

কিন্তু ১৮৮৬ সাল যেন এক দারুণ মহামারী নিয়ে এসে দীনেশচন্দ্রের পরিবারে দেখা দিল। এ সময়ে অতি অল্পকালের মধ্যে তাঁর বাবা, মা ও কয়েকটি ভগ্নীর মৃত্যু হয়। গোটা পরিবারটা যেন শ্মশানে পরিণত হয়ে গেল। এ সময়ে দীনেশচন্দ্র ঢাকা কলেজে বি. এ. পড়ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের উপর তাঁর অসাধারণ অনুরাগ ছিল এবং পাঠ্য পুস্তকের চাইতে অপাঠ্য পুস্তকাবলীর উপরেই তাঁর ঝোঁক ছিল অধিক। শিশুকাল থেকেই রামায়ণ ও মহাভারত তাঁর প্রায় মুখস্থ ছিল। এ সম্পর্কে তাঁকে তাঁর বিধবা ভগ্নী দিগ্‌বসনী দেবী সাহায্য করতেন। দিগ্‌বসনীর বিয়ে হয়েছিল কোনো বৈষ্ণব পরিবারে। বৈষ্ণব সাহিত্যের তিনি একজন অনুরাগী পাঠিকা ছিলেন। দীনেশচন্দ্রের প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ প্রথমতঃ এই ভগ্নীর উৎসাহেই জন্মায়। ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি দীনেশচন্দ্রের এত বেশি অনুরাগ ছিল যে, প্রথম জীবন থেকেই তাঁর একখানি ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস লিখবার কল্পনা ছিল। ইংরেজী সাহিত্যের যেসব মহারথী তাঁর মনকে বিশেষ ভাবে দোলা দিতেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন--সেক্সপীয়র, মিল্টন, ওয়েবষ্টার, ভিক্টোর হিউগো, হিউজিন স্যু, গ্যেটে, ফোর্ড, মার্লো, বোমণ্ট ফ্লেচার, টেনিসন, ওয়াল্টার স্কট, চেটারটন, কীটস প্রভৃতি। তেমনি ভারতীয় দৃষ্টিতে সংস্কৃত ও গ্রীক আলঙ্কারিকদের রীতি আলোচনা তাঁর অনুশীলনকর্মের একটি প্রধান বিষয় ছিল। স্কটের 'লেডী অব দি লেকের' প্রায় পুরোটা তিনি অনুরূপ বাংলা ছন্দে অনুবাদ করেছিলেন ; এ সময়ে তাঁর বয়স ছিল মাত্র সতেরো।

শারীরিক অসুস্থতায় যথাসময়ে বি. এ. পরীক্ষা দিতে না পেয়ে দীনেশচন্দ্র পরে শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ স্কুলে মাষ্টারী ক'রে বি. এ. পরীক্ষা দেন এবং ইংরেজীতে অনার্সসহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিস্ময়ের বিষয় যে, একদিকে

এই ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি অসাধারণ অনুরাগ এবং অন্যদিকে দিগ্বসনা দেবীর সাহচর্যে বাংলার পুরাণ ও বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি সেই বয়সেই দীনেশচন্দ্রকে মহাপণ্ডিত ক'রে তুলেছিল। বি. এ. পাসের পর হাবিগঞ্জ স্কুল ত্যাগ ক'রে তিনি কুমিল্লায় এসে শম্ভুনাথ ইনষ্টিটিউশনের হেডমাষ্টার হন। এ সময়ে কবি নবীনচন্দ্র সেন ছিলেন ফেনী সাবডিভিশনের ম্যাজিষ্ট্রেট, তিনি দীনেশচন্দ্রকে ফেনী হাইস্কুলের হেডমাষ্টার পদে নিয়োগ করতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু দীনেশচন্দ্র তা গ্রহণ করেন নি ; পরে তিনি ভিক্টোরিয়া স্কুলে এসে ১৮৯১ সালে হেডমাষ্টাররূপে যোগদান করেন। এই ভিক্টোরিয়া স্কুলে থাকাকালেই দীনেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' সূত্রপাত হয়। তখন তাঁর পরিবারে নিজের স্ত্রী ভিন্ন আর কেউই ছিলেন না, সকলেই তখন লোকান্তরিত। শ্বশুরালয়ের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্প্রীতি ছিল না। এসব কারণে জীবন সম্পর্কে বীতস্পৃহ হয়ে তিনি মনে মনে স্থির করলেন—কোনও মহৎ ব্রতে জীবন উৎসর্গ করবেন।

তিনি বলতেন : 'আমি ধন-মান-প্রতিষ্ঠা কিছুই চাই না, আমি বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হবো ; যদি তা না হ'তে পারি, তবে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হবো।' বস্তুতঃ, তরুণ জীবনে দীনেশচন্দ্র যে কত কবিতা লিখেছিলেন, তা'র হিসেব নেই। তা একত্র করলে ওয়েবষ্টারের অভিধানের মতো একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হতে পারতো। অষ্টাদশ বর্ষে তাঁর 'কুমার ভূপেন্দ্র সিংহ' নামক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয়—এক অগ্নিদাহে তার সমস্ত কপিই নষ্ট হয়ে যায়। ফলে কাব্য সম্পর্কে তিনি অনেকখানি নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন। ১৮৯১ সাল থেকে তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলীকে আকৃষ্ট করে। এ সময়ে পর পর তাঁর তিনটি প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা—'কালিদাস ও সেক্সপীয়র', যোগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'জন্মভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, 'অনুসন্ধান' পত্রিকা পত্রস্থ করে 'জন্মান্তরবাদ', এবং তৃতীয় প্রবন্ধ হচ্ছে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', কলকাতার এক এসোসিয়েশন উক্ত বিষয়ক প্রবন্ধের জন্য একটি পদক ঘোষণা করেন, এবং দীনেশচন্দ্রই সেই পদক লাভ করেন। এই প্রবন্ধের পরীক্ষক ছিলেন চন্দ্রনাথ বসু ও রজনীকান্ত গুপ্ত। 'জন্মান্তরবাদ' প্রবন্ধ প'ড়ে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'অনুসন্ধান' পত্রিকার সম্পাদককে এক পত্রে লিখে জানান :

'আমি ভবিষ্যৎবাণী করিতেছি, এই লেখক অচিরে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিবেন।' দীনেশচন্দ্রের জীবনে সেই ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ হয় নি।

একবার এক ছুটির অবকাশে ঢাকায় গিয়ে তিনি 'পদাবলীর আলে কে চৈতন্য' বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন এবং 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' সম্পর্কে বিশ্লেষণ ক'রে সকলকে শোনান। তাঁর আত্মীয় কুমুদবন্ধু সেন ও অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের পিতা এটর্ণি প্রসন্নকুমার সেন তাতে মুগ্ধ হয়ে বলেন: "কি আশ্চর্য, আমাদের দেশী সাহিত্যে যে এরকম রত্নের ভাণ্ডার, তা আমি জানতাম না। এবার থেকে আমি ইংরেজী ও সংস্কৃত ছেড়ে দিয়ে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য ভালো ক'রে পাঠ করবো।' প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, প্রসন্নকুমার ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং বিভিন্ন ইংরেজী পত্রে প্রবন্ধ লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দীনেশচন্দ্র স্থির করেন—ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস না লিখে তিনি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যেরই ইতিহাস রচনা করবেন।

এ সময়ে বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ দীনেশচন্দ্রের আর একটি প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ালো। তিনি জানতে পারলেন—ত্রিপুরার অরণ্যপল্লীগুলিতে বহুসংখ্যক জীর্ণ তালপত্রের এবং তুলট কাগজের বাংলা পুঁথি আছে। এ পর্যন্ত Asiatic Society of Bengal শুধু সংস্কৃত পুঁথিরই খোঁজ করতেন। বাংলা পুঁথির দু'একখানির নাম একমাত্র হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভিন্ন আর বড় একটা কেউ জানতেন না। দীনেশচন্দ্র ঝড়-জল ও বাধাবিপত্তি তুচ্ছ ক'রে জীবন ঢেলে দিলেন এই পুঁথি সংগ্রহের কাজে। এ সময়ে তাঁর মানসিক অবস্থা এরূপ ছিল যে, এ কাজে যদি তাঁর মৃত্যুও হয়, তবে সেই মৃত্যুকে তিনি জীবনের পরম সার্থকতা হিসেবেই জেনে যাবেন। এইভাবে তিনি সমগ্র বঙ্গভূমি পরিভ্রমণ ক'রে পুঁথির পর পুঁথি আবিষ্কার ও সংগ্রহ ক'রে বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলেন। যেসব কবি এক এক কালে আবির্ভূত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে নানা ভাবে গড়ে তুলেছেন, তাঁরা কবেই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছিলেন। দীনেশচন্দ্রের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে বাংলার বিভিন্ন পুরাণ, মঙ্গলকাব্য, কড়চা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়ে সেই বিস্মৃত কবিরা বাঙালী পাঠকের জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের সুযোগ পান। তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' এদিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যের খনি, সন্দেহ নেই। এই খনি থেকে কত শিল্পী কত রত্ন গ্রহণ ক'রে পরবর্তীকালে খ্যাতিলাভ করেছেন, তার

অন্ত নেই। ত্রিপুরা রাজের অর্থানুকূল্যে ১৮৯৬ সালে ত্রিপুরা রাধারমণ প্রেস থেকে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রথম প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু ক'রে প্রত্যেকের মুখে মুখে তখন এই গ্রন্থের প্রশংসা। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বললেন: 'দীনেশচন্দ্র সেন—হবেন আমাদের টেন।' বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র লিখলেন: 'এই পুস্তক সমালোচনার ক্ষেত্রে টেনের মতো তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিশালী এবং উপকরণ সংগ্রহের বিশালতায় মর্লের স্কেচের মতো একটি রত্নভাণ্ডার।'

এ সময়ে ভিক্টোরিয়া স্কুলকে কলেজে পরিণত করার জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। কিন্তু অকস্মাৎ মস্তিষ্কের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। সেই অবস্থায় তাঁকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে তখন তিনি বিশেষ সম্মানিত লেখক। এ সময়ে যে-সমস্ত মনীষী ব্যক্তি নানাভাবে তাঁর সাহায্যে আসেন, তাঁদের মধ্যে এফ. এইচ. স্ক্রাইন, জজ গ্রীয়ারসন, স্যার জন উডবার্ণ, মিঃ স্যাণ্ডেল, মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য ও রাজা রাধাকিশোর মাণিক্য, বরদাচরণ মিত্র, ময়ূরভঞ্জের মহারাজ বাহাদুর, গগনেন্দ্র-সমরেন্দ্র-অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি প্রধান। স্বল্প রোগমুক্ত হয়ে দীনেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' ও সরলা দেবী সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকার সঙ্গে কার্যসূত্রে যুক্ত হন। অতঃপর তিনি যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেন, তার মধ্যে 'বেহুলা' ও 'রামায়ণী কথা' সব চাইতে অধিক জনপ্রীতি অর্জন করে। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকখানি গ্রন্থও বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যথা—সতী, জড়ভরত, ফুল্লরা, ধরাদ্রোণ, কুশধ্বজ, মুক্তাচুরি, রাখালের রাজগী, রাগরঙ্গ, সুবল সখার কাণ্ড শ্যামলী খোঁজা প্রভৃতি। এসব গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, দীনেশচন্দ্র কখনও এ সমস্ত উপাখ্যান সাধারণ গল্প বা রূপকথার ভাবে লেখেন নি। 'বেহুলা' ইংরেজীতে অনুবাদ করেন কিরণচন্দ্র সেন ও ক্যাপ্টেন পিটাভেল, 'সতী'র ইংরেজী অনুবাদ দীনেশচন্দ্র নিজেই করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেন কেমব্রিজের বাংলার অধ্যাপক জে. ডি. এণ্ডারসন।

১৯০২ সালে দীনেশচন্দ্র স্যার আশুতোষের সংস্পর্শে এসে ক্রমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রীডার' নিযুক্ত হন এবং স্যার আশুতোষের নির্দেশে ইংরেজী

ভাষায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একখানি মৌলিক ইতিহাস রচনা করেন। ভগিনী নিবেদিতা গ্রন্থের যাবতীয় পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া দেখে দেন। গ্রন্থখানি বিলাতে বিশেষভাবে আদৃত হয়। ডাঃ ওল্ডেনবার্গ, ডাঃ কারণ, ডাঃ গ্রিয়ারসন, ডাঃ সিলভাঁ লেভি, ডাঃ ব্লক প্রভৃতি প্রাচ্যবিদ্যার পণ্ডিতগণ এবং বিলাতের প্রসিদ্ধ পত্রিকা-সম্পাদকেরা তাঁদের লিখিত সুদীর্ঘ সমালোচনায় এই গ্রন্থের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ হাওএল্‌স্‌ একবার দীনেশচন্দ্রকে তাঁর কলেজ পরিদর্শন করতে নিয়ে গিয়ে সভায় দাঁড়িয়ে বলেন: 'আপনারা এই একান্ত অনাড়ম্বর বাঙ্গালী লেখকের নাম অবশ্যই শুনেছেন, হয়ত আপনারা জানেন—ইনি একজন বাংলাভাষার লেখক; কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই জানেন না যে, ইউরোপের এমন কোনো প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র নেই—যেখানে ডাঃ সেনের নাম সম্মানের সঙ্গে উচ্চারিত না হয়।'

জে. ডি. এণ্ডারসন, আই-সি-এস বলেন: 'আপনি তাঁদের নাম জানেন না, এরকম বহু শিক্ষিত লোক জগতের নানাস্থানে আছেন—যাঁরা আপনার লেখার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা বহন করেন।'

শাসনকর্তাদের মধ্যে স্যার জন উডবার্ণ, লর্ড হার্ডিঞ্জ, লর্ড রোণাল্ডসে, লর্ড লিটন, স্যার ষ্ট্যানলি জ্যাকসন প্রভৃতি সকলেই ছিলেন দীনেশচন্দ্রের রচনার অনুরাগী পাঠক। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তাঁর মৌলিক সাহিত্য-অবদানের অনেক প্রশংসা করেন। ডাঃ সিলভাঁ লেভি নানা ফরাসী পত্রিকায় দীনেশচন্দ্রের কৃতিত্বের কথা বহু প্রবন্ধেই উল্লেখ করেছেন। এরকম একখানি পত্রে তিনি একবার উল্লেখ করেন যে—'বঙ্গদেশকে ইউরোপের সুধীসমাজে ঘনিষ্ঠভাবে চেনাবার জন্য দীনেশবাবু যা করেছেন, অপর কোনো লেখক তা করতে পারেন নি।'

এ সময় থেকে পরবর্তী বিশ বছর কালের জন্য দীনেশচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্যপদে নিযুক্ত হন। তাঁর এ সময়ের ইংরেজী গ্রন্থগুলির মধ্যে: History of Bengali Language and Literature, Typical Selections from Old Bengali Literature, Chaitanya and His Age, Medieval Vaishnab Literature, History of Bengali Prose Style, Glimpses of Bengal History, Folk Literature of Bengal, The Bengali Ramayanas প্রভৃতি প্রধান। ইউরোপীয়

পণ্ডিত মণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর যে সমস্ত আলোচনামূলক পত্র ব্যবহার হয়, তাও এক-একটি সাহিত্যের খনি স্বরূপ। টাইম্‌স্‌ পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে একবার লেখা হয়: 'History of Bengali Literature and Language প'ড়ে পাঠক যে অভিজ্ঞতা লাভ করবেন, বিদেশি পর্যটকের ভূপর্যটকের পুস্তকে বা কোথায় তা পাবেন না। পটির ত্রিবাঙ্কুরের মন্দিরের অনুষ্ঠানগুলির কৌতূহল-উদ্রেককারী বর্ণনা ও নিত্য'বলনের আড়ম্বরপূর্ণ হিন্দুশাস্ত্রের ব্যাখ্যা এই সহজ ও অনাড়ম্বর বইখানির সঙ্গে তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর বোধ হতো।'— এই টাইম্‌স্‌ পত্রিকাই আর-একবার লেখেন: 'ভবিষ্যতে বঙ্গবাসীর মানসনেত্রে উপকরণ সংগ্রহ বিষয়ে দীনেশচন্দ্রের বীরভূমির রক্তবর্ণ ভূমি ও পূর্ববঙ্গের নদনদীর উপকূলে ভ্রমণ একটা কল্পনা-জগৎ বিচিত্র ক'রে দেখাবে, যেন আবহমান কাল ধ'রে এক পর্যটক গ্রীষ্ম ঋতুর সৌরকর মাথায় ক'রে এবং ঝড়বৃষ্টির পথ দিয়ে গঙ্গার নিম্ন উপত্যকাতে স্বীয় দেশের ভাষার সমৃদ্ধির জন্য রত্ন সন্ধান করছে।'

১৯১৮ সাল পর্যন্তও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। এ সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র বহুবার স্যার আশুতোষকে অনুরোধ জানিয়েছেন যাতে বাংলায় এম-এ পরীক্ষার প্রবর্তন হয়। কিন্তু স্যার আশুতোষ কোনোরকম সাড়া দেন নি। পরে ১৯১৯ সালে আশুতোষ রাজী হন এবং বলেন: 'এম-এ পরীক্ষা শুধু বাংলায় সীমাবদ্ধ থাকবে না। প্রাদেশিক অন্যান্য ভাষাভাষী লোকদের জন্যও দ্বার খোলা রাখবো; বাংলা ভাষা এখনও জগতে এরূপ প্রতিষ্ঠিত হয় নি যে, সকলেই তা বুঝবে। এজন্য ইংরেজী ভাষায় এর ইতিহাস ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ক বই থাকা চাই।'

সুখের বিষয় যে, এর পর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম. এ. ক্লাশ খোলা হয় এবং প্রায় ২৩।২৪ বছরকাল ধ'রে দীনেশচন্দ্র বাংলা বিভাগের কর্ণধাররূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকেন। এ সময়ে বহু গ্রন্থ তাঁকে ইংরেজীতে প্রণয়ন করতে হলেও বাংলা গ্রন্থও তিনি একেবারে কম লেখেন নি। সেগুলোর মধ্যে—ওপারের আলো, নীল-মাণিক, আলো-আঁধারে, চাকুরীর বিড়ম্বনা, তিন বন্ধু, সাঁঝের ভোগ, গৃহশ্রী, বৈশাখী প্রভৃতি উপন্যাস উল্লেখ-যোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে তিনি রচনা করেন 'বৃহৎ বঙ্গ।' বঙ্গীয় সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, ধর্ম ও সুকুমার কলার ঐতিহাসিক উপাদানে

এই গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। বৃহত্তর বঙ্গকে বুঝতে হলে 'বৃহৎ বঙ্গ' অপরিহার্য। এতদ্ব্যতীত দীনেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ অবদান 'ময়মনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা।' পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য চাষী ও সাধারণ পল্লীবাসীদের যে গল্প বলবার একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে, তার সঙ্গে তিনি প্রথম পরিচিত হন ময়মনসিংহের জনৈক চন্দ্রকুমার দে রচিত 'কেনারাম' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ ক'রে। পরে এই চন্দ্রকুমারের সাহায্যে তিনি এরকম কিছু কাব্যকাহিনী সংগ্রহ করেন। এই হচ্ছে 'ময়মনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র মূল উৎস। দীনেশচন্দ্র নিজে এবং কোনো কোনো লোকের সাহায্যে সমগ্র গাথা-কাহিনী সংগ্রহ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা যদিও এ সময়ে অত্যন্ত সঙ্কটজনক ছিল, তবু স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ইংরেজী অনুবাদ ও মূল কবিতা দু'ভাগে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। 'মহুয়া'র ইংরেজী সংস্করণ পাঠ ক'রে ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজ বাংলার নিরক্ষর চাষীদের কবিত্বশক্তির পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হন। ক্রমে সরকারী অর্থ-সাহায্যে অন্যান্য খণ্ডগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা হ'লো এবং 'ময়মনসিংহ গীতিকা' নামটি পরিবর্তিত হয়ে 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নাম দেওয়া হ'লো। এই গীতিকা সম্পর্কে বিলাতের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ও সমালোচক স্যার উইলিয়াম রটেনস্টাইন লেখেন: 'অজন্তা, বাগ ও ইলোরা প্রভৃতি স্থানে যা চিত্রিত দেখেছিলাম, ভারত নারীর সেই অপরূপ রূপ বঙ্গপল্লী-গীতিকায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে।'

রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্রকে লিখে জানান: 'বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে মঙ্গল-কাব্য প্রভৃতি কাব্যগুলি ধনীদের ফরমাসে ও খরচে খনন করা পুষ্করিণী, কিন্তু ময়মনসিংহ গীতিকা বাংলা পল্লী-হৃদয়ের গভীর স্তর থেকে স্বতঃউৎসারিত উৎস, অকৃত্রিম বেদনার স্বচ্ছধারা। বাংলা সাহিত্যে এমন আত্মবিস্মৃত রসসৃষ্টি আর কখনও হয় নি। এই আবিষ্কৃতির জন্যে আপনি ধন্য।'

বঙ্গীয় পল্লীগীতিগুলির সমন্বয়ে দীনেশচন্দ্র 'পুরাতনী' নামে স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে প্রাচীন মুসলমান মহিলাদের আদর্শ জীবনীর সঙ্গে অনেক হিন্দুরমণীর জীবনবৃত্তান্তও সুললিত ভাবে লিপিবদ্ধ হয়। এই জাতীয় একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'বাংলার পুরনারী।' 'পদাবলী মাধুর্য' ও 'রেখা' তাঁর অপর দু'খানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত করেন।

এতদ্ব্যতীত ভারতমহামণ্ডলী কর্তৃক 'পুরাতত্ত্ববিশারদ', নবদ্বীপ বিদ্বৎমণ্ডলী কর্তৃক 'কবিশেখর' এবং গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 'রায়বাহাদুর' উপাধিতেও তিনি ভূষিত হন। তাঁর জীবনকথা আলোচনা প্রসঙ্গে দি ন্যাশনাল লিটরেচার কোম্পানী প্রকৃতই বলেছেন: 'দীনেশবাবুর পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা তাঁহাকে স্বদেশে ও বিদেশে বিদ্বানজনমণ্ডলীর মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছে। ম্যাডেলিন রোলাঁ তাঁহাকে Savant অর্থাৎ আচার্য বলিয়া উল্লেখ করিয়া সংক্ষেপে তাঁহার জীবনী ও তদ্রচিত পুস্তকতালিকা প্রদান করিয়াছেন। বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার কীর্তি সর্ববাদী স্বীকৃত হইয়াছে। প্রথম যৌবনে যিনি বাংলার লুপ্তপ্রায় শত শত প্রাচীন গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, প্রৌঢ় বয়সে যিনি বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা করিয়া বাংলা ও ইংরেজীতে বহু সরস প্রবন্ধে চৈতন্য-জীবন ও রাধাকৃষ্ণলীলা সুললিত ও মর্মস্পর্শী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যিনি বঙ্গদেশের জাতীয় জীবন ও তাহার শিক্ষা সংক্রান্ত এবং সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মনৈতিক প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, এবং জীবন সায়াহ্নে যিনি বঙ্গপল্লীর অপূর্ব সম্পদ্ পল্লীগীতিকাদি প্রকাশিত করিয়া বঙ্গসাহিত্যের একটি নূতন দিক উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, শৈশব হইতে জীবনে যিনি কোনদিন বিশ্রামপ্রার্থী হন নাই, যাঁহার রচনার লালিত্য ও মধুর ভাষা পাঠকের মর্মস্পর্শ করিয়া শতবার চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত করিয়াছে, তাঁহার প্রতি বাঙ্গালীমাত্রেই কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।'

দীনেশচন্দ্র যেমন উদার, সদালাপী ও নিরহঙ্কার ব্যক্তি ছিলেন, তেমনি ছিলেন মানুষমাত্রের প্রতিই স্নেহশীল। সাহিত্যই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান ও সাধনা। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি একাগ্র ভাবে সাহিত্য সাধনাই ক'রে গেছেন। সংক্ষিপ্তাকারে তাঁর যে সমস্ত জীবনী রচিত হয়েছে, তার মধ্যে রোমাঁ রোলাঁর ভগ্নী ম্যাডেলিন রোলাঁ রচিত জীবনীটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিদেশ থেকে তিনিই প্রথম দীনেশচন্দ্রকে আচার্য ব'লে সম্বোধন করেন। বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে তিনি ছিলেন যথার্থই আচার্য। তাঁর পথ ও রচনা অনুসরণ ক'রে পরবর্তীকালে বহু লেখক জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। আধুনিক বাঙালী-চিন্তাধারার এক বিশেষতম পথিকৃৎ ছিলেন দীনেশচন্দ্র॥

॥ প্রমথ চৌধুরী : বীরবল ॥

একাধারে সমালোচক, কবি ও প্রাবন্ধিক এবং বীরবলী ঢংয়ে রস-প্রবক্তা—এই সমুদয় গুণের একত্র সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে। বীরবল ছিলেন মোঘল সম্রাট আকবরের দরবারে বিখ্যাত হাস্যরসিক; তিনি রসিকতা করতেন মানুষকে হাসাবার জন্যে, কাউকে আঘাত দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। এদিক থেকে বিচার করলে মনে হয়—প্রমথ চৌধুরীর 'বীরবল' ছদ্মনাম যথোপযুক্তই হয়েছে। অথচ তিনি যেমন ইউরোপীয় সাহিত্যে সুপণ্ডিত, তেমনি ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রও তাঁর সমান অধিগত ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক প্রমথ চৌধুরীর ফরাসী সাহিত্যে যেমন ব্যুৎপত্তি এবং বার্গসঁ প্রমুখ দার্শনিকদের তিনি যেমন ভাববাহী, তেমনি কালিদাস, ভাস, বাণভট্ট ও ভর্তৃহরিরও তিনি ভাববাহী। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি অনুরাগই প্রমথ চৌধুরীকে আলঙ্কারিক ক'রে তোলে। কাব্য ও সাহিত্যে রস ও অলঙ্কার সম্পর্কে তিনি ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্য তুলনা ক'রে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'কাব্য-বিচার' ও অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'কাব্য-জিজ্ঞাসা'র ভিত্তিতে বলেন: "উপমা' প্রভৃতির নাম অলঙ্কার; ইংরেজীতে যাকে বলে Figure of Speech। অলঙ্কারকে প্রাচীনেরা কাব্যের প্রাণ বলেননি, এইমাত্র বলেছেন যে, অলঙ্কার কাব্য-শোভা বাড়ায়। সে যাই হোক্, অলঙ্কার সম্বন্ধে তাঁরা বহু তর্ক করেছেন আর তাদের শ্রেণী-বিভাগ করেছেন। অলঙ্কার-শাস্ত্রীরা অবশ্য রসের সন্ধান পেয়েছেন ও কাব্যকে 'রসাত্মক বাক্য' বলেছেন। আমি যখন কলেজে পড়ি, তখন কবি জয়দেব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখি এবং উক্ত কাব্যের ব্যাখ্যা করি। অবশ্য সেকালে আমি অলঙ্কার-শাস্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলুম, সুতরাং অ-শাস্ত্রী হিসেবে নিজের মত ব্যক্ত করি।—রস কথাটি ক্রমে নেহাৎ বাজারে হয়ে গিয়েছে, সুতরাং নব্য অলঙ্কারশাস্ত্রীরা রস বলতে কি বুঝতেন, তা পরে বলব। এখন অন্য কথায় যাওয়া যাক্। রীতি অলঙ্কার-শাস্ত্রের একটি বড় কথা এবং দাশগুপ্ত মহাশয় কাব্য-বিচারের একটি অধ্যায়ে তার সম্যক্ বিচার করেছেন। রীতির অর্থ কি ?—Style। দাশগুপ্ত মহাশয় বলেন যে, তা নয়। কোন ভাষারই একটি কথার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে

যায়, এমন কথা অন্য ভাষায় পাওয়া যায় না। কারণ, কালে কথাটির অর্থ বদলায়। Style ব্যতীত অন্য কোন কথায় রীতির পরিচয় দেওয়া যায়, বলা কঠিন। কথাটি প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রীর কথা। Keith বলেন, কাব্যাদর্শই অলঙ্কারশাস্ত্রের আদি গ্রন্থ। এ গ্রন্থে দুটি বিভিন্ন রীতির উল্লেখ আছে— বৈদর্ভী রীতি ও গৌড়ী রীতি। দণ্ডী কাব্যের ভাষার দশটি গুণের ফর্দ্দ দিয়েছেন। সে গুণগুলির মধ্যে প্রসাদ-গুণ হচ্ছে প্রধান গুণ ও সমাধি (metaphor)। যে কাব্যে এ সমস্ত গুণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, সেই কাব্যই বৈদর্ভী রীতিতে রচিত। তাঁর পরবর্ত্তী আলঙ্কারিক বামন বলেছেন যে, এ রীতি 'সমগ্রগুণা'। আর তার বিপরীত সকল দোষের আকর হচ্ছে গৌড়ী রীতি। তিনি এ রীতির যে উদাহরণ দিয়েছেন, তা আমাদের মতে—non-sense। অন্য আলঙ্কারিকরা অপর অনেক রীতির কথা বলেছেন। তার ভিতর কুন্তক নামে কোনও অর্ব্বাচীন আলঙ্কারিক 'সুকুমার রীতি' নামক একটি রীতির উল্লেখ করেছেন। কালিদাসের কাব্য নাকি এই রীতিতে রচিত। কুন্তকের নাম আমি পূর্ব্বে কখনও শুনি নি। কুন্তকের এ রীতির সোদাহরণ বিচার চমৎকার ও আমাদের আধা-বিলেতি মনকেও প্রসন্ন করে। কুন্তক অবশ্য নব্য আলঙ্কারিক নন। ভামহ নামক একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন আলঙ্কারিকের একটি কথা 'বক্রোক্তি' হচ্ছে তাঁর আলোচনার অবলম্বন। বক্রোক্তি বলতে তিনি কি বোঝেন, আমরা তা বুঝিনে।--রসের বিচার প্রাচীন আলঙ্কারিকরা করেন নি। করেছেন নব্য আলঙ্কারিকরা। কাশ্মীরের আনন্দবর্দ্ধন ও অভিনব গুপ্তই যথার্থ রসের বিচার করেছেন এবং তাঁদের পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকরা তাদের মতই অঙ্গীকার করেছেন। কুন্তক যদিচ অভিনব গুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন, তবুও তিনি রসের বিচার করেন নি—যে রস আমাদের নব্য সমালোচকদের একমাত্র বুলি হয়েছে।—রসের বিচার করেছিলেন একমাত্র ভরত। ভরত অলঙ্কারশাস্ত্র লেখেন নি, লিখেছিলেন নাট্যশাস্ত্র। সেই সঙ্গে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের কোন রস প্রকাশ করতে হলে মুখচোখের কি ভঙ্গি করতে হয়, সেই বিষয়েও উপদেশ দিয়েছিলেন।—অভিনব গুপ্ত ভরতের রস-অধ্যায়ের টীকা করেন। এবং সেই সূত্রে রসের বিচার করেন। তাঁর কথা হচ্ছে এই—'রস অর্থে সাধারণ ভাব (emotion) বোঝায়। শিল্পের দ্বারা অভিব্যক্ত emotion ভাবকেই রস

বলে।' সংক্ষেপে ভীত হলে মনে যে ভাবের উদয় হয়, তার নাম রস নয়। রস বস্তুতেও নেই, মনেও নেই। কবিরা রসের সৃষ্টি করেন ও আমাদের মনে তা সংক্রামিত করেন। অভিনব গুপ্তের রস-বিচার পড়লে কাণ্টের দর্শনের কথা মনে পড়ে।"

এ পাণ্ডিত্য সাধারণ পাণ্ডিত্য নয়। দর্শন ও সাহিত্য সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী বলেন: 'আমার মতে পৃথিবীতে শুধু দুই জাতীয় দর্শন আছে—এক আধিভৌতিক অদ্বৈতবাদ, আর এক আধ্যাত্মিক অদ্বৈতবাদ। এ দু'য়ের একটি না একটির যিনি প্রচারক, তিনিই দার্শনিক। আর আমরা যারা এর কোনোটিরই বশবর্ত্তী নই—আমরাই সাহিত্যিক। আমরা অবশ্য কখনও জড়ের দিকে ঝুঁকি, কখনও আত্মার দিকে। এই দু'য়ের ভিতর ইতস্তত: করাই সাহিত্যের সহজ ধর্ম্ম।'

যদি কোনো ইংরেজ শিল্পী বা দার্শনিকের সঙ্গে তাঁর তুলনা করতে হয়, তবে বলতে হয়—রচনাদর্শের দিক থেকে প্রমথ চৌধুরী অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ প্রাবন্ধিক এডিসনেরই শিষ্য, কবি পোপ বা গলিভার-রচয়িতা সুইফ্‌টের নয়। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর মত হচ্ছে: 'লোকে বলে সাহিত্যের উদ্দেশ্য হয় লোকের মনোরঞ্জন করা, নয় শিক্ষা দেওয়া। আমার বিশ্বাস, সহিত্যের উদ্দেশ্য দুই নয়, এক। এ ক্ষেত্রে উপায়ে ও উদ্দেশ্যে কোনও প্রভেদ নেই। এই শিক্ষার কথাটাই ধরা যাক্। সাহিত্যের শিক্ষা ও স্কুলের শিক্ষা এক নয়। সাহিত্যে লেখক ও পাঠকের সম্বন্ধ গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ নয়—বয়স্যের সম্বন্ধ। সুতরাং সাহিত্যে নিরানন্দ শিক্ষার স্থান নেই। অপর দিকে যে কথার ভিতর সত্য নেই, তা ছেলের মন ভোলাতে পাবে, কিন্তু মানুষের মনোরঞ্জন করতে পারে না। রহস্য করে যাঁদের মনোরঞ্জন করতে পারলুম না, স্পষ্ট কথা বলে যে তাঁদের মনোরঞ্জন করতে পারবো, এ হচ্ছে আশা ছেড়ে আশা রাখা। আর কথায় যদি মানুষের মনই না পাওয়া যায়, তা হ'লে সে কথা বলা বিডম্বনা মাত্র।'

'বীরবল' ছদ্মনামে মানুষের মনকে তিনি সেই রহস্যে বেঁধেছিলেন। কথা-সাহিত্যে বক্তব্যের চেয়ে রীতি তাঁর কাছে প্রিয়। কি বলা যায়, তার চাইতে কেমন ক'রে বলা যায়, তার দিকেই তাঁর অধিক প্রবণতা লক্ষ্য করবার মতো। তাঁর রচনায় সর্বত্রই একটা প্রচ্ছন্ন রসিকতা থাকায়

পাঠকের মনকে স্বভাবতঃই রসাপ্লুত করে। থিয়োফিল গ্যটিয়ারের শিল্প প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক বলেছেন যে, তাঁর আর্ট যেন বিভিন্ন রঙের সমন্বয়ে একটি অখণ্ড 'opal song', প্রমথ চৌধুরীর গল্পও তেমনি নিরেট, নিটোল, তা যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ, তেমনি আপন দ্যুতিতে ঝলোমলো।

দুঃখের বিষয় যে, তাঁর শিল্প-পরিচয়ের আস্তিত্ব সম্পর্কে এখনও আমাদের দেশের পাঠকশ্রেণী সচেতন নয়। তার জন্য অবশ্য তাঁর শিল্পের প্রকৃতিই কিছুটা পরিমাণে দায়ী। তাঁর শিল্পের চরিত্র এবং এক হিসেবে তাঁর বৈশিষ্ট্য হ'লো এই যে, তাকে শিল্প বলে চেনা কঠিন। বুদ্ধি এবং রুচি হ'লো তাঁর শিল্পের টানা-পোড়েন, তার উপর বিদগ্ধ মনের সূক্ষ্ম ফুলকাটা পাড় বসানো। এই গুণত্রয়ের সমন্বয় যে কতখানি সযত্ন নৈপুণ্যের ফল, আমাদের চোখকে তা এড়িয়ে যায়। তার কারণ, বীরবলের শিল্প এত বেশী আত্মসচেতন যে, তিনি কিছু একটা সৃষ্টি করে তুলছেন—এ সন্দেহ করবারও আমরা অবকাশ পাই না। ইতিমধ্যে শ্লেষ, বিদ্রূপ, চতুর-ক্ষুরধার বক্রোক্তি, হাস্যোজ্জ্বল কটাক্ষ, চমক ধরানো প্যারাডক্সের তীব্র তীক্ষ্ণ স্রোতে আমরা ভেসে গেছি। ফলে প্রমথ চৌধুরীর রচনা সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই শেষ ধারণা হ'চ্ছে এই যে, বুদ্ধিমার্গের এ এক অত্যাশ্চর্য তারের খেলা। এ ধারণা দৃঢ়তর হয় তাঁর প্রবন্ধ পড়লে—যা সাধারণের মতে সবচেয়ে বীরবলী। বীরবলের শিল্পের সঙ্গে এই তারের খেলার অবশ্য বিচ্ছেদ নেই, কিন্তু তাঁর রচনায় এই তারের খেলাই যিনি দেখবেন, অন্ধের হাতী দেখার মতোই সে দেখা তাঁর ব্যর্থ। বীরবলের মধ্যে যে নির্ভুল রূপকার আছেন, তাঁরই যদি আমরা দেখা না পাই, তবে আর যা দেখবো, কেবল ভুলই দেখবো। আর এই রূপকারের মুখোমুখি পরিচয় আমরা পেতে পারি তাঁর ছোট গল্পে।

তিনি একটি বিশেষ জাতীয় গল্পের আদি স্রষ্টা। সে-জাতের গল্প- তাঁরই নিজের কথায় বলতে গেলে—'শোন্‌বার জিনিষ, কিন্তু বিশ্বাস করবার জিনিষ নয়।' অর্থাৎ বাল্‌জাকের অথবা রবীন্দ্রনাথের গল্প যে চরিত্র, ঘটনা অথবা পরিবেশ সৃষ্টি করে, পাঠকের পক্ষ থেকে তাকে স্বীকার ক'রে নেবার জন্য শিল্পীর আমন্ত্রণ থাকে উহ্য। The Atheist's Mass অথবা 'পোষ্ট-মাষ্টার' নামক গল্পে সে আমন্ত্রণ স্বীকৃত, সুতরাং বালজাক অথবা রবীন্দ্রনাথের শিল্পও সার্থক। প্রমথ চৌধুরীর গল্পে যে এ-আমন্ত্রণ অনুপস্থিত এমন নয়, তবে গৌণ

এবং খানিকটা পরিমাণে রূপান্তরিত। তাঁর শিল্প ঘোরতর আত্মসচেতন; তার ফলে একটা সাদাসিদে গল্প সোজাসুজি ব'লে পাঠকের মনে illusion সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। বীরবলের গল্পে গল্পটাই থাকে পিছনে। অথবা বলা যায়, তাঁর পাত্র-পাত্রীদের অনর্গল, দ্যুতিময় কথার জালে গল্প ধরা পড়ে পাখীর মতো। বীরবলের গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হ'লো এই যে, তাঁর পাত্র-পাত্রীরা নিজেরাই নিজেদের ব্যাখ্যা করে; বিশ্লেষণ এবং সমালোচনা ঘটনাংশের চেয়ে গৌণ ত নয়ই, বরং মুখ্য। উদাহরণ হিসেবে তাঁর 'চার ইয়ারী কথা' ও 'ঘোষালের ত্রিকথা'র উল্লেখ করা যেতে পারে। 'ঘোষালের ত্রিকথা'র 'ফরমায়েসি গল্প' ধরা যাক্, এ গল্পে গল্পের চেয়ে কথা বড়। লেখকের কথা হ'লো—গল্প একেবারে দরকার নেই, আলাপটাই আসল। 'চার ইয়ারী কথা'র গল্পগুলিতে অবশ্য গল্প অনুপস্থিত নয়, এবং পদ্ধতির দিক থেকে তারা মোপাসাঁর গল্পের অনুরূপ অনেক সময় পাঠককে তিনি কিছু বিশ্বাস করাতে চান না, তাঁর গল্পে তাই গল্পাংশটি কেবলই অবলম্বন। গল্পের নগণ্য উপলখণ্ডকে ঘিরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তাঁর অপূর্ব সংলাপ, কখনও তা হাস্যচ্ছটায় দ্যুতিময়, কখনও ব্যঙ্গের তির্যক্ রশ্মিতে ভাস্বর, কখনও বা নাটকীয় সংহতিতে অপরূপ। এ সংলাপকে হয়তো তারের খেলা ব'লে অভিযুক্ত করা চলতো—যদি না এই সংলাপের মধ্য দিয়েই লেখক ঘোষালের মতো, নীল লোহিতের মতো, চার ইয়ারী কথার পাত্রদের মতো চরিত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হতেন। নীল লোহিত সম্বন্ধে লেখক বলেছেন যে, সে একটি জ্যান্ত গ্রামোফোন যাতে ভগবান স্বয়ং দম লাগিয়ে দিয়েছেন। এ কথা অল্পবিস্তর বীরবলের সব চরিত্র সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, কিন্তু বীরবলের শিল্পের বিশেষত্বই এইখানে যে, তাঁর গ্রামোফোনগুলি কথা বলতে বলতে কখন কোন্ অত্যাশ্চর্য উপায়ে জীবন্ত মানুষ হয়ে উঠেছে। যে শিল্পের দ্বারা এটা সম্ভব হ'লো, তাকে শুধু অসাধারণ বললে যথেষ্ট বলা হয় না।

বীরবলের শিল্প সম্বন্ধে অনেকের অভিযোগ এই যে, শাস্ত্রোক্ত সংসারের মতো তা ঊর্ধ্ব-মূল অবাঙ শাখ। অর্থাৎ বুদ্ধির উজ্জ্বল শূন্যে তাঁর শিল্প বিলম্বিত। মাটির সঙ্গে তার সংযোগ নেই। এ অভিযোগকে সরল বাংলায় তর্জমা করলে এই দাঁড়ায় যে, বীরবল কেবল রসিকতাই করেছেন, ব্যঙ্গই করেছেন, পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় উপলক্ষ্যে কেবল শাণিত প্রবচনই

শুনিয়েছেন, কিন্তু মানুষের চিরন্তন হৃদয়াবেগের খবর তাঁর কাছে পাওয়া যায় নি। প্রথম কথা, হৃদয়াবেগ বলতে যদি সস্তা চোখের জল বুঝতে হয়, তা হ'লে অবশ্য স্বীকার করতে হয় যে, প্রমথ চৌধুরী হৃদয়াবেগের কারবার কোনোদিন করেন নি। করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কেননা তাঁর শিল্পের মূলে রয়েছে সেই বিশুদ্ধ রুচি যা আতিশয্যের শত্রু। কিন্তু 'আবেগ' কথাটিকে যদি আমরা প্রকৃত অর্থে বুঝি, তা হলে বলতে হয়—উক্ত অভিযোগ বীরবলের প্রতি মারাত্মক অবিচার। কেন না, আবেগ যে শুধু তাঁর গল্প সাহিত্যে বর্তমান, তা নয়, উপরন্তু আর্টের যাদুস্পর্শে তা অমর রূপকল্পে বিশুদ্ধকৃত। উদাহরণ স্বরূপ 'বীণাবাঈ', 'আহুতি', 'সেনের কথা' ও 'মেরি ক্রিস্‌মাস' এর নাম করা যেতে পারে। 'বীণাবাঈ' বিশেষ ক'রে সংহত সৌন্দর্যের জন্য প্রেমের গল্পে শীর্ষস্থান অধিকার করবার যোগ্য। যাঁরা বুদ্ধি ও রুচির ভক্ত, যাঁরা সচেতন শিল্প-বোধের পরিমার্জনায় নিটোল নীবন্ধ সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারেন, বীরবলের শিল্পের আমন্ত্রণ একমাত্র তাঁদেরই জন্য।

এই প্রসঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন : 'প্রমথ বাবুর গল্প পড়তে পড়তে আমার মনে হ'ল যে, বীরবলী ভাষা প্রবন্ধে উপযোগী, কিন্তু ছোটগল্পে অনিবার্য। প্রধান কারণ এই, ছোটগল্প কেবল ছোট ও গল্প হলেই সার্থক হয় না, তার ছোটাও চাই; এবং ছোটবার জন্য কোঁচানো ধুতি-পাঞ্জাবীর পরিবর্তে শর্ট ও শার্টই সুবিধার। ভাষা যদি অযথা বিশেষণে, উপসর্গ কৃ ধাতুর নাগপাশে আটকে যায়, তবে গতি ও পরিণতি রুদ্ধ হতে বাধ্য। কি অদ্ভুত কৌশলে, অথচ কত সহজে কৃ-ধাতুর ও অনাবশ্যক বিশেষণের ব্যবহার প্রমথবাবু পরিত্যাগ করেন, দেখলে আশ্চর্য্য লাগে। প্রমথবাবুর হাতে মুখের বর্ণনা বিশেষ লক্ষ্য করবার জিনিষ। টানা চোখ, টিকলো নাক আর পাতলা ঠোঁট সকলেই লিখতে পারে কিন্তু টানা টিকলো ও পাতলা শব্দ বাদ দিয়ে ঐ রকম নাক, মুখ ও চোখের বর্ণনা এবং তাদের অধিকারীর জীবন্ত স্বরূপ প্রকট করা কত শক্ত, তা একবার লেখকবৃন্দ নিজেরা চেষ্টা করলেই বুঝবেন। আমার বক্তব্য এই যে, বীরবলী ভাষাতেই সে বর্ণনা খানিকটা সম্ভব, পুরোটার জন্য অবশ্য প্রমথবাবুর প্রতিভার প্রয়োজন। এত কথা লেখবার উদ্দেশ্য এই যে, বাঙ্গালী গল্প-লেখক ঘটনাকে করায়ত্ত করতে পারেন না বলেই বিশেষণের আশ্রয় নিতে বাধ্য হন; সেই জন্য গল্প বর্ণনাবহুল

হয়; এবং গতি সম্বন্ধে একপ্রকার অচেতন ব'লে কৃ-ধাতুর অপব্যবহারে জড়িয়ে পড়েন, ফলে কথোপকথন দীর্ঘ ও অবান্তর হয়। প্রমথবাবুর গল্পে বর্ণনা ও কথোপকথন একটুও অতিরিক্ত নয়, যতটা পরিণতির জন্য দরকার, যতটা গতিকে সাহায্য করে, তার অধিক ব্যবহারে তিনি কৃপণ।'

ফরাসী সমালোচক জুবেয়ারের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীকে তুলনা করলে বোধ করি শোভন হবে। জুবেয়ার তাঁর নিজের সম্বন্ধে লিখেছেন—

'If there is a man upon earth tormented by a cursed desire to get a whole book into a page, a whole page into a phrase, that phrase into one word,—that man is myself.'

প্রমথ চৌধুরীও তেমনি বিরাট ক্যান্‌ভাসের পক্ষপাতী নন, তাঁর আর্টের প্রথম ও শেষ কথা মিতাক্ষরতা।

ভাষার দিক দিয়ে তেমনি বাংলা সাহিত্যে তিনি কথ্যভাষার নব-প্রবর্তক। তাঁর পূর্বে যে বাংলা সাহিত্যে কথ্যভাষার আদৌ প্রচলন ছিল না, এমন নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে এবং বিদ্যাসাগরের তিরোধানের পর ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং ১৮৬২ সালে প্রকাশিত কালী-প্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাচার নক্সা' মূলতঃ কথ্যভাষায় রচিত হয়। কিন্তু ভাষার নবরূপায়ণের চেষ্টা তাঁদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় নি, দেখা গেলে তৎকালীন ও তৎপরবর্তী বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উপর তার প্রভাব অবশ্যম্ভাবী ছিল। বিদ্যাসাগরীয় রীতিতে বঙ্কিমী ভাষা এদেশে বহুকাল চলে এসেছে—যার প্রভাব দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের প্রথমকালীন রচনায়। রবীন্দ্র-নাথের গদ্যরীতি যখন তাঁর ছোটগল্প রচনার কাল (১২৯১) থেকে নিজস্ব ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করে, এবং সাধুভাষা যখন তার নিজস্ব দ্যুতিতে প্রকাশমান, এমনি সময় ১৩২১ সালে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্রে'র আবির্ভাব—যার মাধ্যমে কথ্যভাষার উত্তাল স্রোত মন্দাকিনীর ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু হয়। সবুজ-পত্রের জন্ম সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী লেখেন:…'রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাবার কিছুকাল পরে যখন শিলাইদহের কাছারিতে ছিলেন, তখন আমি ও মণিলাল গাঙ্গুলী সেখানে যাই, উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাবনা সাহিত্য-সম্মিলনে যাওয়া। দু' তিন দিন আমরা পদ্মার উপর বোটে থাকি। রবীন্দ্র-নাথ রোজ সন্ধ্যায় পদ্মায় বেড়াতে যেতেন; আমি সে সময় বোটেই

থাকতাম। কথায়-বার্ত্তায় আমরা রবীন্দ্রনাথের একটি নব মনোভাব লক্ষ্য করি। তিনি বলতেন, তিনি আর লিখবেন না, কারণ বহুকাল ধরে অনেক লিখেছেন, আরও লিখলে পুনরুক্তি করবেন মাত্র। আমি অবশ্য তাঁর এ অভিমতের ঘোর প্রতিবাদ করতুম। একদিন সন্ধ্যায় তিনি ও মণিলাল চরে চক্র দিয়ে ফিরে এলেন, মণিলাল ফিরে এসে আমাকে বললেন যে, রবীন্দ্রনাথ লিখতে রাজী আছেন, যদি আমি একখানা নতুন মাসিক পত্র বার করি ও তার সম্পাদক হই। তা হলে তিনি তাঁর সব লেখা সেই পত্রে প্রকাশ করবেন। আমি হেসে বললাম—আমি এই পত্রিকার বেনামদার সম্পাদক হতে রাজী আছি। আমি প্রস্তাব করলাম, পত্রের নাম দেব সবুজপত্র এবং সে নাম তিনি গ্রাহ্য করলেন।'

রবীন্দ্রনাথের সপ্তম উপন্যাস 'ঘরে বাইরে' কথ্য ভাষাতেই সবুজপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রধান কথ্যভাষায় লিখিত উপন্যাস ঘরে বাইরে' তার মূলে প্রমথ চৌধুরীর কথ্যভাষার আন্দোলন লক্ষ্য করবার বিষয়। রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যেও যে এ উদ্যম ছিল না এমন নয়, কিন্তু লিখন অভ্যাসের ফলে লেখকমাত্রেরই যেমন একটি নিজস্ব রীতি থেকে সহসা বেরিয়ে আসতে গিয়ে নিজের কাছেই একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, লোকে একে সহজভাবে গ্রহণ করবে কি না, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। 'সবুজপত্রের' মধ্য দিয়ে প্রমথ চৌধুরী এই সংশয়ের নিরসন করলেন। প্রমথ চৌধুরীর ভাষা যেমন এসময় ক্রমে বীরবলী ঢংএ প্রতিষ্ঠার উত্তুঙ্গ শিখরে উঠলো, রবীন্দ্রনাথের হাতেও সাধুভাষার গণ্ডী ক্রমে তাঁর স্বকীয় কথ্যভাষা আত্মমর্যাদায় অভিব্যক্তি পেলো। বাংলা সাহিত্যে বীরবলী ঢংটি কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর প্রচলিত রচনারীতিকেও ছাপিয়ে গেল। অনেক লেখক তার অনুকরণ করতে গিয়েও এই ঢংটি করায়ত্ত করতে পারেন নি। এই ভাষা প্রচলন করতে গিয়ে রক্ষণশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে তাঁকে বাধা কম পেতে হয় নি। কিন্তু সে বাধায় হার স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। ১৩০৯ সালে 'কথার কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বললেন : 'আসল কথাটা কি এই নয় যে, লিখিত ভাষায় আর মুখের ভাষায় কোন তফাৎ নেই? ভাষা দুয়েরই এক, শুধু প্রকাশের উপায় ভিন্ন। একদিকে স্বরের সাহায্যে, অপরদিকে অক্ষরের সাহায্যে। বাণীর বসতি রসনায়। শুধু মুখের কথাই জীবন্ত,

যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই, সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়। ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে কলমের মুখ হতে মানুষের মুখে নয়। উল্টোটা চেষ্টা করতে গেলে মুখে কালি পড়ে।'

এ ভাষা যদি প্রচলিত না হ'তো, তবে বাংলাভাষার সুললিত প্রকাশ যে আরও দীর্ঘকালের জন্য ব্যাহত হ'তো, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর সম্পাদিত 'সবুজপত্র', 'অলকা' ও পরে 'রূপ ও রীতি'র মাধ্যমে যে সকল লেখক পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্যে খ্যাতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই কম-বেশী প্রমথ চৌধুরীর প্রচলিত গদ্য ও স্টাইলের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলা যায়। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বলেন: 'প্রমথ চৌধুরী বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যে অভেদাত্মক অর্দ্ধনারীশ্বরের পূজারী। ...তাঁহার উপর ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব একসময় খুব অধিকই ছিল। এই প্রভাবের ফলে আমরা পাই বীরবলকে বাংলার মনটেনের মত শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক হিসাবে। ফরাসী রচনার মত তাঁহার সমস্ত লেখায় ফুটিয়া রহিয়াছে একটা আন্তরিক ব্যক্তিমুখিতা। পৃথিবীতে শালীন, বিদগ্ধ দৃষ্টিতে যাহা তিনি দেখিয়াছেন, সমাজের সঙ্কীর্ণতা, রাজনৈতিক ভণ্ডামি, নীতিজ্ঞের একদেশদর্শিতা, রায়তের ক্লেশ বা শিক্ষিত যুবকের ভাবপ্রবণ দৌর্ব্বল্য—সকলের মধ্যেই আমরা পাই একটা নূতন রঙের চশমার ভিতর দিয়া বাঙালী জীবনের কল্পলোকবিস্তৃত চলচ্চিত্র। শুধু তাই নহে। তাঁহার প্রবন্ধ রচনার প্রাণই হইতেছে অত্যুক্তি বর্জ্জন, একটা সমতা ও সৌষ্ঠব।'

এক কথায় বলা যায়—তাঁর গদ্যভঙ্গী Neither poetic, nor prosaic। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: 'Paradox-এর খোঁচা দিয়া তিনি আমাদের সহজেই ভাবাবেশপ্রবণ, সংস্কারাচ্ছন্ন, নিদ্রালু মনকে জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন—খাঁটি সত্যানুসন্ধিৎসা অপেক্ষা জড়ভাবের প্রতি-রোধক উত্তেজনা সঞ্চারই তাঁহার আসল উদ্দেশ্য। তিনি আমাদিগকে ভাব-বিহ্বলতার মোহ হইতে সচেতন করিয়া আমাদের চিন্তাশক্তিকে সক্রিয় আত্মানুশীলনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতবাদের মধ্যে যেটুকু সত্য আছে, তাহা তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বকই অতিরঞ্জন-বিকৃত করিয়া আমাদের প্রতিবাদ-

স্পৃহাকে জাগাইয়া তুলিয়াছেন, এবং এই উপায়ে বাদ-প্রতিবাদমূলক এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছেন, যেখানে আমাদের স্বাধীন বিচারশক্তি মুক্তবায়ুর ন্যায় অবাধে বিচরণ করিতে পারে। আমাদের ভক্তিরসমদির ও আনুগত্যমন্থর মনোরাজ্যে তিনি ফরাসী দেশসুলভ লঘু চপল ব্যঙ্গপ্রিয়তা ও শ্রদ্ধাবিমুখ অথচ মার্জিত রুচি শ্লেষাত্মিকা মনোবৃত্তির আমদানী করিয়াছেন।'

প্রমথ চৌধুরী তাঁর নিজের কালে জনপ্রিয় না হবার দু'টি কারণ প্রধান। প্রথমতঃ তাঁর লেখনী বহুপ্রসবিনী ছিল না, এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁর রচনায় সাধারণ পাঠক ঈপ্সিত ভাববিলাসিতা বা সস্তা উচ্ছ্বাস নেই, ফলে সাধারণ পাঠক তাঁর প্রতি সহজে আকৃষ্ট হতে পারে নি। তারা বরং অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছে শরৎ-সাহিত্যে—যা অতি সহজেই মানুষের মনকে এসে স্পর্শ করে। এদিক থেকে বলা যায়, প্রমথ চৌধুরী ছিলেন writer of writers।

তাঁর বিশেষ লিখনভঙ্গির মধ্যে বাংলা দেশের সমস্যাবলীও নিতান্ত চাপা ছিল না। 'দুই ইয়ার্কি'তে যেমন তিনি পত্রাকার প্রবন্ধে গণতন্ত্রের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন, তেমনি 'রায়তের কথা'তেও পত্রাকারে তিনি এদেশীয় কৃষকদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। যদিও এ বর্ণনায় তিনি বুর্জোয়া ডিমোক্রেসির উর্ধ্বে উঠতে পারেন নি, তবু তাঁর আলোচনা যে স্বচ্ছ ও প্রাণবন্ত, তাতে ভুল নেই। আলোচনা-সাহিত্যের দিক দিয়ে তেমনি তাঁর 'নানা কথা' ও 'নানা চর্চা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, শিল্প, জীবনী, ভূগোল, কাব্য, সমাজ জিজ্ঞাসা, রাজনীতি প্রভৃতি সবকিছুই এর মধ্যে আছে। 'নানা চর্চা'র প্রথম প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষের জিওগ্রাফী' তাঁর এক অত্যাশ্চর্য রচনা। অতি সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখা সত্বেও এটি হয়ে উঠেছে এক অপূর্ব সরস সাহিত্যিক রচনা। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও প্রমথ চৌধুরীর যে কতখানি কৃতিত্ব, এ জাতীয় রচনা তার উজ্জ্বল প্রমাণ। Lytton Strachyর রচনার সঙ্গে তাঁর এই ধরণের প্রবন্ধগুলিকে একমাত্র তুলনা করা চলে। তিনি শুধু নব ভাবেরই রসিক নন, প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের তিনি যুক্তিবাদী প্রবক্তা।

কাব্যরচনা তাঁর সাহিত্যের আর এক মহত্তর দিক। সেখানে Rhyme ও Reasonকে কেন্দ্র ক'রে এক উদার ভাবের সৃষ্টি হয়েছে। 'পদচারণ'-এর উৎসর্গপত্রে বিনয়ের সঙ্গে বীরবল লিখেছেন যে, কবিতাগুলিতে আর কিছু

থাক আর না থাক, 'আছে Rhyme এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ Reason। কথাটা যত সহজে বলা গেছে, আসলে তাদের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু তারা তত সহজ নয়। তেমনি সহজ নয় 'আহুতি'র Fantasy আর 'চেরিপুঞ্জের' উপর ছন্দবদ্ধ সনেট। তেমনি পেত্রার্কীয় আদর্শে তাঁর 'সনেট পঞ্চাশৎ' এর কাঠামোটি তাঁর নিজস্ব লিখনভঙ্গীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে বাংলা সাহিত্যের এক অত্যুজ্জ্বল সম্পদে পরিণত হয়েছে। পরবর্তীকালে যেসব কবি বিশুদ্ধ আঙ্গিকে সনেট রচনায় কলম ধরেছেন, বীরবলের সনেট থেকে তাঁরা যথেষ্ট শিক্ষালাভ করেছেন। বীরবলের মন ও রুচির সঙ্গে সনেট যেন খাপে খাপে মিলে গিয়েছিল, 'সনেট পঞ্চাশৎ'-এর প্রথম কবিতাতেই তাই তিনি লিখেছেন—

'ভালোবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে অপরে ক্রন্দন।'

ভাবপ্রাধান্যের পরিবর্তে চিন্তার প্রাধান্যই এই কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিজের কাব্য সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন—

'কবিতার যত সব লাল-নীল ফুল,
মনের আকাশে আমি সযত্নে ফোটাই,
তাদের সবারি বদ্ধ পৃথিবীতে মূল,
মনোঘুড়ি বুঁদ হলে ছাড়িনে লাটাই।'

নিছক কল্পনাবিলাসে তিনি ডুবে থাকতে রাজী নন, কল্পনাবিলাসীদের দলে নিজেকে ভিড়াতে তাঁর যথেষ্ট আপত্তি আছে। তাদের প্রতি তার অনুকম্পাও অসীম। ফলে জনপ্রিয়তার পরিবর্তে তাঁকে সীমিত পাঠকগোষ্ঠার মধ্যেই আজীবন কাটাতে হয়েছে। কিন্তু তাতে তিনি বিচলিত হন নি। বলেছেন—

'পয়সা করিনি আমি, পাইনি খেতাব,
পাঠকের মুখ চেয়ে লিখিনি কেতাব।'

সাহিত্যবৃত্তিতে এ বড় কম দুঃসাহসের কথা নয়। এদিক থেকে প্রমথ চৌধুরীর মতো দুঃসাহসী চারিত্রিক আভিজাত্য তাঁর সমসাময়িক কালে বা উত্তরকালেও বহু লেখকের মধ্যে দেখা যায় নি। তাঁর সম্পর্কে প্রকৃতই তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'...আমি অনেক সময় খুঁজি, সাহিত্যে কার হাতে কর্ণধারের কাজ

দেওয়া যেতে পারে, অর্থাৎ কার হাল ডাইনে বাঁয়ের ঢেউয়ে দোলাদুলি করে না। একজনের নাম খুব বড় ক'রে আমার মনে পড়ে, তিনি হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী। প্রমথর নাম আমার বিশেষ ক'রে মনে আসবার কারণ এই যে, আমি তাঁর কাছে ঋণী। সাহিত্যে ঋণ গ্রহণ করবার ক্ষমতাকে গৌরবের সঙ্গে স্বীকার করা যেতে পারে। অনেককাল পর্যন্ত যারা গ্রহণ করতে এবং স্বীকার করতে পারে নি, তাদের আমি অশ্রদ্ধা করে এসেছি। তাঁর যেটা আমার মনকে আকৃষ্ট করেছে, সে হচ্ছে তাঁর চিত্তবৃত্তির বাহুল্যবর্জিত আভিজাত্য, সেটা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায় তাঁর বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতায়,—এই মননধর্ম্ম মনের সে তুঙ্গ শিখরেই অনাবৃত থাকে, যেটা ভাবালুতার বাষ্প-স্পর্শহীন। তাঁর মনের সচেতনতা আমার কাছে আশ্চর্য্যের বিষয়। তাই অনেকবার ভেবেছি—তিনি যদি বঙ্গসাহিত্যের চালকপদ গ্রহণ করতেন, তা হলে এ সাহিত্য অনেক আবর্জ্জনা হতে রক্ষা পেতো। এত বেশী নির্ব্বিকার তাঁর মন যে, বাঙালী পাঠক অনেকদিন পর্য্যন্ত তাঁকে স্বীকার করতেই পারে নি ; মুশকিল এই যে, বাঙালী কাউকে কোনো একটা দলে না টানলে তাকে বুঝতেই পারে না।...রসের অসংযম প্রমথ চৌধুরীর লেখায় একেবারেই নেই। এই সকল গুণেই মনে মনে তাঁকে গুরুর পদে বসিয়েছিলুম।...'

॥ নামের আলঙ্কারিক গুরুত্ব ॥

নামের সংক্ষিপ্ততার দিকে আজ অধিকাংশ বাঙালীই দৃষ্টি দিয়েছেন। সাধারণতঃ বড নামের মধ্যপদ ছাঁটাই করবার একটা জাতীয় আগ্রহ আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি। অনেকে মনে করেন, এই ধরণের বড় নামগুলোর মধ্যপদ বিলোপে উচ্চারণের দ্রুততার দিক থেকে সুবিধে অনেক। যেমন—রসিকমোহন চৌধুরী বা বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়। যখন প্রচলিত কথার সূত্রে আমরা এই জাতীয় নাম সম্পর্কে কারও কাছে পরিচয় উপস্থিত করি বা সনাক্তকরণ করি, তখন সাধারণ অভ্যাসবশেই 'মোহন' বা 'বরণ' মধ্যপদ দু'টি বাদ দিয়েই মূল নামের সঙ্গে পদবী (surname) যোগ ক'রে দিই। নামের আগে 'শ্রী'র যোগ থাকলে সুবিধের জন্ম আগে থেকেই সেটা বিয়োগের ঘরে বসিয়ে নেই। বর্তমানে এটা প্রায় দেশাচারেই রূপ নিয়েছে। একসময় ছিল—যখন পুরো নাম ব্যবহারে কষ্টবোধ তো হতোই না, বরং তার আগে 'বাবু' বা 'শ্রী' শব্দ ব্যবহার না করলে অগৌরববোধ জাগতো। উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে নামের পূর্বের 'বাবু' শব্দ ব্যবহারের রীতি অন্তর্হিত হয়েছে। এখন সেটা ব্যবহৃত হয় অগ্রজের প্রতি বা কোনো সম্মানিতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে। 'শ্রী' শব্দ এখনও অনেকে ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু বহুলাংশেই অন্তর্হিত হ'য়ে এসেছে। অন্ততঃ শিক্ষিত জনসাধারণকে এখন আর নিজের নামের উচ্চারণের পূর্বে 'শ্রী' শব্দ যুক্ত ক'রতে বড় একটা দেখা যায় না। এটা খুব সম্ভব নামের একটা জাতীয়করণের দিক (a sign of nationalisation of name)।

অবিচ্ছিন্ন বঙ্গে প্রথম লীগমন্ত্রী-সভার আমলে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্ন 'শ্রী' ও 'পদ্ম'র বিরুদ্ধে সাম্প্রদা'য়িকতার অজুহাতে মুসলিম লীগ থেকে আপত্তি উঠলো, বহু বিদগ্ধ ব্যক্তি তখন বাঙালী সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে তাঁদের নামের গোড়া থেকে 'শ্রী' বর্জন করেছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও এ সময়ে 'শ্রী'হীন হলেন। জানি না বাঙালী সমাজের শ্রীহীনতার সেইটেই প্রথম পরিচ্ছেদ কিনা; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ও মনীষীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে এদেশের শিক্ষিত শ্রেণী সেই যে একবার 'শ্রী' ত্যাগ করলেন,

আর গ্রহণ করলেন না। আধুনিক বাঙালী সমাজে এ শব্দটির প্রয়োগ তো একরকম লজ্জাকর হয়েই দাঁড়িয়েছে। কারুর নামের আগে 'শ্রী' শব্দের প্রয়োগ দেখলে প্রগতিশীলদের পক্ষ থেকে তাকে রক্ষণশীল ব'লে অভিযুক্ত করাও বিচিত্র কিছু নয়। আজকের দেশাচার হচ্ছে—বর্জনের মধ্য দিয়ে প্রগতিশীলতার পথ রচনা করা। প্রগতিশীলতার ভঙ্গির তাতে আজ আকাশচুম্বী হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু 'শ্রী'র ব্যবহার একসময় বোধ করি শুধু নামের আলঙ্কারিকতার মধ্য দিয়েই আসেনি, তার পিছনে অভিভাবক শ্রেণীর একটা প্রাণময় ইঙ্গিত ছিল। শ্রী হচ্ছে কল্যাণ,—যিনি এ পৃথিবীর মাটিতে ভূমিষ্ঠ হলেন, তিনি যাতে কল্যাণধর্মী হয়ে জীবনে কল্যাণকর কায সাধন করতে পারেন, খুব সম্ভব এমনই একটা ইচ্ছার দ্বারা নামের পূর্বে এই 'শ্রী'র যোগ ঘটেছিল।

কিন্তু যুগের প্রয়োজনে তার ব্যতিক্রম ঘটতে বাধা হলো। শব্দটা ক্রমে surplus value বা বাড়তি মূল্যে গিয়ে দাঁড়ালো। জীবনে surplus valueটাই যে আর্ট, এ কথা কলারসিকেরা পর্যন্ত ভুলে গেলেন। 'শ্রী' ত্যাগ ক'রে আমরা 'আর্ট' ছেড়ে 'স্মার্ট' হতে চেষ্টা করলাম; কিন্তু এই smartness আমাদের জীবনে যে কোন্ মহৎ প্রগতিবাদের সৃষ্টি করলো, সেটুকু সম্ভবতঃ কেউ তলিয়ে বুঝতে গেলেন না। দেশাচারের ভিত্তিতেই প্রগতি কায়েম হয়ে গেল। দেশাচারের মজাই হচ্ছে এই যে, সমাজে বিশেষ কিছুকাল একটা কিছু প্রচলিত হ'তে শুরু হলে সেইটেই সর্বজনগ্রাহ্যতায় দাঁড়িয়ে যায়। 'শ্রী'হীনতার ব্যাপারেও তাই ঘটলো। তা নিয়ে বাঙালী হিন্দু সমাজে কোনোরকম আন্দোলন উঠলো না। অথচ যে মুসলিম লীগ থেকে একদা 'শ্রী' ও 'পদ্ম'র বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার নজির তুলে ধরা হ'য়েছিল, সেই মুসলমান সমাজে নামের পূর্বে 'সেখ', 'কাজি', 'মোহাম্মদ', 'হাজি', 'মৌলানা', 'মৌলভী' প্রভৃতি শব্দগুলির ব্যবহার অব্যাহতই থেকে গেল। হিন্দু সমাজ থেকে নামের জাতীয়করণের চেষ্টা ফলবতী হ'য়ে উঠলে কি হবে, আসলে তাতে ফাঁক থেকে গেল। মাঝখান থেকে আমরা বর্জনের দ্বারা প্রগতিশীল হলাম, অর্থাৎ ভূমিহীন বিত্তহীন বাঙালী তার সামাজিক সংস্থায় বংশগত গৌরবের মূল্যে যে আক্ষরিক শব্দটুকু অর্জন ক'রে আসছিল, অবশেষে সেটুকুও গেল। দেশ থেকে সোনা বিলুপ্ত হ'য়ে গেলে মেয়েদের কানে যেমন

চাঁদির কানপাশা শোভা বর্ধন ক'রতে দেখা যায়, শ্রীহীন বাঙালীর নামের উজ্জলতা প্রায় অনুরূপ হ'য়ে না দাঁড়ালেও নামের আলঙ্কারিক মূল্য যে কমলো, তাতে সন্দেহ কি !

বাংলার একজন বড় রসস্রষ্টা এ সম্পর্কে একদা বলেছিলেন—'শ্রী' শুধু আমাদের বংশমর্যাদাই নয়, জাতীয় কৃষ্টিরও স্বাক্ষর। ভারতবর্ষ চিরকাল তার এই 'শ্রী' দ্বারাই ভূষিত। এটা যে আমরা ব্যবহার করি, তার কারণ এই নয় যে, নির্বিশেষের মধ্যে ওটা আমাদের বিশেষ ক'রে তুলবে ; তার কারণ এই যে, ঐ একটি মাত্র শব্দের দ্বারা ভারত-আত্মার সঙ্গে আমরা যুক্ত ও অভিন্ন হয়ে আছি।'

রসস্রষ্টার এই যুক্তি অকাট্য না হ'লেও অনবদ্য ; আর এই অনবদ্যতাই যে নামের অলঙ্কার ! নামের মধ্যপদগুলিও অনুরূপ। চাঁদ, সিন্ধু, কান্তি, ভূষণ, নারায়ণ, রমণ, কান্ত, কুমার, নাথ, শঙ্কর, সুন্দর, পদ, লাল, গোপাল, গোবিন্দ, বিন্দু, বল্লভ, বিকাশ, প্রসন্ন, প্রসূন, কেতন, ময়, কিশোর, চরণ, হরণ, রঞ্জন, চন্দ্র, কিরণ, প্রসাদ, জ্যোতি প্রভৃতি শব্দগুলি শুধু অর্থযুক্ত এবং নামের ভারসাম্যকারীই নয়, নামের গুণারোপনির্ভরও বটে। যেমন—হরিপদ, মোহনলাল, বিদ্যুৎবরণ, নীহারবিন্দু, করুণাকেতন ইত্যাদি—।

যাঁরা সাময়িক পত্র বা মুদ্রণ কার্যের সঙ্গে জড়িত, তাঁরা জানেন, উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে গিয়ে চাপবার মতো নামের ভারসাম্যকারী এই সগুণ শব্দের বিরুদ্ধ প্রয়োগ ঘটলে কতখানি বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। রাইচরণের স্থলে যদি ভুলক্রমে রাইহরণ কিম্বা রাইহরণের স্থলে রাইচরণ মুদ্রিত হয় তবে উভয় ব্যক্তিই সম্পাদনকারীর উপর বিক্ষুব্ধ হবেন। পরম বৈষ্ণবীয় ভাব নিয়ে রাইচরণ বলবেন : 'কি ক'রেছেন মশাই, আমার নামে এতবড় অপবাদ কেউ কোনোকালে দিতে পারেনি ; আমি যে রাইয়ের চরণ!' আর রাইহরণ বলবেন : 'কপি দেখে অর্থ বুঝে না ছাপতে পারলে সম্পাদক হয়েছেন কেন? হরণকে দিব্যি চরণ ক'রে ব'সে আছেন ! এসবের মানে কি?'

মানে যে কি, তা তখন সবাই বুঝেছেন। কেউ ভাবেন না যে, এরকম বিপর্যয় প্রায়শঃই ঘটে এবং ঘটতে পারে। কিন্তু নামের মধ্যপদ বিলোপের ফলে আমাদের জাতীয় জীবনে আরও একটা বড় বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। আধুনিক অভিভাবকশ্রেণী অবশ্য আত্মীয়-স্বজন বা সন্তান-সন্ততির নাম অনেক ক্ষেত্রে

ভারসাম্যকারী সগুণ শব্দ বর্জন ক'রেই রেখে থাকেন। যেমন—অধীরকুমার দত্তর স্থলে শুধুই অধীর দত্ত, বিমলকান্তি বসুর স্থলে শুধু বিমল বসু। কিন্তু নামের সংক্ষিপ্তকরণ ও সহজতাবোধের দিক দিয়ে অনেকেই স্বেচ্ছায় নাম এবং পদবীর মাঝামাঝি ভারসাম্যকারী শব্দ বর্জন ক'রেছেন। যেমন—কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। কবি সাবিত্রীপ্রসন্নর নাম থেকে যদি মধ্যপদ 'প্রসন্ন' শব্দটি বর্জন ক'রতে হয়, তবে কোথাও কখনও উল্লেখের ক্ষেত্রে অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, ভেবে দেখুন। এখানে নির্ভুল সনাক্তকরণের জন্য মধ্যপদ ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। এরকম উদাহরণের অভাব নেই। এসব ক্ষেত্রে নামোচ্চারণকারীদের উচিত হবে নামের পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য রাখা।

তেমনি কতকগুলো নাম দেখা যায় স্ত্রীবাচক। কেবল মধ্যপদের শব্দগত অলঙ্কারযোগে সেগুলো পুরুষাত্মক হয়ে উঠেছে। যেমন—নলিনী; তার সঙ্গে রঞ্জন, কুমার, মোহন, কান্ত প্রভৃতি যোগ করলেই তবে স্ত্রীবাচক শব্দ পুরুষাত্মক হয়ে ওঠে। তেমনি—শ্যামা, উমা বা রমার সঙ্গে প্রসাদ, পদ বা প্রসন্ন, বাসনার সঙ্গে রঞ্জন, কনকের সঙ্গে কুমার প্রভৃতি যোগ না করলে শব্দগুলো স্ত্রীবাচকই থেকে যায়। এসব ক্ষেত্রে মধ্যপদ বর্জন ক'রে মূল নামের সঙ্গে শুধু পদবী যোগ ক'রে দিলে অবস্থাটা কি দাঁড়ায়, সে সম্পর্কে পাঠকেরা একবার ভেবে দেখুন। ললিতা সিংহ, ললিতাপ্রসাদ সিংহ, কামিনী রায়, কামিনীকুমার রায়: উদাহরণস্বরূপ এই জাতীয় নামগুলোর ভিতর উপযুক্ত ক্ষেত্রে মধ্যপদ না থাকার জন্য বা উচ্চারণকালে মধ্যপদ ব্যবহার না করার ফলে সাধারণের পক্ষে বুঝে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে—এর মধ্যে কোনটি নারী, কোনটি পুরুষ! তেমনি মধ্যপদলোপে মেয়েদের ক্ষেত্রে [illegible], হেমনলিনী, এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে অন্নদাপ্রসাদ, কমলাপ্রসাদ প্রভৃতি একই প্রকার বিভ্রমকারী।

অতএব মধ্যপদ বর্জনের যে প্রগতিয়ানা, তা বিপর্যয়ধর্মী বলেই মূল্যহীন। আমরা অর্থহীন অনেক বিষয় নিয়ে অনেক সময় নাচি, কিন্তু তা যে আমাদের ব্যক্তিজীবনে বা সমাজজীবনে আদৌ উৎকর্ষধর্মী নয়, এটুকু বুঝে দেখিনা। শোভনতা বা আলঙ্কারিকতার দিক দিয়ে যাই থাকুক না কেন, আমি নিজে অন্ততঃ এই মধ্যপদ বর্জনের বিরোধী। আমার নামের মাঝ থেকে কেউ যদি 'কুমার' শব্দটি তুলে নেয়, তবে আমি নিজেকে অত্যন্ত বেশী নিঃসম্বল

মনে করি। আমার মতো যাঁরা মধ্যপদধর্মী, তাঁরা নিশ্চয়ই কথাটা উপলব্ধি করবেন। কারণ, এমন নিঃসম্বলতা যে তাঁদেরও। যাঁরা মধ্যপদহীন, তাঁরা নামের দিক থেকে কতখানি বিত্তহীন, বল্‌তে পারবো না, কিন্তু নিঃসন্দেহে যে বৈভবহীন, এ কথা অনস্বীকার্য।

এ ছাড়া মধ্যপদের একটি মর্যাদার দিকও আছে। যেখানে নামের সঙ্গে মধ্যপদ যুক্ত ক'রে কারও সম্পর্কে আমরা কোনও মন্তব্য করি, সেখানে পদবী ব্যবহার না করেও তাঁর প্রতি আমরা মর্যাদা দিয়ে থাকি, যেমন—বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন, ইত্যাদি। এখানে মধ্যপদগুলো তুলে নিলে লেখকদের নামগুলোকে একেবারেই যেন অমর্যদার সঙ্গে হাল্কা ক'রে দেওয়া হয়। যাঁরা মধ্যপদহীন, এরকম ক্ষেত্রে বাধ্য হ'য়ে তাঁদের নামের সঙ্গে পদবী যোগ ক'রে নিতে হয়। নইলে মর্যাদাহানীর প্রশ্ন ওঠে। অতএব নামের short-cut রাস্তা নিয়ে যাঁরা Improvement Trust-এর কনট্রাক্‌টারি করছেন, তাঁরা যে ভূয়ো প্রগতিশীল, একথা প্রমাণ হয়ে গেছে। এরপর দেশাচার কি দাঁড়ায়, সেইটেই লক্ষ্য করবার বিষয়॥

॥ **সমাপ্ত** ॥